

উত্তরণ

সাময়িকী

নবপরিচয় ॥ প্রথম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ পৌষ-মাঘ ১৪০৭ ॥ ডিসেম্বর ২০০০-জানুয়ারি ২০০১



অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



সাম্প্রতিক গবেষণা কেন্দ্রে দলিত সাংবাদিক
মনোরঞ্জন বড়ালের স্বরণ সভায় প্রারম্ভিক
ভাষণ দিচ্ছেন একতান গবেষণাপত্রের
সম্পাদক নীতীশ বিশ্বাস। মাঝে (বী দিক
থেকে) মন্ত্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া, হিপুরার
শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার ও অধ্যাপক জ্যোতি
দত্ত।



লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসবে ওশিজন সংবর্ধনা—সংবর্ধনা জানাচ্ছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্ত

(বী দিক থেকে) উৎসব উদ্বোধন করছেন লোকজি চৌধুরী, ভাষণ দিচ্ছেন সদস্য মালিনী ভট্টাচার্য এবং সভাপতি উপেন কিস্ত (বিতরণী চিত্র)



উত্তরণ

সাময়িকী

অন্যান্যসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

নবমবার্ষিক □ প্রথম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ পৌষ-বাহ ১৪০৭ □ ডিসেম্বর ২০০০-জানুয়ারি ২০০১ ◆ দাম—দু টাকার

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

বীণেন্দ্র চক্র ভাটুরা

অধ্যাপক, আই. অফিসের সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

সহ-সভাপতি

উপেন্দ্র কিশোর

আই. অফিসের সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

ডা. সুখবিন্দাস বর্মা

প্রথম সচিব, অফিসের সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

উপসম্পাদক

হীরেন্দ্র দত্ত

সমস্যা

মহম্মদ চক্রবর্তী

বীরেন্দ্রনাথ বাহে

আশিস সিংহ

বীণীশ কিশোর

ডা. হানসকমল চৌধুরী (সম্পাদক)

সহ-সম্পাদক

ইশনকুমার দে

সুজ্যোৎসব

মণ্ডল সম্পাদক

হিম্মত মুখার্জী

পূর্ণা মুখার্জী

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

● কোচবিহারে ভূতামারা দেবুর উদ্‌যোজন

২

● কোচবিহারে ধরলা নদীর উপর ব্রহ্মবাড়িঘাট দেবুর উদ্‌যোজন

২৩

● ৬ ডিসেম্বরের শপথ

৩

● ওষোসো — শ্যামল জানা

৪

● মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিদায় সন্ধ্যায়

৫

● জ্যোতি বসুর প্রবর্তিত পথের ঠিকার পুনরাবৃত্তি করে যন্ত্রিসভা

৭

● যৌথ হারিস্ব পালন করে — মুখ্যমন্ত্রী মুক্তকেশ তর্কাতর্ক

● জাতপাত-জর্জর ভাঙতে 'হাবির' স্ববল্লভের দলিত সংগ্রামকে

৯

● কৌশলগতভাবে পরিণত করতে হবে — বীণেন্দ্র চক্র ভাটুরা

১১

● আবেগবশত জাতীয় পুণ্যভূমির সর্বেশিত কবি অমিল সরকার

● জীবনযুদ্ধে সাক্ষরতার পথ সেবাদো মেধাবী তরুণি জ্যোতি ও অমিবালা

১৩

● ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প

● সাধু রামচাঁদ মুখু 'মুখি' পুরস্কার

১৪

● বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভা দুটির উদ্‌যোজন বীরস্ব মুখতার মুখি স্থাপন

১৫

● লোক সংকুতি ও অমিবালা সংকুতি উৎসব

১৬

● উত্তর দিনাজপুর জেলা ২য় বর্ষ সার্বজনীন কর্মী পূজা

১৮

● উত্তর দিনাজপুরে জল উৎসব

২০

□ প্রবন্ধ কিত : 'পশ্চিমবঙ্গ'র পৌষমাস

অলঙ্কার : শ্যামল জানা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ থেকে ডা. হানসকমল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুধা কল্যাণ লিমিটেড, ১৮৬, বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত
কর্মসূচী : সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা, পি ১/৪, সি আই টি ভিল, ৭৭৭, ডি আই সি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

কোচবিহারে খুটামারা সেতুর উদ্বোধন

উত্তরবঙ্গের অনুরক্ত জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহার ছিল রাস্তাঘাট এবং সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুন্নত। উচ্চশিল্পী জাতি আবুবিদ এই জেলার প্রভাব প্রামাণ্যে সড়ক যোগাযোগ এবং রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জেলার উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষভাবে রাস্তাঘাট, কালভার্ট সেতু প্রকৃতির নিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে কোচবিহার জেলার একের পর এক সেতু উদ্বোধন হচ্ছে, ডোবা নদীর উপর সড়ক সেতু, সিনহাটির ধরলা নদীর উপর রথবড়িঘাট সেতু ইতিমধ্যে উদ্বোধন হয়েছে।

এবার এই জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে খুটামারা নদীর উপর নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের ভাঙ্গাপ্রশাসনী সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গণেশ চন্দ্র গোস্বামী গত ১৬



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে নেতৃবৃন্দ

জুলাই, ২০০০ তারিখে।

মন্ত্রী মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, এই সেতু তৈরি হওয়ার ফলে মাথাভাঙ্গার সঙ্গে শীতলকুচি ও সিংহাটির যোগাযোগে আর কোনও বাধাই রইল না। কাঠের ভাঙ্গা সেতুর

উপর দিয়ে যেভাবে যানবাহন চলাচল করত তাতে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের উদ্যোগে এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যেই এই সেতু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।



উদ্বোধনের পর সেতুর দৃশ্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাপতি চৈতন্য বর্মা (বড়ুয়া)। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহর তিরুকে। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিহারক সুরীয়াচন্দ্র প্রামাণিক, পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের মুখ্য বাস্তবকার কামাখ্যাপ্রদাস সরকার, পূর্ত দপ্তরের অধীক্ষক বাস্তবকার উত্তরবঙ্গ মণ্ডল-১ ইন্দ্রনাথচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রসিদ্ধান্ত: সফল সেতু ও স্বর্গ বর্মা

৬ ডিসেম্বরের শপথ

ডিসেম্বর ৬। ভারতবাসীর জীবনে এক শোকারহীন দিন, এক পরিব্রাজনের তারিখ।

১৯৪৬ সালের এই তারিখটিতে ভারতের মুক্ত গণন থেকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যশে পড়ে। তিনি বিয়ল যান্ত্রিকের দুগুণত্ব—পতিভা ও প্রজ্ঞা বিশিষ্ট নতনের ভারতপন্থিক স্বাভাবিক জীবাণু রক্ষিত অক্ষয়কর। তাঁর আবলা সংগ্রামের সর্বোচ্চ চরম থেকে বিদ্রোহ, বশতাব্যের মেহনত মুক্তার কোলে আস্তর নিতে হতোইল তাঁকে। তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসে দেশের ৮০ লাখ মানুষের উপর নেমে এসেছিল বিবাদের কালো ছায়া। অন্যদিকে তাঁর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য দেশের প্রতিরক্ষাশীল চরমের প্রতিনির্বিঘ্ন, মনুষ্যদের প্রবক্তাভূত আত্মস্বাধীন হতেইল তাঁদের প্রতিবাদী কঠোরের চরমত্ব, কল্লুকঠোর প্রকল নির্বোধের নীরবতা।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আত্মস্বাধীনতা উদ্বোধিত বলিত জৈবীর মনুষ্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সমাজবন্দলের আত্মশলকে আত্মকর নির্দেশিত বৃত্তিবৃত্ত পরিণতিতে পৌঁছে দেবার সাগ্রহে শাসিল হলেন। অতীত সমাজশিরোমণিরা নামিরে আনন্দন আত্মমগ্ন। সে-আত্মশল ওগু তৎকালবিত অশুশ্য ও শুরজৈবীর উপরই দীক্ষিত রইল না। দেশের সংখ্যালঘু সমস্ত সমাজদের মনুষ্য হলেন শাস্ত্রানার শিল্পর। মুসলমান, খ্রিস্টান ও নারীসমাজের অধিকার সম্বন্ধানের অপচেষ্টার মরিয়া হয়ে উঠল প্রতিরক্ষাকার।

তাদের সে চক্রান্ত বহু গ্রহীন। বৌদ্ধ যুগের অবসানের পর ব্রাহ্মণ ধর্মের হুজুয়ার মনু অনুশাসন জারির ওক থেকে সে চক্রান্ত ওক হয়। বিশেষ শাসনকালে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জনচেতনার উজ্জীবনের লয়ে বলিত ও নিশ্চিত সমাজের মানুষেরাও দেশের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজযুক্তির সাগ্রহে সবেমত সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। স্বাভাবিক নেতৃত্বের তার পদল আবেশনদের উপর।

এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল উচ্চবর্ণের প্রতিনির্বি স্বাধীন, কংগ্রেসের হাতে। সে নেতৃত্ব বলিতদের উপর উচ্চবর্ণের ধর্ম-পীড়ন যোগ না করে হরিজনের ন্যায়কী পরিচয়ের দেক রাখতে চাইল সমাজের সে-নির্দোষের দুই কত। আবেশকর হুঁড়ে কলে বিশ্রুণ সে আত্মমগ্ন। দেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থ-সামাজিক অধিকার অর্জনের লাড়ই ওক করলেন তিনি। ভাষণে কল্লার ছিটকোট নর, চাই কুব্বানের ন্যায় অধিকারের স্বীকৃতি। বিশ্রুণের কোল টেলি বৈঠকে প্রথর বৃত্তিবৃত্ত প্রকল যান্ত্রিকতার পরাভূত করলেন ভারতের মনুষ্যকী গোষ্ঠীর বিবোধিতা—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বাধা করলেন এতকাল বলিত মনুষ্যকীর বন্ধনা লাঘব প্রতিষ্ঠা দেনে নিতে। কিন্তু কংগ্রেসন্যায় সে স্বীকৃতি মেনে নিতে স্বাধীন হলেন না মনুষ্যকী। 'গেল' 'গেল' রব উঠল।

'নরনের জল, হত্যার খাস, কল্লার কথা, পরিচয়ের আশ' কলে থেকে আবেশন-নিবেশনের ডালি করে অনুগ্রহ কমনাই স্বীকৃতি আবেশনের উপজীব্য ছিল, তাঁরা কল্লকটই, তাঁদের অনুগ্রহমতাদের প্রতি অভিমানাহত ভিত্তে পনডারিত্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। তাঁদের দুখ্যায় গাধীজি জনপনে বসলেন। মনুষ্যপ্রমিত আবেশকর গাধীজির জীবন রক্ষার জ্যাণ করলেন তাঁর সংগ্রামের ফল। আপনসূত্রে বৌদ্ধ পাণ্ডা বিশ্রুণ, মনুষ্যকীরা বৌদ্ধ থেকেও স্বীকৃতি করার অপচেষ্টার দেতে উঠলেন। স্বাধীন ভারতের সর্বিধান প্রথমদের যোগ্যতম যান্ত্রিক স্বাধীন রক্ষা নিতে বাধ্য হয়েও আবেশকরের প্রাণীত বিবানের ন্যায়কীর আর্থ-সামাজিক সমন্যকীর রক্ষারূপে বাধ্য সৃষ্টি করতে লাগলেন। আবেশকর বেলেন, কংগ্রেসী স্বাধীনবোধের আশ্রয়ের পথে বলিত বৃত্তি সন্তব নয়। ডাক বিশ্রুণে সবেমত সাগ্রহের। স্বাধীন তিনি সে সাগ্রহের নেতৃত্ব বিয়ে থেকে। তাঁর লাগট বার বার পরাভূত হয়েছে প্রতিরক্ষাশীল পক্তি। তাঁর মুক্তার পরও সে পক্তি কুল্যে পলেনি পরাভবের কাল। তারা থেকে নিরুদ্ধে তাঁর মুক্তার বিনটিকে দীক্ষিত কল্লকট অনুগ্রহে। দেশের সংখ্যালঘু বৌদ্ধ চেতনকে আঘাত করল বাবারি মনুষ্যকি কলে করার অপচেষ্টার।

ডিসেম্বরের ৬ তারিখটি, ডাই, ভারতের শতকরা ৮০ জন বলিত এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অংশের কলে শোকবিন্দু রূপে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বিধানে অতর্কিত করেও দেশের অধিকাংশ নরনারীকে প্রতিরক্ষাকারের দুই কোলনে বলিত হতে দেবে বেনবার্ত কল্লের আবেশকদের প্রয়াসের মতোই বাবারি মনুষ্যকি কলে বিরম্বা সংখ্যালঘু বৌদ্ধ জনর বিপরীত করেছে। প্রকল, বলিত, নারী ও সংখ্যালঘুদের সর্বিধান প্রকল অধিকার বন্ধন্য 'প্রতিরক্ষাশীল নরনের' অপয়াব দেশবাদী আর মেনে নিতে স্বাধীন নয়। সবেমত চেতনার ও সবেমত সাগ্রহের তারা এর পের বিচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিজ্ঞা পালনই ৬ ডিসেম্বরের শপথ।

কবিতা

ওথেলো

[শেক্সপিরের সঙ্গীত]

শ্যামল জানা

মনে করো, তোর হল আর সের খেলেনি ইল্যোভ।
মনে করো, পেমব্রোক মঞ্চে অল্প হিঁড়ে পড়ে আছে রাত্রি।
আর, ঈশ্বর, সেই কালো রাত্রিকে জড়ো করে নিমেবে বানালো ওথেলো শরীর,
আর, সেই কালো শরীর প্রাণ পেয়েই ছুটল ডেসডিমোনার পিছন পিছন।

মনে করো ছুটতে ছুটতে, কণ্ঠবৈক্য পেরিয়ে, হাইগ্রীড সভ্যতার জঙ্গল পেরিয়ে,
ভিনশ শীতকল পেরিয়ে, সীমান্ত তুলে, এসে ধাঁড়াল সাঁওতাল পরগনার—
হাতে তীর আর তীর ঘুগার বানানো লুক্কিস ধনুক ;
আর নীল রক্তের ঝইসল বেয়ে চলল একটানা।

মনে করো সেই হইসল-এর শব্দগুলি জড়ো হয়ে
তোমার ওথেলো নামটি বদলে নিল নিশ্চয়।
তোমাকে সিমো বা কন্সট্রো বা যে কোনও নেটিভ বলে ডাকতেই
তুমি কেন্দ্র বুলিয়ে গভীরতর নিহের মতো ঘুরে ঘাঁড়ালে, আর তোমাকে দেখে
খেতাস মেঘের দল নির্দৈন্য নিল ক্রিমসন হাওয়া বরাবর।

আর শুদ্ধ লোভ আর চাবুক রাজানো মাকুয়ে ভারতবর্ষ ঢেকে গেল,
আর একটানে খুলে নিল কুম্ভার চান্দর সমেত ১৯৪৭।

ভারতবর্ষে ডোর হল। আর তুমি বিশ্বের দেখলে সের খুলল না কেউ।
নেটিভ-নব্বয়তাত্ত্বা গুম্বাড আর ব্যক্তিগত বাবার
শিলালিপিতে ঢেকে বাচ্ছে বেগুয়ারিশ আকাশ।

আর কয়েক শতকের বিবাহি ভেঙ্গে তোমার মনে পড়ছে তোমার নাম ওথেলো।
আর যা টেমপেস্ট ভারতবর্ষে তুমি পুনরায় ছুটে বাচ্ছে ডেসডিমোনার পিছন পিছন।

ছুটতে ছুটতে আবার তুমি পেরিয়ে যাচ্ছে পারিবারিক শাসন,
সাল ইয়েহার আর ধর্মীয় যানিঙ্গম। ওই যে গভীর খাব এক লাকে তুমি পেরিয়ে যাচ্ছে...
পুট আউট দ্য লাইট, পুট আউট দ্য লাইট—হারিয়ে যাচ্ছে ডেসডিমোনা...

আর বাবতীর অ্যালবাম ডেকে, কয়েকটা শতক পেরিয়ে তুমি আবার ঝুঁটু গেড়ে বসেছে শেক্সপিরের সামনে—
লাকিয়ে কল্লে উঠে আসা মুখে তুমি বলছ—
আর একবার আমার নাম বদলে গাও তুমি, আমি ভারতবর্ষে যাব....

জনগণমন অধিনায়ক জ্যোতি বসুর প্রশাসন থেকে অবসরগ্রহণ মুহূর্তে সরকারি কর্মীদের বিদায় সংবর্ধনা

জনসেবার স্বার্থে দীর্ঘ স্বার্থ বিসর্জন, অর্জিত বিরাট বিদ্যাভাণ্ডারকে হোণার্জনের অর্থ সঞ্চয়ে নিয়োগ না করে জনকল্যাণকল্পে প্রয়োগ করে তিনি নিজেকে সর্বহারাশ্রেণীতে দণ্ড করিয়েছেন, ভবিষ্যের মতো দুঃখ সন্মুখীকে উচ্ছ্বিত করেছেন চেতনার জোয়ারে সেই জনগণমন অধিনায়ক জ্যোতি বসু অবসর নিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের শীর্ষলেনে থেকে। নেমে এলেন সেই জনগণের মধ্যে তাদের সঙ্গে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ফেটেছে তাঁর কাঁধে কঁধে মিলিয়ে লড়াইয়ের মর্যাদানে, যার পথনির্দেশে জনগণ উজ্জাসিত হয়েছে নতুন আলোর রক্তিম ছটায়।

বিশে শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বিলেতে অর্জিত ব্যারিস্টারির বিপুল অর্থোপার্জন ও উচ্চ মর্যাদার আসন হেলায় ত্যাগ করে পরাধীন ভারতের জনগণমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট সরকারের কর্ণধাররূপে সারা দেশের কাছে এক উজ্জল জ্যোতির্ভে প্রতিভাত হয়েছেন, কালের যাত্রাপথে তিনি তাঁর সাতল্যার রথের রশি তুলে দিলেন তাঁরই অনুগামী পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধসেব ভট্টাচার্যের হাতে। অবশ্যত্বাধী এ হাতবকল। কেননা, কোন আসনই শূন্য থাকে না; পূর্ণ হয় উত্তরসূরির সার্থক অনুসরণে।

জ্যোতি বসুর বিদায় সংবর্ধনা লাগে তাই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধসেব ভট্টাচার্যের ঘোষণা : জ্যোতি বসুর অবসর গ্রহণের শূন্যতা পূর্ণ হবে তাঁরই নির্দেশিত পথে মন্ত্রিসভার যৌথ গান্ধি গলনের মধ্য দিয়ে।

১৯৭৭ সালের ২২ জুন। ইতিহাসের তপ্তা। গত ২৩ বছরের বেশি জ্যোতি বসুকে তাঁর বিদায়-মুহূর্তে, পরাধীনোক্তর ভারতের ইতিহাসে এত সময় ধরে জ্যোতি বসুর নির্ভুল নেতৃত্বে আতনন্বিত করল তাঁর অনুগামী নতুন নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে সেদিন। বামফ্রন্ট সরকারের দুবার যাত্রাপথে সে মন্ত্রিসভাকে। নশ্বিত হয় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। সেদিনের সেই ইতিহাস সৃষ্ট হয়েছে। যাত্রা ওক্তর সে দিনটির ফিলসফি নতুন মাত্রায়, বিরাট বিচলিত রূপ ধারণ করে তার পত্রপত্রের আন্দোলনে সংবর্ধিত করল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে, গত ৩ নভেম্বর লাগে যে জনসমাবেশ মহাকরণের সম্মুখে পূজমুখী অসীতাবে স্বাগত জানিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে, গত ৩ নভেম্বর

জ্যোতি বসুর বিদায়গ্রহণ মুহূর্তে মহাকরণের সম্মুখে বিশাল কর্মী-সমাবেশ



মহাশয়ের বৃহত্তর অর্ধে এক জনসমূহের উদ্ভিদমাল্য মতো জনগণের উত্তেজিত বাহু বিসারকণে অভিনন্দিত করল তাকে, তাঁর সন্তকরের ২৪ বছরের কল্যাণপথ পরিস্কার প্রাপ্তি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ফে-অর্ডিনেশন কমিটি আরোজিত এই সমাবেশটির মতোই জ্যোতি বসু ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে ১৯৭৭ সালের ২২ জুন স্বাগত জানান হয়েছিল এই কমিটির উদ্যোগে।

মহাশয়ের সমুখে বিবাহী যথের প্রশস্ত সড়কে তৈরি হয়েছিল বিহারমঞ্চ। মঞ্চে লাল সালুতে লেখা : ভারতের গণ-আন্দোলনের অবিমরবীর নেতা, সেনের সমুখে নজিরগুটিকারী পন্থিকবাদের ঐতিহাসিক বামফ্রন্ট সরকারের কর্মচারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে সন্মেলনা সভা।

১৯৭৭ সালের সংবৎসর জ্বায়ে মুখ্যমন্ত্রী বসু বলেছিলেন, "যে প্রশাসনের আমি মুখ্যমন্ত্রী, সেই প্রশাসনের কর্মী-নেতৃবৃন্দ বাইরে থাকবে এ হতে পারে না। আমি এবং আমার মন্ত্রিসভার প্রথম কাজ হবে তাঁদের সবেদন চাকরিতে পুনর্ব্যবস্থা করা।" মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কর্মচারী নেতাদের পুনর্ব্যবস্থা ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জ্যোতি বসুর মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তাঙ্গ করতালির সঙ্গে সঙ্গে 'জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ' ও 'বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ' ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বৃহৎসংখ্যক ডাক্তারী, অসীম দলশক্ত, সুভাষ চক্রবর্তী, সেবরত কল্যাণদায়ক, মহাশয় জামিন, নবদোপাল ডাক্তার, প্রবোধ সিংহ এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা যথেষ্টদল মঞ্চের সামনে।

রাজ্য ফে-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বরূপে রায়চৌধুরী জ্যোতি বসুর হস্তে ১-টি ফুলের স্বত্বক

ভুলে নেন। ফুলের ডোড়া ফুলে নেন ১২ই জুলাই কমিটির দুইদল দলশক্ত, যুক্ত কমিটির পক্ষে রহিবাস সাহারায়, শীমা কর্তী আন্দোলনের নেতা শাখি ডাক্তার সহ কর্মচারী আন্দোলনের বহু নেতা। ফে-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে জ্যোতি বসুর হাতে কবি সুকান্ত ডাক্তারের, 'হুটব ডোড়া' শব্দক উপহার নেওয়া হয়। প্রতীকী এই উপহারটি ইতালীয় পোস্টিলিনে তৈরি; এটি গতির স্মারক।

স্বরূপে রায়চৌধুরীর সঞ্চিক্ত ডাকলের পর জ্যোতি বসু তাঁর ডাকল শুরু করেন। "রাজনৈতিক উপাঙ্গনে ভরপুর ডাকলটি রোজাসের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

জ্যোতি বসু বলেন যে, ১৯৭৭ সালে বিকল্প নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সেই নীতি ও কর্মসূচি প্রয়োগ করতে হলে কেবল মন্ত্রী বসন্তই কাজ হয় না, রাষ্ট্রপতি বিন্দি ও বিভিন্ন জেলা এবং অন্যান্য যে বিরাট সংখ্যক কর্মচারী রয়েছেন তাঁদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ও কর্মচারীদের স্বার্থ অভিন্ন। বিকেন্দ্রিকরণে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে জ্যোতিবাসু বলেন যে, ইতিমধ্যেই 'বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, কর্মচারীদের মূল্যবান সহযোগিতার সেসব কাজ সম্পন্ন হতে পেরেছে। কর্মচারীদের সর্বস্বিক্ত সহযোগিতার সরকারের এমন কাজ পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়নি বলে উল্লেখ করে জ্যোতি বসু বলেন যে, ৯টি বামশ্রমী দলের একতারা ২৪ বছর ধরে সরকার পরিচালনার পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য ও সহযোগিতা এ রাজ্যে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে।

জ্যোতি বসু বলেন, "ব্রিটিশ আমলের আইন আমদানি বানিজ্য বসলে দিয়েছি। সরকারি কর্মচারীরা এখন বিটি-মিটিলে দোহেতে পারেন। এমন অবিকার ভারতের

অন্য কোথাও নেই। বর্মিট শেষ হাতিয়ার হলেও এখানে আমাদের সরকার আছে বলেই এখানে বর্মিটের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, সেই ১৯৫২ সালে আমি যখন বিরোধী দলের নেতা তখন থেকেই কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। কংগ্রেস নির্বাচনকে গ্রহণের পরিত্যক্ত করলে মাকের পাঁচ বছর (১৯৭২-৭৭) আমি বিরোধী দলের নেতা থাকতে পারিনি।

জ্যোতি বসু বলেন যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে এবং এই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করার জন্য কতবার কতজনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, কোলাহোল করতে হয়েছে, সরকারি কাজ থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে ডার আর ইরুজ নেই, কত শত মানুষ শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এসের কথা না ফুলবার জন্য অনুরোধ করেন।

অন্যান্য রাজ্যে সফরের অভিজ্ঞতা কখন করে জ্যোতিবাসু বলেন যে, বহু রাজ্যেই কর্মচারীরা এখানকার মতো গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা জোগ করেন না। এ রাজ্যের কর্মচারীদের আন্দোলনে আনুকূল্যের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন যে, সফল আন্দোলনের লক্ষ্যে অনেক কষ্ট এখনও বাকি। আমূল পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে, বিরোধী সংবাদপত্র ও বিভেদকারী শক্তিতলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে, কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের কথাই ভাবতে হবে এবং "দেশের বৃহত্তর একবার ভেঙে গেলেও আবার তৈরি করার চেষ্টা করছি।" কাজটি কঠিন বলে অতিহিত করে জ্যোতিবাসু বলেন যে, সে কাজ গণতন্ত্রের মানুষের সহায়তার অবশ্য সম্পন্ন করা যাবে। তিনি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনতার মুখবুর্দ জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে জ্যোতি বসু বক্তৃতা শেষ করেন।

জ্যোতি বসুর প্রদর্শিত পথেই তাঁর শূন্যতা পূরণ করবে মন্ত্রিসভা যৌথ দায়িত্ব পালন করে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অঙ্গীকার

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক-মুদ্রিত শিউলিগা। সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ করল এক নবীন আশার স্বপ্নদ্বারাতে নবীন প্রজন্মের প্রশাসনপর্বে। যে প্রশাসনপর্বের ভিত্তি গড়েছেন অবিসংবাদী জননেতা জ্যোতি বসু ২৪ বছরের নজিরবিহীন জনসেবার মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রশাসনের প্রতিটি পদক্ষেপে রচিত হয়েছে অপ্রাণিত অধ্যায়। কৃষি শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য মানবাধিকার প্রকৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে অদ্বৈত দিশর্শন তিনি তুলে দিয়ে গেলেন তাঁর উত্তরসূরি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে।

সার্বক তাঁর নির্বাচন। সার্বকতর তাঁর হস্তান্তর। ছয় নভেম্বর রাজ্যভবনে পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রিরূপে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গ্রহণ করেছেন সেই বিরাট কর্মভার। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর নবীন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বীভার করলেন সে গুরুভারের কথা। সম্ভারবির দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করলেন তিনি। জ্যোতিবাসুর অবসর গ্রহণের শূন্যতা বীভার করেও তিনি প্রকাশ করলেন সে শূন্যতা পূরণের দায়িত্ব-সংক্রান্ততার কথা। বললেন : ২৪ বছর ধরে যে পথে যে লক্ষ্যে তিনি তাঁরই মনোনীত মন্ত্রিসভাকে পরিচালিত

করেছেন, সেই মন্ত্রিসভাই বৌধ দায়িত্বে জ্যোতি বসুর কাজের যাত্রা অনুসরণ করে চলেবে। তিনি বলেন বে, বামরস্টের শরিক মলগুলির মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পারস্পরিক ষোষণাপড়ার ভিত্তিতেই তৈরি হবে সেই বৌধ কর্মধারা।

গোড়ার দিকে রাজ্যভবনের সম্মুখভাগে কক্ষে (ব্যাকফ্লোরিট হলে) শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সম্মেলন কক্ষে রাজ্যপাল বীরেন জে শা'র প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাদক বজের বাদ্যবৃন্দে জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে। এর পর রাজ্যপালের নির্দেশে মুখ্যসচিব মনীশ গুপ্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। রাজ্যপাল প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী, পরে অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করেন। ২৯ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ১০ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন শপথ গ্রহণ করেন। অসুস্থতার দরুন ভক্তিবৃন্দ মণ্ডল বেরিয়ে পৌঁছালে এদিন তিনি শপথ নিতে পারেননি। পরে জেনও একদিন তিনি শপথ নেবেন বলে জানান হয়।

জ্যোতি বসুর শুভমুখ্যজ্ঞাপন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল আয়োজিত চা-চক্রে বিরাট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের কাছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আত্মজ্ঞাপন করে নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতি চিন্তা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে অমন্ত্রিত অপ্রিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ও জাতীয় তরের বিশিষ্ট শিল্পপতি, বসিকন্দার প্রতিনিধি, বিভিন্ন দূতাবাসের বিদেশি প্রতিনিধি, রাজ্যের সাহিত্য শিল্প চলচ্চিত্র



সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য



কিষ্ক এজেন্সি গ্রুপে বৃহত্তর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং ভারী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ও ক্রীড়াঙ্গণের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, উচ্চ আদালতের বিচারকগণ এবং রাজ্যের বিভিন্ন কমিশনের পদাধিকারী ব্যক্তি।

সামনের আসনে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বামপন্থী নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন মুখোপাধ্যায়, বিধানসভার শিক্ষার হামিম আবদুল হামিম, রাজ্যের বিরোধীদলীয় নেতাদের প্রধান সোমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী নেতা সীতারাম ইয়েচারি, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সৈয়দ দাশুচন্দ্র, সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এবং বিমান কবু, বিনয় কোন্ডার, নীরেন ঘোষ, মল্লু মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এদিনের অনুষ্ঠানে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীকরণকণ্ড আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিতরা রাজ্যপাল আরোজিত চা-চফে অংশ নেন।

সর্বশেষ জীবনী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১ মার্চ, ১৯৪৪ সালে কলকাতার গ্রামধন মিত্র সেনের পৈতৃক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে পৈলোয় সরকার ক্যাম্পাস থেকে হয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বায়োভা ও সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের দ্ব্যত্মপুত্র বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যানুরাগী; পরকর্তীকালে তাঁর কবিতা ৪৮ নটিয়ানা তাঁকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে কবি ও নট্যকার হিসেবে পরিচিত করে। চ্যুত্রজীবনে ফ্রিস্টে লোয়ার তাঁর অনুগ্রহ দেখা যায়। ১৯৬১ সালে সক্রিয় বাম রাজনীতিতে অংশ নেন

এবং কিছুদিনের মধ্যে সি পি আই (এম) -এর রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় বামফ্রন্ট অধিষ্ঠিত হলে তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হন এবং তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে নগরোন্নয়ন, পৌর বিপর্যক বিভাগীয় পরিদপ্তর বহন করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে ধরাটু (পুলিস) বিভাগের পরিদপ্তর আছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দায়ের কারলে তাঁর প্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পরিদপ্তর নেওরা হয়। বর্তমানে একই শারীরিক কারলে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে এবং গত ৬ নভেম্বর ২০০০ রাতের ৭ম মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি পদগ্রহণ করেন।

জাতপাত-জর্জর ভারতে 'স্থবির' সমাজের দলিত সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করতে হবে

আন্দোলকের স্মরণসভায় দীনেশ ডাকুয়ার আহ্বান



ভাষণরত মন্ত্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া

আলোচনাসভার মূল প্রস্তাবের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মন্ত্রিমহাশয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখান যে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলিতে গোটা দেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড উজ্জ্বলতম।

সভার শুরুতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা এবং ঐকতান গবেষণা পত্রিকা ও পথ সংকেত পত্রিকার প্রতিনিধিরা বাবাসাহেবের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

উদোক্তাদের পক্ষ থেকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুধীররঞ্জন দাস

প্রায় দেড়শ বছর আগে কার্ল মার্কস দেখেছিলেন যে শিল্পায়ত ইউরোপে পুঁজিবাদের চরম পর্যায়ে মালিকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করছে। মার্কস তাই ডাক দিয়েছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'বিশ্বের শ্রমিক এক হও'। কিন্তু ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে মার্কস ভারতীয় সমাজকে অদ্বন্দ্ব সমাজ বলে বর্ণনা করেছিলেন। বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আন্দোলকের জাতপাত বিভাজ্য ভারতীয় সমাজের নিপীড়িত, দলিত মানুষদের সর্বশক্তি শোষিত বলে বর্ণনা করে ওদের শোষণ-পীড়ন রোধের মধ্য দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের সাফল্য অর্জন সম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাই জাতপাত-জর্জর ভারতের স্থবির সমাজের দলিত সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

গত ৬ ডিসেম্বর বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আন্দোলনের ৪৪তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্দোলকের সোসাইটি ফর সোসিও-ইকনমিক অ্যান্ড কালচারাল রিফর্মস-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনের প্রাঙ্গণে আন্দোলকের মর্মর মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া উপরোক্ত মর্মে মন্তব্য করেন। তিনি মার্কস, আন্দোলকের পোলারাইজেশন অব দি অগ্রেসড অ্যান্ড দি এক্সপ্লোয়েড ক্লাসেস ইন ইন্ডিয়া (মার্কস, আন্দোলকের—ভারতের দলিত ও শোষিত শ্রেণীগুলির মেরুকরণ) শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিঙ্কু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গের পরিষদীয়মন্ত্রী
প্রবোচন সিনহা ভারতের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের মেরুকরণ সম্পর্কে আলোচনাচক্রের আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, সংবিধানের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে ডঃ আন্দোলকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাবিধানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের সংবিধান ৮৬ বার সংশোধিত হয়েছে সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মণ বাবাসাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন

করে বলেন যে, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামই বাবাসাহেবকে স্মরণের শ্রেষ্ঠ পথ। এই মুক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে মন্ত্রী বলেন যে, দলিত ও শোষিত মানুষদেরই তাদের মুক্তিসংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

দেশের কলঙ্কজনক সামাজিক কুপ্রথা বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষদের অভিনন্দন জানিয়ে **কমলেন্দু সান্যাল** রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দুর্ভাগ্য দেশ'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, দেশের প্রতিটি মানুষকে সমর্মদায়া উন্নীত করার সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসম্পদমন্ত্রী
নব্বাশপাল ভট্টাচার্য আলোচনার
অংশগ্রহণ করে কার্ল মার্কস ও
আইনস্টাইনের চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্যের
কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিদ্যাসর
শিখা এক উদ্বাহৃত গ্রন্থ ও পুনর্বিসননমন্ত্রী
কর্তৃক বিশ্বাস ডঃ আইনস্টাইনের উদ্দেশে
প্রদান করি অর্পণ করে বলেন যে,
পশ্চিমবঙ্গের সংবিধান গ্রহণের দিন
সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন
যে ভগবানকে ধন্যবাদ তিনি ডঃ
আইনস্টাইনের মতো একজন পণ্ডিতকে
উপহার দিয়েছেন।

ডঃ আইনস্টাইন কর্তৃক হিন্দুধর্ম ভাণ্ড
করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের উল্লেখ করে মন্ত্রী
বলেন যে, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের যে অর্থে
মানুষ পরিগ্রহীতের নিত্য বাস করেন
তাদের প্রায় সকলেই দলিতশ্রেণীর মানুষ;
তিনি তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক
অগ্রগতির যে সব কর্মসূচি অনুসরণ
করেছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষের
বিরোধিতার সেতুলি হৃদয়গ্রাহণের
বাহা পায়। তিনি আরও বলেন যে, ডঃ
শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দু কোড বিলের
বিরোধিতা করে লোকসভায় বলেছিলেন
যে, কন্যাকে নিজের সম্পত্তির অধিকার
দিলে, ষ্ট্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার
দেওয়া হলে হিন্দুসমাজ ক্ষণে হয়ে যাবে।
এদেশে শিক্ষাহীনতা, বেকার সমস্যার
ভয়াবহ পরিস্থিতির উল্লেখ করে মন্ত্রী
বলেন যে, মার্কসের শিক্ষার জ্ঞাতপাত
বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে পাশ্টানো
যারনি, আইনস্টাইনের শিক্ষা প্রয়োগ
করে সে কাজ করা সম্ভব।

রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার
অমল মুখার্জি আলোচনার অংশগ্রহণ
করে বলেন যে, রাসমোহন, বিদ্যাসাগর,
বিশ্বকামদেব, রবীন্দ্রনাথদের স্বেচ্ছাবাসী
স্বপ্ন করে, কিন্তু তাঁদের নীতি ও বানী
স্বাধীনতার সঙ্গ্রামে শক্তিমান হয় না।
তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গ্রামী নীতির কথা

উল্লেখ করে বলেন যে, শোভিত ও দলিত
মানুষের মুক্তির জন্য কার্ল মার্কসের
মতোই তিনি সঙ্গ্রাম করেছিলেন,
বৈষম্যহীন, সমাজবাবস্থা তৈরির জন্য
সংবিধানের বিধান রচনা করেছিলেন।

অন্যদের সঙ্গ্রামের কল্যাণ বিকাশের
মন্ত্রী মীনেন্দ্রচন্দ্র ডাকুরা তাঁর ভাষণে
ভারতের সমাজবাবস্থা সম্পর্কে কার্ল
মার্কসের উক্তি উদ্ধৃত করে আরও বলেন
যে, বাবাসাহেব আইনস্টাইন ভারতীয়
সমাজের অচলাচলনের বিরুদ্ধে আঘাত
হানার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি জানান
যে, জ্ঞাতপাতভিত্তিক ভারতীয় সমাজে
কোনও ব্যক্তি তার পেশা পরিবর্তন
করতে পারত না এবং এদেশে ইংরেজ
আগমনের আগে ততসিলি সম্প্রদায়ের
কোন মানুষ লেখাপড়া শিখতে পারত না।
আজকাল সে সব বৈষম্য দূর করা সম্ভব
হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান
যে, শিক্ষা, চাকরিতে সংরক্ষণ চালু
হয়েছে। অর্থহীন মানুষ যে কোনও
সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, সমাজে সে
স্বীকৃতি লাভ করে বলে উল্লেখ করে
তিনি বলেন যে, ধনী কর্তৃক ধরিত্রের
উপর নিপীড়নের তত্ত্ব আজকাল
ভারতেও প্রযোজ্য হচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষা ও
অর্থ স্বাবলম্বী হলে যে কোনও মানুষই
সমাজে সম্মানের আসন লাভ করতে
পারে। ভারতের ক্ষেত্রে জাতি-বৈষম্যের
প্রশ্ন দূর না হলেও কার্ল মার্কসের ধনী-
ধরিত্রের বৈষম্যের শ্রেণী অবস্থানের চিত্র
সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভারতের অন্যান্য অংশে ততসিলি
তথা অনুরূপ সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধার
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করে মন্ত্রী
বলেন সংখ্যাভেদে এটা সুস্পষ্ট যে, এ
রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অন্যান্য
রাজ্য থেকে ক্রমাগত উর্ধ্বগতি লাভ
করে চলেছে এবং সামাজিক বৈষম্যের
কোনও ঘটনা এখানে চোখেই পড়ে না।
অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি
বলেন যে, বাস্তব পরিস্থিতির সবধিক
বিবেচনা করে তারা কেন আবেদন

সংগঠন করেন। তিনি গরিব মানুষদের
মধ্যে একত্রে কথা বলার আহ্বান জানিয়ে
বলেন যে, গরিবদের মধ্যে ততসিলি
সম্প্রদায়ের মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী
প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে মন্ত্রী মহাপ্রসাদ বলেন
যে, সেখানে নরেশ্বরের বিরুদ্ধেও
বাল্যবংশীরা নরেশ্বরের হাতাও কানি
তুলেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া থাণে
থাপে সংস্কার লাভ করে বলে উল্লেখ
করে তিনি এইসব প্রবণতার বিরুদ্ধে
একাত্মক সঙ্গ্রামের আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণ : অনগ্রসর
সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী
উপেনে কিছু তাঁর সভাপতির ভাষণে
বাবাসাহেব আইনস্টাইনের উদ্দেশে
প্রদান করি করে বলেন যে,
বাবাসাহেবের এই তিরোধান দিবসে তাঁর
মর্মহর্মুতির পাদদেশে যেসব বক্তা বক্তব্য
রাখলেন, যেসব ব্যক্তি সংগঠন গড়ার
সকল প্রকাশ করলেন তাঁদের বক্তব্য,
তাঁদের সংগঠনের সূত্রে আইনস্টাইনের
বশ্ত সফল করে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতে
অর্থনৈতিক শোষণ অনেকাংশে
জ্ঞাতপাতের মধ্যে আবৃত, দলিত
মানুষকে এই জ্ঞাতপাতের শোষণের
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে শোষণ-বিরোধী
বৃহত্তর সঙ্গ্রামে নিয়ে আসতে হবে। এই
জ্ঞাতপাতে নিষিদ্ধিত মানুষের—
খেতখাদ্যের উৎপাদনকারী বা
কলকারখানার প্রথা উৎপাদনকারীদের
শ্রেণীসংগ্রামের পথ সম্মিলিত নিয়ে
আসতে না পারলে আইনস্টাইনের
সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের ধর্মকে সফল করা
যাবে না বলে তিনি অতিমত প্রকাশ
করেন। পরিশেষে তিনি দেশের নিষিদ্ধিত
দলিত মানুষদের সচেতন করে সঙ্গ্রামে
শামিল করার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে শেষ মন্তব্য
এবং শোভিত সমাজের পক্ষ থেকে
নেত্রলাল করমচার্য বক্তব্য রাখেন।
সভার প্রত্যেক উদ্ভাষন করেন গোপাল
দীপা।

আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কারে সংবর্ধিত কবি অনিল সরকার

গত ৪ ডিসেম্বর ন্যায়াধির ভারতীয় দলিত সাহিত্য অকাদেমি সংস্থার ফোড়ন জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অধিবেশন উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশের অন্যতম জনগোষ্ঠীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সংগ্রামী নায়ক এবং ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি জাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তর দপ্তর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনিল সরকারকে আকাদেমি এ বছরের আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কারে সংবর্ধিত করেছে। অন্যতমের সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও বিপুল অবদান এবং সাহিত্য সাধনায় অনন্য কীর্তির স্বীকৃতিতে কবিকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সম্মাননার উত্তরে কবি অনিল সরকার সারা দেশে দলিত শ্রেণীগুলির উপর উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের নিপীড়ন ও বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করেন। সেই নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাবাসাহেব ডাঃ আম্বেদকরের আত্মীয় নিরাস সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে তাঁর সেই সংগ্রাম চেতনার নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীকে উজ্জীবিত করার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতের শোষিত শ্রেণীর বর্তমান পথপ্রদর্শকদের অন্যতম জ্যোতি বসু মহাশয়ের ১৯৯২ সালের আম্বেদকর জন্মশতবর্ষবর্ষী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতি দেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেবিন বলেছিলেন,



‘ভারতের সংবিধান রচনায় বিশিষ্ট কৃমিকা গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ আম্বেদকর। সে সময়ে, আমি জানি, নানা আলোচনার পর তফসিলি জাতি-উপজাতির বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছিল সংবিধানে। ...তাদের যদি মূল্যদোষে নিয়ে আসতে হয়, তবে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। তাই সংবিধানে তা স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের প্রতি একপেশে মনোভাব, এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকার জন্ম দেটা সফল হয়নি। ...আমাদের প্রধান কাজ হবে এই নিপীড়িত মানুষদের—সে যে জাতের বা ধর্মেরই হোক—তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। পাশাপাশি এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক অসুবিধা, এমন কি হিংসা ধর্ম যার উৎপত্তিতে আছেন, যারা এদের মানুষ মনে করেন না, তার বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো।’

জ্যোতিবাসুর উদ্দেশ্যে শুভা জাপন করে কবি অনিল সরকার বলেন যে, এই সূত্রাঙ্গ পূর্ণত দেশে, অন্ধ ও যারা গর্বিত নিষ্ঠুর অভ্যাসের নতশির, ক্ষুদ্র প্রাণ, শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী, অন্ধ ও যারা ধর্ম, ধর্ম শোষণে অন্ধ্রাঙ্ক, সেই সব

আদিবাসী, দলিত, পঞ্চাংগন, ধর্মীয় সংযোগ্য, দুর্বল—অবলম্বিত ও শোষিত মানুষের জাগরণে আপনি আমাদের অগ্রপথিক হোন—এই মহৎ কামনার আমি ত্রিপুরার ত্রিশ লক্ষাধিক দলিত শোষিত, নিপীড়িত জনগণের পক্ষে আপনাকে জানাই তাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসী অভিনন্দন। মানুষের জরবারাহার, পণ্ডিত ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংগ্রামে, ধর্মোন্মাদনা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-পাতি ও সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপনি চিরজয়ী এবং দীর্ঘজীবী হোন।

কবি অনিল সরকারের জীবনী

কবি অনিল সরকারের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। ডানাইডন অবভিত বঙ্গের কুমিল্লা জেলার লক্ষীপুর গ্রামে। কুমিল্লার ইশ্বর পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার পর মহাত্মা বীর বিক্রম কলেজ থেকে সামান্যিক স্নাতক হন। রাজকোত্তর ডিগ্রি নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। পেশা থেকেই একটা তাকনা

তাঁকে সৃষ্টির অঙ্গনে নিয়ে আসে, যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এক মইরুহে রূপান্তরিত হয়। কখনও পাহাড়ে, কখনও জঙ্গলে—রাজনীতির বিতর্ক প্রায়শই তাঁর হৃদয়ে ফুটে উঠে। জীবনকে নিঃসৃত সেবেছেন। রাজনীতির বিভিন্ন ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ হয়েছেন। কবিতা তাঁর জীবনেরই অভিজ্ঞতার, প্রতিটি মুহূর্তের জীবন তিস্তিয়ার। কবিতাকে যারা অবসর মুহূর্তের সৃষ্টি বলে মনে করেন অনিল সরকারের কবিতা তার আদ্য প্রতিবাদ। বাংলা কবীর তৃতীয় ভূবন ত্রিপুরার তিনি জীবিত প্রতিবাদ। আমাদের কালের জটিল স্বাক্ষর, পতঙ্গী শেবে যাবতীয় অন্যান্যকে কবিতার কর্তৃত্ব কলসানো প্রতিশোধে এক হাবিক মাত্রা দিয়েছেন তিনি। কেননা, তাঁর কবিতা শুধু পতাকার লাল রঙে খুঁজেছে আশুন—বারবার এবং হাজার বছর ধরে যে পাখি কেসেই খাঁচার তার ডানার সমুদ্র খাতাদের বেনা পছ খুঁজেছেন তিনি, কবিভার। অথচ, অব্যাহত তিনি জনজোয়ারে ডাশান ক্রসরের

ডেলা। জ্যোৎস্নার মতো লোভনীয় সুখের নিমিলে কারুকৃতি তাঁর কবিতার প্রথমে হয়েছে বর্ণী। হাস্যরসাত্মক প্রতিকূলভার মতোও যে দুর্ময় স্বপ্ন ও আলাপন মানুষকে ঝড়িয়ে রাখে, সঙ্গ্রামী করে তোলে—সেই দুর্ভাগ্য রোমান্টিকতার তাঁর কবিতাগুলি সঙ্গীতবিত। মানুষের প্রেম, সঙ্গ্রাম, জীবনবোধ, আত্মত্যাগ—সব কিছুকেই তিনি দেখেছেন ওই দৃষ্টিকোণ থেকেই। মানুষের প্রতি মানুষের অবহেলা, বন্ধনা আর অসম্মানে ব্যক্তি কবি নিরবর্ণের নিম্ন, সর্বহারা, প্রান্তিক জগৎগঠীর মানব জীবিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গ্রামে ব্যাপ্ত রেখেছেন নিজেকে অনুশীল। চির অপমানিত, লাঞ্চিত মানুষের জঘন্যত্বকে বর্ণী করেছেন শব্দের কানডালে। ছড়া ও কবিতা মিলিয়ে এ পর্বত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ২৮। অনিশ্চিত দশকের প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল 'শেব পটন'। এরপর

একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে 'হৃদয়ের মুখ', 'কাল কালের ছড়া', 'প্রিজ্ঞান জ্ঞান', 'প্রাত্যহানের কবিতা', 'একুশ ও অন্যান্য কবিতা', 'বিশিষ্টচিত্ত কবিতা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। সম্ভ্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'ব্যতাসে পায়ের শব্দ' বার ইরেজি অনুবাদ 'উই আর অন দা মার্ট' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অতি সম্ভ্রতি প্রকাশিত হয়েছে অনূদিত কবিতার প্যামফ্লেট 'দলিতরা কেন জমার'। রাজনীতি এবং মস্তিষ্কের বেড়াভাল ব্যাহত করতে পারেনি তাঁর নিরন্তর সৃষ্টির উদ্দামনকে। মানবের প্রতি অবহেলা, বন্ধনা ও গোহাতের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিবাদ তাঁকে কেবল রাজনীতির আন্তরিক, অতন্ত্র কর্মীই করে তোলেনি, বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী আঙ্গিক ছড়াকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সংগ্রামে একটি নান্দনিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন

তিনি। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের এই জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশ, অসম, মেঘালয় সহ উত্তর-পূর্ব ভারত সমানভাবে আদৃত।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের মহান উত্তরাধিকার অনিল সরকার, তুমিপুরজয়ের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে গভীর মমত্ব করেছেন বেগমবান। কেননা, তাঁর কবিতা একসঙ্গে জেহাদ এবং হুজুদ। অবমানিত, অসম্মানিত, শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ তাদের হুজু, প্রেম ও অত্যাচারের বিজয়গাথা হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন তাঁর কবিতাকে। তাঁর কবিতা প্রাত্য ও প্রান্তিক মানুষের সঙ্গ্রামের হাতিয়ার—শেকল ছেঁড়ার পদাবলী। তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যের গুপ্ত এক কবরের দিকে যাত্রা—নিরন্তর।

'একলব্য'র সৌজন্যে

আবেদনকারের ১০৯তম জন্মোৎসব : কৃষ্ণনগরে

পাঁচিমবঙ্গ সরকার গত এক দশক ধরে রাজ্যের সর্বত্র আবেদনকারের জন্মোৎসব প্রতি বছর পালন করে থাকেন। এবারের ভরৎকর বন্যার পরিরেখিত নদীরা জেলার মূল উৎসব প্রতিপালিত হল গত ৪ ডিসেম্বর, ২০০০ কৃষ্ণনগর শহরের রবীন্দ্র ভবনে।

সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিনয় মজুমদার, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিষ্টার এবং একজন গবেষণাপত্রের সম্পাদক, আবেদনকার জীবনীকার নীতীশ বিশ্বাস। স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিহারত সুশীল বিশ্বাস, ডাঃ শ্রীধর দাস, লিয়ারকত আলি (এস ডি ও) আব্দুল মেমেন (ডি ডব্লু ও) প্রমুখ এবং উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় মন্ত্রী ব্যক্তিগত সচিব গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদিনের হুখ বক্তা নীতীশ বিশ্বাস

বলেন, আবেদনকার এত জনপ্রিয় যে আজ আমরা তাঁর মৃত্যুদিবসের পাশে এসে জন্মদিবস পালন করছি। ১৪ এপ্রিল থেকে ৬ ডিসেম্বর এখন কি সারা বছরই আবেদনকারকে নিয়ে নানাভাবে জনগণের মধ্যে চর্চা হয়। এই যেমন একদিকের সত্য, অন্যদিকে তাঁর চরিত্রবাহনের অশপ্রায়শ গুণ হয়েছে নানা গ্রন্থাবি রচনার মাধ্যমে আর তাঁকে অপমান করা হচ্ছে তাঁর স্মৃতি ভেঙে, অবমাননা করে। তাঁর রচিত সবেধানও আজ পরিবর্তনের নামে নানাভাবে পণতন্ত্র ধ্বংস করে বৈরতন্ত্র কার্যে করার চেষ্টা হচ্ছে। দলিত মানুষকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এ বছরের সাংগঠনিক কৃর্তী তত্বসিলি জাতি ও উপজাতিসমূহ ছাত্র-ছাত্রীরা হলেন ভীমপুর বামীজী স্কুলের সমীর মাল্যকার, বিজয়লাল ইনস্টিটিউটসের প্রবাল সরকার, শান্তিপুত্রের লিটন সরকার,

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, নলডুলিয়া স্কুলের সনৎ মণ্ডল, করিমপুর জগন্নাথ স্কুলের মিহন-রায়, বগুড়া হাই স্কুলের রঞ্জিত পাইন ও বড়জাগুলি গোপাল অকসেমির উপেন মাহাতো। এছাড়া গত ৩ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে তত্বসিলি ছাত্রীনিবাসের আবেদনকারের ওপর একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম চারজনকে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। এরা হল কৃষ্ণনগর পড়া: গার্লস স্কুলের হৌমিতা ফলদার ও সুভাগা সরকার এবং কৃষ্ণনগর সেডি করমাইকেল স্কুলের সনীতা বর্ধা ও ইশানী দাস।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে তত্বসিলি ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরা সোচ্ছন্দতা ও আবৃত্তি পরিবেশন করে এবং লিটনগরের আদিবাসী ছেলেমেয়েরা আদিবাসী সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

প্রতিবেদক : সমরেন্দ্র বিশ্বাস

জীবনযুদ্ধে সাফল্যের পথ দেখালো মেধাবী তফসিলি জাতি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প

১৯৮৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুপ্রসরিত সম্ভাষণ কল্যাণ বিভাগ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র অথচ মেধাবী তফ জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক ৪৮০০ টাকা হারে বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প শুরু করে। প্রতি জেলার জন্য ছাত্র কোটা নির্ধারণ করা হয় এবং যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনের জন্য জেলা শাসকের সভাপতিত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। মেধার ভিত্তিতে নবম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করা হয় এবং কিছু প্রাথমিক শর্ত পূরণসাপেক্ষে তারাই আবার দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে এই আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য মনোনীত হয়। মাসিক ৪০০ টাকা হারে বৎসরে ৪,৮০০ টাকা এবং পরপর দুটি শ্রেণীর জন্য মোট ৯,৬০০ টাকা যে কত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের জীবন সংগ্রামে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার ইঙ্গিত নেই। পরিশ্রমের অভিশাপে, অর্থভাবে যখন কোনও মেধাবী তফসিলি জাতি বা আদিবাসী ছাত্রের পড়াশোনা চালানোই দুরূহ হয়ে ওঠে, যখন মনে হয় এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে তখনই এই বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প তাদের আঁকার ঘুরে পড়ানোর বহু সেবার, অঙ্ককার পথে আলোর নিশাচরিত হয়ে ওঠে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এই প্রকল্পটি তিনজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ গঠনে কীভাবে সাহায্য করেছে তার কাহিনী বর্ণিত হল:

কাহিনী-১: মল ১৯৯২। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁও ব্লকের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ভাণ্ডারখোলা। ছাত্র তিন বিখ্যাত চাবছমি সঞ্চল করে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করছেন অনিলকৃষ্ণ মালাকার, জাতিতে নমস্চর। অনিলবাবুর তিন ছেলে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠরত। সংসারের স্বরত এবং তিন ছেলের পড়াশোনার ব্যয় ভার পক্ষে নির্ভর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অনিলবাবু চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। ভার গ্রীষ্ম বিদ্যালয়ে শিক্ষকত্বের সুযোগই হয়নি। কিন্তু, বংশে অনিলবাবুর ছেলেরাই প্রথম পড়াশোনা করতে কলা ব্যয় অথচ প্রত্যেকেই মেধাবী। নানা প্রতিকূলতা, সঙ্কট, প্রত্যেকেই পড়াশোনার অঙ্গহীন হয়েছিল। বিশেষতঃ মহামাপুর আশিস প্রতিবস্ত্রের মাতো এখারও প্রথম হয়ে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। পড়তে ব্যয় প্রায় দুই মাইল দূরে ন-চাঁটা হাই স্কুলে। কোনো শিক্ষকের কাছে আলাদাভাবে কোটিং করানো বোধ হয় ছেলেরাটির পরীক্ষার ফল আরও ভালো হতো। সবই বুঝতে পারেন অনিলবাবু অথচ সামর্থ্য কোথায়। কিন্তু সহায়তা এল। জেলা অনুপ্রসরিত সম্ভাষণ কল্যাণ দপ্তর থেকে বিশেষ আর্থিক

সহায়তার জন্য নবম শ্রেণীতে আশিস মালাকার নির্বাচিত হল। আশিস নবম এবং দশম এই দুই শ্রেণীতে প্রতি বৎসর ৪,৮০০ টাকা হারে বরাদ্দিত দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তা লাভ করল। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার আশিস পাঁচটি বিষয়ে সেরার সহ ৮১.৪৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করল। ১৯৯৬ সালে আশিস মেধার ভিত্তিতে আবার একাদশ শ্রেণীতে এই আর্থিক সহায়তার জন্য নির্বাচিত হলো। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পুনরায় পেল প্রতি বৎসরে ৪,৮০০ টাকা। পরপর চার বৎসর এই সরকারি আর্থিক সহায়তা আশিসের জীবনের মোড়ই ঘুরিয়ে দিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আশিস ৭১২ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করল। পশ্চিমবঙ্গের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার বসে আশিস মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুটি বিভাগেই স্থান পেল। কিন্তু আশিসের লক্ষ্য বোধ হয় আরো দূরে, তাই অচিরেই আশিস সর্বভারতীয় আই আই টি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে স্বপ্নপূরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে বি টেক্‌ কোর্সে ভর্তি হলো। সেটা ১৯৯৬ সাল। আর ২০০০ সালে আশিসের স্বপ্নপূরে আই আই টি-তে চতুর্থ তত্ত্বা শেষ বৎসর। ভাণ্ডারখোলা গ্রামে তার কৈশোরের কঠিন জীবন সংগ্রাম এখন কেবলই অতীত। সামনে শুধু এগিয়ে বাওয়ারই দিন।

কাহিনী-২: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের ছোট্ট মাঝার চারখাট। সেখানে একটি উত্তেজিত ছোট্ট দোকানে মাহ বিক্রি করে সংসার চালান সদানন্দ হালদার। জাতিতে মালো। মাহ বিক্রি করে কোনওদিন পঞ্চদশ টাকা লাভ থাকে কোনদিন ডাঙও হয় না। চাষ কামও কিছু নেই। টিপি গ্রামে ১০ কাঠা জমিতে একটি কাঁচাবাড়িতে সদানন্দবাবুর সংসার। সদানন্দবাবু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর থেকেই পৈতৃক এই মাহ বিক্রির ব্যবসা। সদানন্দবাবুর দুই ছেলে। বড় ছেলে সোমনাথ ও ছোট ছেলে হেমনাথ। দুজনেই মেধাবী, পড়াশোনার আগ্রহী। সদানন্দবাবুও চান ছেলেরা ভারি মতো পড়াশোনা ডাঙ করে মাহ বিক্রির ব্যবসার চুকবে না। অন্য মেধাবী ছাত্রদের মতোই তারাও উচ্চশিক্ষা নেবে, ভাল চাকরি করবে, জীবনে সফল হবে। মাসে গড়ে এক হাজার টাকা আয় করতে পারেন সদানন্দবাবু। এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতার কীভাবে পূরণ হবে সদানন্দবাবুর স্বপ্ন। এইভাবে ১৯৯৪ সালে বড় ছেলে সোমনাথ ৭১৬ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করল। একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনার স্বরতও বেড়ে গেল অনেক। বিশেষ কোটিং দরকার, বইপত্রও কেনা দরকার

অনেক। আর তার জন্য প্রয়োজন অর্থ। এই রকম এক সেক্টমর মুহুর্তে সোমনাথ তার কুল দলিল চাতরা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে একাংশ শ্রেণীর জন্য ছেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরে বিশেষ আর্থিক সহায়তার জন্য দরখাস্ত করল এবং নির্বাচিতও হলো। ৪,৮০০ টাকা পেয়ে সোনালবাবুর সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হলো। দ্বাদশ শ্রেণীতেও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর সোমনাথকে মিল ৪,৮০০ টাকা। সোমনাথ এই আর্থিক সহায়তা পাবার মর্যাদা রাখল। ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ৭২১ নম্বর পেয়ে সে পাস করল। পরবর্তীতে সে ছাত্ররা কলেজ থেকে ইন্টার্মি সহিতো অনার্স ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক হয়। ২০০০ সালে যখন সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম এ পরীক্ষা সেই সময়ই সে কুল সার্টিস পরীক্ষার লিখক পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। আজ সোমনাথ নিজের অকুচেঁহীকায় করে যে একাংশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ওই আর্থিক সহায়তা না পেলে হয়তো পড়াশোনা চালানোই তার পক্ষে সম্ভব হতো না। হয়তো চারখাটের মাছের বাজারই ছিল তার ভবিষ্যৎ।

কাহিনী-৩: এদিকে প্রতি বছর কুলের পরীক্ষার প্রথম হচ্ছে সোনালবাবুর ছোট ছেলে হেমনাথ। সোমনাথ যখন প্রাথমিক পাস করে তখন হেমনাথ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সরকারি

আর্থিক সহায়তা যা পাওয়া গিয়েছিল তা সোমনাথের পড়াশোনার জন্যই খরচ হয়ে গেছে। সোনালবাবু এখন আশা করে আছেন যদি প্রাথমিকে ছোট ছেলে হেমনাথ ভাল ফল করে দশমক মতো ওই বিশেষ আর্থিক সহায়তা পায়। হেমনাথের সামনে ছিল দশমক উচ্চল উদাহরণ। সে হতাশ করল না। ১৯৯৬ সালে সে প্রাথমিক পরীক্ষায় ৭২৮ নম্বর বা ৮১ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করল এবং অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তর থেকে বিশেষ আর্থিক সহায়তার জন্য নির্বাচিত হলো। হেমনাথ ১৯৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রহস্য ক্রমকৃত মিশন বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি কলেজ থেকে ৭৫২ নম্বর পেয়ে পাস করে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের সেওয়া আর্থিক সহায়তার মর্যাদা রাখল। ওই বছরই সে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাস করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হলো। এখন ২০০০ সালে সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। উচ্চল ডবিষাডের হাতছানি তার সামনে। কিন্তু তার দাবার মতোই সে কী ভুলতে পারবে যে তারের মেধা, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প !

প্রতিবেদক : সুব্রতনারায়ণ সান্যাল

বীরসা মুণ্ডার ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে সাধু রামচাঁদ মূর্মু স্মৃতি পুরস্কার



গান্ধার্য রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মূর্মু

গত ১৫ নভেম্বর, ২০০০ মেনিসীপুরের ছদ্মনিশালে বীরসা মুণ্ডার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যয়ন করেছিল গোপীবন্দ্যতপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতি এবং মহাকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে যুক্তভাবে। এই অনুষ্ঠানে সাধু রামচাঁদ মূর্মু স্মৃতি পুরস্কার (২৭ বর্ষ) প্রদান করা হয়।

বীরসা মুণ্ডার মূর্তিতে ব্যাঙ্গা ফলা নিয়ে প্রমাণ নিবেদন করেন গুণ্ডারের মধ্যে ছিলেন

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিসু, বিশেষ আদ্যবাসী এলাকা উন্নয়ন এবং পরিবহন ও উন্নয়ন বিভাগের খাড়গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মূর্মু, সভাপতি নির্মল পুসিনবিহারী বাকের, সভাপতি নির্মল বণ্ডল, গোপীবন্দ্যতপুর ১নং-এর বি ডি ও পাথ আচার্য, ডঃ সুনীল হীসনা, লোকসংস্কৃতি ও আদ্যবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য সচিব শ্রীশ ঘোষ এবং

সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উপ-অধিকর্তা ডঃ বপনকুমার মে প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে সাধু রামচাঁদ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রবন্ধ

প্রথম—মনোমোহন চুড়, দ্বিতীয়—বালকরাম সরেন, তৃতীয়—নগিন হীসনা। বিবহ—সান্তোয়, সাঁওতা আর নাহা লাকটার।

ছোট গল্প

প্রথম—সুনীল সরেন, (হিপিড় আকাব), দ্বিতীয়—গোয়টাল মূর্মু (তফাম গাভে), তৃতীয়—গোয়টাল মূর্মু (কুহুড়া গ্রুত)।

কবিতা

প্রথম—শচীন মাতি (উইহরি), দ্বিতীয়—রামদাস চুড় (খারতি) ও তৃতীয়—বর্পলতা মাতি (চুড়)—আবাড় রঙ্গ)।

প্রতিবেদক—ডঃ বপন মে

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সভাদুটির উদ্যোগে রাঁচীতে বীরসা মুণ্ডার মূর্তি স্থাপন

প্রার দেড়শ বছর আগেকার (১৮৫৭) মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুণ্ডার সম্মানী জীবনের স্মরণে বিদ্রোহে জমি স্বত্বের লড়াইকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন বিহার কৃষক সভা।

সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মরুবু জাহেদি এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও আদিবাসী নেতা উপেন কিস্তুর উপস্থিতিতে সম্মতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কৃষকসভা দুটি যৌথ উদ্যোগে কৃষক-মিণ্ডাক জোতদার-মহাজন এবং তাদের রক্ষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শহিদ বীরসা মুণ্ডার এক পূর্ণাঙ্গময় মূর্তি স্থাপন করল বিস্রোহী বীরের মুন্ডা শতবর্ষের এক অনুষ্ঠানে। কৃষক নেতৃবৃন্দ সেই সঙ্গে বীরসা মুণ্ডার লড়াইয়ের প্রাণিত হয়ে জমির লড়াই শুরু করার ডাক দিলেন। যোবণা করা হল বিহার ছুড়ে কৃষকের হাতে জমির দাবিতে লাগাতার আন্দোলন।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিহার প্রাদেশিক কৃষকসভা একটি কনভেনশন থেকে দাবি করে, জোতদারদের সিলিং বহির্ভূত সব জমি কেড়ে নিতে হবে বিহার সরকারকে এবং তা বিলোতে হবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। সিদ্ধান্ত অনুসারেই ৫ জুলাই বিহার বিধানসভার সামনে বিক্রান্ত মোহান্তে বান কৃষকসভা। কিন্তু সেখানে পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করে। এর প্রতিবাদে ১৪ জুলাই রাজেন্দ্র নানা স্থানে পথ অবরোধ করেন কৃষকরা। রাঁচি জেলার বুলুতে বীরসা মুণ্ডার মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে

এক অনুষ্ঠানে বিহার প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক বিজয়কান্ত ঠাকুর বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেন।

অনুষ্ঠানে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন সর্বভারতীয় কৃষকসভার নেতা মহাবুব জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী উপেন কিস্তুও।

বুলুতে মূর্তির আবরণ অনুষ্ঠানে উপেন কিস্তু বলেন, এই তো জাতীয় সড়কের দু'শাখের জমি এখন আর আদিবাসীদের দখলে নেই। তাঁদের পরের জমিতে কাজ করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার জমির সম্পদের ওপরেও আদিবাসীদের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এখানে সে সব কোথায়?

মহাবুব জাহেদী বলেন, ব্রিটিশ শাসকরা চলে গেলও এখানকার আদিবাসীদের অবস্থা পাটোয়ারি। তার কারণ অসৌ ভূমিসংস্কার হয়নি বিহারে। আর এই দাবিতে যাতে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন গড়ে না ওঠে তার জন্য বি জে পি এবং ভূস্বামীরা জাতপাড়ের বিভেদ তৈরি করছে।

দুই রাজ্যের কৃষকসভা মূর্তিটি যেখানে কসল সেই বুলু রাঁচি শহর

থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে, রাঁচি থেকে চাটা রোড ধরে জানেশনপুর যাওয়ার পথে। এমনিত্তেই রাঁচির জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক আদিবাসী-উপজাতি, বুলুতে তাঁদের অনুপাতটা আরও বেশি। বেশির ভাগই মুন্ডা অর্থহীন ওরাও। বুলু থেকে আরও ৪০ কিলোমিটার দিগন্তের উলিহাতির চালকানে ছিল বীরসা মুণ্ডার বাড়ি। একশো বছর আগে জমিদার, মিসনারি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এখান থেকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মুন্ডা বিদ্রোহের আতন। আদিবাসীদের জমল পরিভার করে তৈরি করা জমি চলে গিয়েছিল জমিদারদের হাতে। আদিবাসীরা তাই বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে নেমেছিলেন 'মুণ্ডারাজ' প্রতিষ্ঠা করতে। 'মুণ্ডারাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু একশো বছরে কতটা পাশটোছে ছোটনাগপুরের এই মালভূমি অঞ্চল?

বৃষ্টি সঙ্কটে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিদ্ধান্ত, হাজারিবাগ, বানবাণ প্রকৃতি স্নানগা থেকে প্রচুর আদিবাসীরা এসেছিলেন। এসেছিলেন পুন্ডলিরা থেকেও অনেকে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিহারের কৃষকনেতা রাজেন্দ্র সিং মুন্ডা ও সুকল মহান্তো। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতা জহর ভট্টাচার্যও। বীরসা মুণ্ডার মূর্তিটি তৈরি করেছেন বাঁকুড়ার জয়পুরের শিল্পী শ্যামাশ্রম সীতারা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা মূর্তি তৈরির ব্যয়ভার বহন করেছে।



সাম্প্রতিক প্রবেশের ক্ষেত্রে ডা. রূপন দে ওশিজন-বিশ্বনাথ পাঠ করছেন

ওশিজনের প্রত্যেককে ১০০০ টাকার ড্রাকট, ভাষাপত্র, পুস্তি ও শাল সেওয়া হয়। ওশিজনদের সংশ্লিষ্ট পরিচয় সেওয়া হল।

ওশিজন সম্পর্কে দু'চার কথা
রত্ননাথ সরেন : বাঁকুড়া, কুটকল
বেলোরাড়

'বাবুলাল সরেনের পুত্র রত্ননাথ সরেন বাঁকুড়ার রাউতোরা গ্রামে ১৯৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সূর্য গ্রামে নিজা অভাব অনুভবের সঙ্গে লড়াই করে তিনি কুটকলের অনুশীলন করেন। যার ফলে গেমসে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে সাই (Sai) কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। জাতীয় অণ, সুব্রত মুখার্জি অ্যেথলেটিক্স ক্লাব, সাই স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া ট্রেনিং সেন্টার কুটকল ট্রান্সমেন্ট ও আরও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জাতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অতি জর ব্যৱসেই এক বিশেষ নক্ষিত সৃষ্টি করেছেন।

যোগেশ্বা প্রসাদ সরেন : পুরুলিয়া,
মেঘক

'গোবিন্দ সরেনের পুত্র গোমস্তা প্রসাদ সরেন পুরুলিয়া জেলার বাঘোয়ান থানার উলবনি গ্রামে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশার বুদ্ধিমান ছেলের প্রাথমিক শিক্ষক। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি সাঁওতালি পত্রিকার যেমন 'পশ্চিম বাংলা', 'হরসংবাদে' বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর উল্লেখ্য বই হল 'আখড়া ধৃতি', 'অশ্বপাল ডায়ারি', 'সাদেসে-ধন' ইত্যাদি। 'গোওগোজ' নামে এক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেন ও পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজ-শিক্ষণ ও সংস্কৃতির তিনি সত্যপতি।

তিনি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংবেদিত হয়েছেন।

পরিমল হেমব্রম, পশ্চিমী, বেহালা,
কলকাতা

(মার্শাল হেমব্রম এই ছদ্মনামেও পরিচিত) বাঁকুড়া জেলার সারোদা থানার অন্তর্গত চৌতাড় গ্রামের 'বাদলচন্দ্র

হেমব্রমের পুত্র পরিমল হেমব্রম ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাস করে বর্তমানে আকাশবাণীর সাঁওতালি বিভাগের প্রোগ্রাম এডিকিউটিভ। তাঁর সাঁওতালি ভাষার রচিত কবিতা, নাটক, গদ্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস পুস্তকসমূহের ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই সব রচনা বাংলার এবং অন্যান্য ভাষায়ও অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বহু নাটক আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে তাঁর অনুদীপ্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'গোস্টমাস্টার' গল্পটির নাট্যরূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেতারে নাট্যশিল্পী এবং প্রযোজক হিসেবেও সুপরিচিত।

মতিলাল মতি : হাওড়া

'কদম মতি'র পুত্র মতিলাল মতির জন্ম ১৯৩০ সালে বাঁকুড়া জেলার সারোদা থানার জামদোল গ্রামে। ইনি সাঁওতালি ভাষার এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি প্রথম আদিবাসী সংস্থা 'আখোআখা গাঁওড়া' গঠনের সময় সক্রিয় অংশ নেন। এই সংস্থার মাসিক পত্রিকা এডেনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম বাংলার প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এ ছাড়াও বহু গল্পের বই, গানের বইও প্রকাশনা করেছেন। শৈশবের উপর একটি বই সাঁওতালিতে অনুবাদ করেন। এবং সাধু রামচাঁদ অনলমাল্য প্রদ্বের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ আয়োজিত রাজ্যভ্রমের বার্ষিক সাধু রামচাঁদ মূর্তি শ্রাবক প্রতিযোগিতায় বিচারকের পদ অলংকৃত করেন এবং তিনি সাধু রামচাঁদ মূর্তি গবেষণাপত্র প্রদান কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য।

উত্তর দিনাজপুর জেলা ২য় বর্ষ সার্বজনীন কর্মপূজা



কর্মপূজার অনুষ্ঠান

অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার পরিচালনার ছোট পার্কে মিশন মোড় ২য় বর্ষ ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং যা ১৪০৭ সালের ২০ ভাদ্র একাদশীতে কর্মপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার সকল প্রশাসন দপ্তরে আমন্ত্রণপত্র প্রদান করা হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলা অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ থেকে নবরত্নাব সরকার ও সমাজসেবক দমচন্দ্র বণ্ডল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিগণকে আকর্ষিত করার জন্য প্রদান করা হয়।

কর্মপূজা বা উৎসবের ইতিবৃত্ত :
কর্মপূজা বা কর্মসেব আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক সার্বজনীন উৎসব। প্রধানত আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোড়া, মুড়া, ওঁড়াও ঘড়াও আত্মা কয়েক গোষ্ঠীর মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত আছে। পূজার সম্পূর্ণ প্রকৃতির পূজা প্রকৃতিস্থিত সমগ্র জীব-জগতের মঙ্গল কামনা ও ভাগ্য

বিধাতার পূজা। উচ্চ, নীচ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদভেদ এবং হিসে ও ক্রেন ভুলে গিয়ে সকলের একাত্মতার ও মহামিশনের পূজা উৎসব আত্ম তা সমাজে এক সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠাপন করেছে। ফলে এই পূজা আয়োজকদের মধ্যে মধুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাদ্র মাসে চারিদিকে কশফুল ফুটলেই সকলের মনে পূজা উৎসবের সড়া জেগে ওঠে। এই সময় ভাইদের মনে পড়ে বোনকে আনতে যেতে হবে। তার জন্য একটি গান প্রচলিত আছে :-

কাশি ঘুটালো, আলা লাগালা হে
কাশি ভাই, আরে ভায়া, এত সেন্ধিয়ার

একদিন কর্মবাহু অগণন সংসার নিয়ে বিচ্ছিন্নতার পর পরিবারে ভাইবোন ও সকলের মিলন হয়। তা গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পূজার (করম) ভাগ্য দেবতাকে আরাধনা করা হয় এবং সমাজের মঙ্গল কামনা করা হয়। মানবজীবনের রীতিনীতির মধ্য দিয়ে সংসার চক্রাঘারয় সংকর্ম করা ও ধর্ম পালনের উপদেশ দেওয়া হয়।

কথিত আছে কোনও এককালে মানুষের মন থেকে ধর্ম-কর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তার ফলস্বরূপ পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অন্যদৃষ্টিতে কলস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীরা সব অনাহারে প্রাণ হারায়। প্রকৃতিসৈন্যী রুটি হয়ে ধ্বংস শুরু করলেন।

সেই কলঙ্কময় পৃথিবীতেও সত্যের আলশ ছিলেন দুই ভাই—ধর্ম ও কর্ম। জীবজগতের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দুই ভাই ভগবানের শরণাপন্ন হলেন। বড় ভাই, ধর্ম—তিনি ছিলেন ধর্মবাহু এবং ছোটভাই, কর্ম—তিনি ছিলেন কর্মবাহু। ধর্ম সব সময় ভগবানের নাম-জপ নিয়ে

থাকতেন আর কর্ম কর্ম করেই সংসারের সমস্ত কিছু দেখাশোনা করতেন। সুদৃঢ়ভাবে পরিচালনা করেও দিনের শেষে দেখা যেত বড় ভাই ধর্মি অথবা ছোট ভাই ন। দিনের পর দিন এইভাবেই কটতে লাগল। তার একাধি অবস্থার জন্য তিনি নিজের ভাগ্য অর্থাৎ করমকে মোসারোপ করতেন। নিশ্চয় করম দেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। দুভাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

এমন সময় এক সৈববালী হল (করম) ভাগ্য দেবতা বিমুখ হয়েছেন। তাকে পুনর্জীবিত ও ফিরিয়ে আনতে ক্রিয়া ও ধ্যান উপাসনার প্রয়োজন। তার ফলে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি বিরাজ করবে। 'ক্রিয়া' বলতে সমুদ্রপারে নক্ষত্র ভাঙ্গার মতো জ্যোতির্বিদ গাছটির ডাল এনে পূজা করতে হবে এবং তার মাথাব্যক্তি প্রচণ্ড করতে হবে। ক্রিয়াকর্মের মন্ত্রশাস্তা হলেন প্রজ্ঞালিত গাছটির সাধুবাবা।

সেই 'সৈববালী' অনুসরণ করে সৈবপাথের খোঁজে ধর্ম, কর্ম অনিশ্চিত ব্যস্তা করলেন। বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, সাগর, নব-নবী পেরিয়ে দিতে পতঙ্গের সম্মুখীন হতে হয়। মানারকম বাণা-বিদ্রু অতিক্রম করে সৈবপাথের ডাল নিয়ে আসেন ও যথাস্থানে স্থাপন করেন। প্রথা অনুযায়ী পূজারির উদ্ভাষিকারি হবেন বড় ভাই, কিন্তু বিশেষ শর্ত অনুযায়ী ছোট ভাই কর্মকে পূজার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কারণ—পার্থিব জগতে বস্তু নিষ্ঠাবান ও ধ্যান উপাসনার মন থাকেন তাঁরা নিয়মনি উপাধি লাভ করেন। কিন্তু পার্থিব জগতে কর্ম ছাড়া সকলই বিফল। কর্ম নিয়ে আসে সৌন্দর্য, সুখ ও শান্তি। কর্মছাড়া অম, বস্তু হবে না ও মনে শান্তি থাকবে না। শান্তি না হলে কেনও কর্ম গলন হয় না। তাই কর্মকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং সেই সূত্র অনুযায়ী পূজাটি কর্ম পূজা বলে পরিচিত। এই পূজার মাধ্যমেই 'বর্ষ ও কর্ম'-র আশ্রম ও পৃথিবীর শান্তি স্থাপিত হয়।

কর্মপূজার নিয়মবিধি :

কর্মপূজার অনেক নিয়মবিধি পালন করা হয়। এই পূজা হল বয়োরারি পূজা। কেনও একক পূজা নয়। কিন্তু মনোমাত্রা পূর্ণ হলে এককভাবে পূজাও করা হয়। ডায় একাদশীর পাঁচদিন পূর্বে ৫-৭ জন কুমারী ও একজন কুমার অধিবাস ব্রত গলন করে। এছাড়া অন্যান্যরাও ব্রত গলনা করতে পারে। বাজনা সহযোগে ব্রতচারীরা নতুন ডলার মাটি ভরিয়ে রাখে এবং সেই ডলার সমস্ত বস্তু শস্যবীজ বোনা হয়। ডালাগুলি প্রায়ের বিনিময় হয় বা মোড়াল তাঁর এককী নির্দিষ্ট দেওয়া হয়। ব্রতচারী ছাড়া সেই পবিত্র ঘরে প্রবেশ ও ডালা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।



কর্মপূজার সৈবক সামান্য হলে

সেই সন্ধ্যায় আগমনী গান সহযোগে করম দেবতাকে জাগ্রত করা হয়। পাঁচদিন ধরে ব্রতচারীরা ধূপ-শূন্য ও গানের মাধ্যমে জগত (ডালা) জাগরণ করে। ব্রতচারীদের এই পাঁচদিন ধরে কঠোর নিয়মবিধির মধ্যে থাকতে হয়। কারণ, নিয়ম লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। পক্ষম বিনে সারা ত্র্যম্বিকানী নৃত্যপীত সহযোগে করম দেবতার আখড়া জাগ্রত করা হয়। ডায় একাদশীতে পূজা বেশি তৈরি করা হয় এবং সন্ধ্যায় সকল ব্রতচারী সহ গান গেয়ে মহাসমারোহে করম ডাল কেটে বেদিতে স্থাপন করা হয়। এরপর ব্রতচারীরা পূজার অর্থ ও প্রজ্ঞালিত প্রদীপ নিয়ে পূজামণ্ডপে উপস্থিত হয়।

পূজারির নির্দেশমত করম দেবতা ও পূর্বপুত্রের নাম স্মরণ করে পূজাশালী দেওয়া হয়। এরপর পূজা বেশির চারিটিকে ডিনবার প্রবন্ধি করে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করা হয়।

এরপর কাঞ্চী অর্থৎ ধর্ম ও কর্ম নৃত্যের আদেশ ও অনিশ্চিত ব্যস্তাপথের ঘটাবলী বর্ণনা করা হয়। কাঞ্চীনাশে ব্রতচারীরা নৃত্যের তালে তালে ভাগ্য দেবতার নাম স্মরণ করে পূজার অর্থ সমর্পণ করে। সেই রাত্রিতেও ব্রতচারীদের উপবাসী থাকতে হয়। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এরপর সকালে ব্রতচারীরা শুদ্ধ হয়ে পূজার্চনা করে, বিদায় সন্ধ্যায় জানায় এবং আগামী বছরের শুভ কামনা করে। দেবতার কাছে সকলের সুখান্তের ও সকল জাতিভাইদের কল্যাণ কামনা করা হয়। সকলে যেন বর্ষে নিবিষ্ট ও কর্মে অটুট থাকে। সর্বশেষে দলবদ্ধ হয়ে বিদায় গান ও বাজনা সহযোগে নদীতে বা পুকুরে করম ডাল বিসর্জন দেওয়া হয়। এই কর্মপূজার ভাণের হল বর্ষ এবং কর্মই মানুষের আশ্রম।

সকলক : সূচনান নাগবন্দী, সতীশ নাগবন্দী, কার্তিক দিগ

উত্তর দিনাজপুরে হল উৎসব

(दिग्दर्शक आचार्य)



হল উৎসবের শোভাযাত্রা

পড় ৩০ জুন, ২০০০ উত্তর
বিনামূল্যে অনগ্রসর সম্ভার্য কল্যাণ
কল্লের আনুষ্ঠান এবং ইসলামপুর
সমিতি উন্নয়ন আধিকারিকের
পর্যচালনার ইসলামপুরের স্বেচ্ছাশ্রম
মাধ্যমে হল উৎসবে ইসলামপুর,
চোপড়া, গোরালপোখর থানার
আধিকারিক উপস্থাপন করেন। এই
উৎসবে স্থানীয় বহু পরিমাণে কতি
যোগদান করেন। উৎসবের উদ্বোধন
করেন স্থানীয় মহকুমা দাসক এস
যানারি। মালতী মেহরম সভাপতির
আদান গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য
স্থায়িক ছিলেন মেথারায় মণ্ডল, সমিতি
উন্নয়ন আধিকারিক, ইসলামপুর এবং
মালতী মেহরম, সভাপতি, ইসলামপুর
পঞ্চায়েত সমিতি। এছাড়া অনুষ্ঠানে
সহযোগিতা করেন সেনাই মতি ও রেনী
মতি প্রমুখ আধিকারিক। এই অনুষ্ঠানে
ভীর নিকপ, মৌড়, মিলিকাল চোর।

নাও ও হাডুড প্রকৃতিতে অসিবাঙ্গীরা
অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা মণ্ডল
থেকে বিশিষ্ট বস, ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প
অধিদপ্তরিক ও নবোদ্যোগ সরকার,
পরিবর্তক, এবং শ্রীযামজ্ঞ মণ্ডল
সমাজসেবক অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া
প্রাক্তন জেলা পরিবাসের সদস্য সজ্ঞনা



ଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା-ନାଥ ସାମାଜିକ ସେବା ସମିତି
ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନା ସମିତି

মুর্খ, ভবেশচন্দ্র সাহা এবং নীরোদ কর
উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম ও বিজয়ী স্থান আধিকারিকগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার তোলা মহকুমা শাখা, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্যশাখা, ডাফসিঙ্গি জাতি ও অসিবাঙ্গী, কুপ্যাণ ও বৃন্দ নিগম ও ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প আধিকারিক এবং কৃষ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগণ বিতরণ করেন। সকলের সম্মুখাংগে অনুষ্ঠানটি প্রণবস্ত হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত আধিকারিকগণ এই হল
উৎসবের তাৎপর্য এবং সরকারি মাধ্যমে
অনুপ্রসন্ন স্বস্ত্যায় কৃপাণ নগুরের
মাধ্যমে করার যুক্তিকে তুলে ধরেন। এর
পর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে
সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
প্রতিবেদক : শ্যামলাল সরকার ও জীবনচন্দ্র মন্ডল

মনোরঞ্জন বড়াল ছিলেন সর্বভাগী বিপ্লবী

স্মরণসভায় নেতৃত্বদেবের শ্রদ্ধা নিবেদন

মনোরঞ্জন বড়াল ছিলেন সর্বভাগী বিপ্লবী। তিনি দলিত শ্রেণীর মানুষ হলেও ছিলেন মুক্ত কথিউনিষ্ট। তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিভিন্ন লেখা থেকে অস্বাভাবিক ভাষাচ্যুতনার যে রূপ পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে, তা থেকে তাঁকে কথিউনিষ্ট তাত্ত্বিক প্রকারের দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ বলে চিহ্নিত করতে হয়। তাঁর পঞ্চ-সংকেতের পরিকা পড়ে দলিত মুক্তির সাক্ষেত পাওয়া গিয়েছিল।

মনোরঞ্জন বড়ালের জীবন ও অবদানকে বিহীন দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে নেতৃত্বক উপরোক্ত মর্মে মতব্য করেন।

গত ২০ ডিসেম্বর ২০০০ ঐকতান গুরুবণা পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সভাপতি, দেশহিতৈষী পরিচায়ক সংবাদ তালিকা, প্রাক্তন বিহারত, বিশিষ্ট লেখক ও মার্কার যমী দলিত আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা সদ্য প্রয়াত মনোরঞ্জন বড়ালের স্মরণসভায় আয়োজন করা হয় কলকাতার কাঁকড়াগাছি রোডে সি আর আই অফিসেরিয়ায়। ঐকতান গুরুবণা পত্রের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের অন্তঃসর সঙ্গীতার কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী নীলেশ ভাঙ্কর। তিনি ঐকতানের 'সোয়েন চন্দ্র সংখ্যার' উদ্বোধন করে পরিকাটি কুলে সেন সভার উদ্বোধক ত্রিপুরার শিক্ষা ও অন্তঃসর সঙ্গীতার মন্ত্রী কবি অনিল সরকারের হাতে।

ভারত বিপ্লবের কথিতোক্তিত সম্বন্ধেয় তুমিকা বিষয়ে বিশেষত্ব এই মনীষীর সুখির প্রতি নিবেদিত কথিতা পাঠ করেন কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায়, নতক চট্টী, অনিবার্ষ লত ও সুভাষ মলিক; এছাড়া বক্তব্য রাখেন চতুর্থ পুনিজা পরিচায়ক সম্পাদক কলিল চাকুর, ঐকতান সম্পাদক নীতীল বিশ্বাস, পাতাত্ত্বিক সেক্ষক শিষ্টী সয়েবের অধ্যাপক জ্যোতি নব ও বড়ালের অনুজ্ঞ-প্রতিম সৌরী হালদার প্রমুখ।

সভার কুল সৌরী বড়ালের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাঁর ফনিষ্ট বন্ধু ও বিশিষ্ট মানুষেরা, বড়ার প্রাণে উত্তরক শিখারিষ শিশির চন্দ্রবর্তী, প্রবীণ সাংবাদিক ও সম্পাদক হীরাশে লত, শ্রীমতী সুনীতি বিশ্বাস, ড. গারবী বিশ্বাস, বন্ধু নীলকান্ত ভক্ত, সহযোগী বিপ্লবী বনিক নেতা সুখীর মুখা, জননেতা হবি সরকার ও অমরেশ ভট্টাচার্য, সি আর আই-এর বন্দন যে, অগ্ণাশক, জলবর মলিক (সাক্ষরতা সন্থিতি), মূল্যাল বিশ্বাস (সেক্ষক শিষ্টী সয়ে) জনল বিশ্বাস

(উত্তর সেক্ষ), অমর বিশ্বাস (লিষ্ট সন্থিতি), সুভাষ মলিক (পঞ্চ সংকেত) কবি সুনির্মল কুণ্ডু (তৎসম), পাঁচকতি সারক (সামান্য) পাকেরীকৃষ্ণ নারত (প্রকাশক ও সমাজসেবী), নিবন্ধন মওল (ঐকতান), কবি শ্যামল প্রামাণিক, গোপাল বিশ্বাস



মনোরঞ্জন বড়ালের স্মরণসভায় মলিক নেতৃত্ব (বনিক সেক্ষ) পশ্চিমবঙ্গের অন্তঃসর সঙ্গীতার কল্যাণ বিভাগের ভারতের মন্ত্রী নীলেশ চন্দ্র ভাঙ্কর, ত্রিপুরার শিক্ষা মন্ত্রী কবি অনিল সরকার এবং মনোরঞ্জন বড়ালের অনুজ্ঞ-প্রতিম সৌরী হালদার

(সুখী), কপন দাস (পালিকৃত), ব্রজীভ ভারতীর মূল্যাল সরকার (প্রাক্তন চ্যুর সন্থিতি), আকল (চ্যুর সয়েন), মনীষ সেক্ষ (চ্যুর সন্থিতি) কুল ভক্ত ও ড. সোয়েনক সিং (মতি বিভাগ), অধ্যাপিকা প্রমদা মওল, রণেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সৌতর সরকার (জমীন্দরী সন্থিতি) প্রমুখ।

সভার উদ্বোধক ত্রিপুরার মন্ত্রী ও কবি অনিল সরকার মনোরঞ্জন বড়ালের মনীষা, তত্ত্ববিদ্যাল ও সঙ্গীতাল প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর কথিউনিষ্ট জীবন ও কথিউনিষ্ট

পন্থিকে জনমনোযোগে রাষ্ট্র। আসন বন্দন তাঁর সেক্ষক, শিষ্টী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের তুমিকার কণা করেন। তিনি বলেন যে, সেক্ষের দলিত ও নিপীড়িত মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে সংগ্রাম সংগ্রামে মনোরঞ্জন বড়ালের যোগদাতা ছিল প্রজ্ঞাত। ভারতে কল নিপীড়নের অন্তর্গত ইতিহাস বর্ণন করে তিনি বলেন যে, প্রথম ব্রিটিশল থেকে এদেশে শাস্ত্র ও মনুষ্যহিতা সমাজে অধিপন্য বিস্তার করে চলেছে, এসব পাদক ও শোষণ শ্রেণী নিপীড়নের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। হিন্দুধর্মের দুলকথা, মনুর অনুশাসন প্রাচীন পাদন ও

সোময়ের দ্বারা বেদের যুগে ছিল না বলে উদ্দেশ্য করে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে সে যুগে একই পরিবারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের পর হিন্দু-শূদ্রের ব্রাহ্মণ ধর্মের অধিপন্যে কল বিভাগের সুভাগত। ইয়েজরা এদেশে এসে এই কল বিভাগের দুল যুগে পেল না। কাষ্ট্রা (Caste) কথারি সয়ে তাদের পরিচয় ছিল তার অনুকরণেই কাস্ট (Caste) কথারি ভেদী করল তারা। বিশ্বের সভা সমাজে কথারি কোনও অস্তিত্ব ছিল না,

কিন্তু ভারতে আছে। 'বর্ণ' হল রঙ। কিন্তু ভারতে এর অর্থ জাতপাত—ভেদ। করল ব্রাহ্মণ। গরুর জোরে দলল করল সমাজের কন্নডা এবং কেনও কিছু নিয়োগ না করেই এদেশের অধিকাংশ মানুষের সামাজিক ও বৈবাহিক কর্মতা দলল করে জাতি-বার্ণাক্সের মধ্যে নিল তার অনুপাত অনুসরণে মধ্য—

করির পেল রাষ্ট্রপাদনের অধিকার, বৈদ্য নিল অধিকা; কিন্তু হুদু নিকিড হল 'নীচ' করছে—হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কখনও শূত্র হই না, শূত্র কখনও পুত্রহিতের অধিকার দান করে না। তাই আবেদনকার এই কণ্ঠস্বরকে বসেছেন অবশেষে শ্রোয়ী ছেলে। মার্কস বলেছেন, মানুষের ইতিহাস হলো সঙ্গ্রামের ইতিহাস। ভারতে শ্রোয়ী সঙ্গ্রামের উন্মত্তবিরক্তকে দেখে করছে বর্ণ। মার্কস বলেছেন মানুষের সামাজিক ও বর্ণবিদ্বেষ তার হই উৎপত্তি। মার্কস এবং পেনা বা কাল। মার্কসের অবিচ্ছিন্ন উদ্ভূত মূল্য ও শ্রোয়ী। আবেদনকারের অবিচ্ছিন্ন নির্দেশ ও শ্রোয়ী। মার্কসের প্রলোভনগিরেও নিম্ন, আবেদনকারের দলিতেরা নিম্ন এবং অস্পৃশ্য। শ্রোয়ী সঙ্গ্রামে ভারতবর্ষে কর্ম মার্কস এবং বি আর আবেদনকার পরস্পর পাশাপাশি দ্বন্দ্বিত। আবেদনকারের ভাবনাও তাই মার্কসের কাছাকাছি : 'বর্ণবিন পর্ব্ব জাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য করা না হায়ে ততদিন দেশের কণী-পরিষ্করণ শ্রোয়ী চেতনা জোরকর হবে না। শ্রোয়ীই সমাজ গড়ার গায়ে সমাজকে জড়িতীয় করতে হবে। তারপর হবে শ্রোয়ীই সমাজ।'

মন্ত্রী অনিল সরকার আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও ভারত শ্রোয়ী শোষণ' ও বর্ণ বিভাজনে শোষিত ও দলিত। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্বপ্নটি তা বি আর আবেদনকার ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের উদ্বোধনী ভাষণে সঠিকভাবে : 'আজ আমরা রাষ্ট্রপতিত্ব সমানতাকার প্রতিষ্ঠা করছি : কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে রোষে নিম্নি অসামান্য। হত ক্রম সত্ত্ব এই পরস্পরবিদ্বেষী সমাজে দূর করতে হবে। নতুন বাজা এই অসামান্য বন্ধি ছেদে, তাঁরাই এত পরিচয় করে এই বলে সে সামাজিক পলতের কঠোরই ভেদি করছে, তারক চরিত্রের বেধে।' তিনি অনিল সরকার বলেন যে, আবাসের মেলে পলতের অসামান্য দায়-বিভাজের থেকে সমাজকেই উপেক্ষিত। সামাজিক আবেদনকার তৎকালীন নেতারা

অধিকাংশই বর্ণবাদের সামাজিক অধিকার শিল্পার হয়ে পড়েন। বর্ণবিভাজনের অত্যাচারে তাঁদের সামাজিক তত্ত্ব অসম্পূর্ণেই বিবর্ণ হয়ে যায়। একেবারেই আবেদনকারের আদ্য—সমাজকে শ্রোয়ীই ও বর্ণবিন করতে হবে। কেননা, শ্রোয়ী মানুষকে করেছে পরিষ্কার আর বর্ণ মানুষকে করেছে দলিত। আবেদনকারের জাতি, যাদের কিছুই নেই তারা সবথার আর তারা কিছুই নয় তারা দলিত। এদের সঙ্গ্রামই বৈবাহিক সঙ্গ্রাম। এই সঙ্গ্রামই ভারতে দলিত শোষিতের নয়া মানব মুক্তির সঙ্গ্রাম। শ্রোয়ী ও জাতপাত উচ্ছেদের দৃষ্টান্তিকার।

তিনি বলেন যে, এহেন অসামান্য সঙ্গ্রামের নলী মনোজ্ঞান বজায়ে বিধির রানার ঘূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি কলভেন, গলার মাকলার বর্ণকে চিহ্নিত্য হই না। সামাজিক নায়ের সঙ্গ্রামের মধ্য নিয়ে আদ্য চিহ্নিত্যার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তিনি।

পুরী শব্দরাজ্যের উক্তি উদ্ধৃত করে অমিলবানু বলেন যে, নারীর শৈলার অধিকারহীনতার তার মন্ব্য আবেদনকার নাক করেছিলেন হিন্দু নারীর সমানতাকারের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। উদ্ধৃতির বিবরণিতা মেলে না নিয়ে তিনি পথভাগ করেছিলেন। মনোজ্ঞান বড়ল আদ্যের বেধিরেছেন—শ্রোয়ী সঙ্গ্রাম + জাতপাত সঙ্গ্রাম = বিব্রণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মণতত্ত্ব ভারতের দিব—মনুর বিধান বৃন্দিত অককার। নার্যদিগিণার বলেছিলেন সমাজের নিম্নলতা, হল সরল বিবাহ। এই বিব্রমুত জাতের গঠনে, এই নিম্নলতার বিচ্ছিন্নে মনোজ্ঞান বড়ল কলম ধরেছিলেন। সে কাজ স্বাধীনতা করাই তার প্রতি প্রকৃষ্ট দ্রষ্টা নিকেন।

সত্যাপ্তি মীনেল জাকুরার লজ্জাজ্ঞান মনোরঞ্জন বজায়ে একনিষ্ঠ সঙ্গ্রামের প্রতি শ্রোয়ী ও দলিত সঙ্গ্রামীদের বহনিত্যার উদ্দেশ্য করে অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং ভূপ্রসার সত্যাপ্তি কল্যাপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মনোজ্ঞান জাকুরা বলেন যে, তার লেখা দুটি বই পড়ে তিনি তাঁকে মনোহরেন : কিন্তু তিনি যে দলিত যাদের মানুষ তা তিনি জানতেন না। তিনি দলিত কয়টিমিলি ছিলেন। তাঁকে তিনি মনোর তান্ত্রিক ও সৈনিক বলেই জানতেন।

পথ-সংকেত পত্রিকা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ ও সহায়তা চেয়েছিলেন বলে

উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, কয়েকখানা পত্রিকা পড়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, পত্রিকাখানি দলিত সমাজের মুক্তির লড়াইয়ের সহায়ক হবে। পত্রিকাটি কেন দিকে ইন্দ্রা করছে গ্রন্থ ভুলে মন্ত্রী বলেন যে 'পথ নির্দেশ' ব্যবস্থার করা হয়তো সমস্ত ছিল। বিবাহটির অসামান্য 'সংকেত' থেকে 'নির্দেশ' এর গ্রন্থ লেখা নিয়েছে।

মন্ত্রী জাকুরা সমাজ বিভাজনের অসামান্য করে বলেন যে, প্রথম বিভাগ থেকে বিশেষভাবে সবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিব্রের এই প্রথম বিভাজনকে সামরিক ব্যবস্থা বলে করণ করে তিনি বলেন যে, আজ যে চাবের কাজ করছে, কল হাওয়া যে গ্রামের কাজ করছে পরে। নার্যদিগিণার উদ্ধৃতি নিয়ে তিনি বলেন যে, অর্থনীতিক নিয়মদুস্টারী এক সময়ে প্রথমিতিক ব্যবস্থা থেকে হিসে ভিলে দ্বারী বর্ণ-বিভক্ত সমাজের উৎপত্তি হয়েছে। দলিত ভারতের এক দেখেছো উদ্ধৃতিতে তিনি বলেন যে, এ-যাবস্থটি একদিন মুছে যাবে। কৈকটীর উপস্থান করণ করে তিনি দেখান যে, রাজা দলরখের সময় জাত-ব্যবস্থা ছিল না। তিনি বলেন যে, রাজার মেলে রাজা হয়ে—এভাবেই চলছিল : ব্যবস্থাকে দ্বারী করতে দিয়ে জাত-ব্যবস্থা ভেঙে হয়েছে, সেই ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য মনু তাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। রাজার সমর্থনেই তা সম্ভব হয়েছিল। বর্ণবিভক্ত দিকে রাজার সমর্থন না পেয়ে সঙ্গ্রামিতকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবর্ণের উপর বর্ণজোড়িত নিম্নজন নেই বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন যে, উল্লেখ্যর ও মহারাষ্ট্র এদেশে বর্ণের নিম্নজন চলছে। বিব্রির ক্ষেত্রে অসামান্য জাত ও শ্রোয়ী এর দুটি উঠে এগিয়ে—যাত্রা আবার শ্রোয়ীর নয়, তারা কি আবার সঙ্গী হবে? দলিতদের মধ্যে বাজা বিভাজন শ্রোয়ীকৃত তাদের প্রতি আমার মনোভাব কি হবে? জাতই কি একমাত্র নির্ণায়ক? শ্রোয়ীপত্তবোধ আমার সহকর্মী হলে, সে অভিজাত হলে তার প্রতি আমার মনোভাব কি হবে? মনোরঞ্জন বজায়ে লেখা থেকে এসেছে উক্তর মেলে।

পথসংকেত পত্রিকাকে সংকেত থেকে পলিতদের দিকে নিয়ে যেতে পরিলে মনোরঞ্জন বজায়ে কাজ এক বাণ এধির নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

কোচবিহারে ধরলা নদীর উপর নবনির্মিত রথবাড়িঘাট সেতুর উদ্বোধন



সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে মন্ত্রী গীতেশ ভট্টাচার্য ও পুর্নমন্ত্রী কিষ্টি গোস্বামী প্রভৃতি

কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত দিনহাটা গোপানিয়ারি সড়কে ধরলা নদীর উপর নবনির্মিত রথবাড়িঘাট সেতুর উদ্বোধন হল গত ১৪ জুলাই, ২০০০। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিষ্টি গোস্বামী এই সেতুর উদ্বোধন করেন।

উত্তরবঙ্গের অনুরূপ জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহার সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলা। দিল্লির লিক দিয়ে উন্নতি না হলেও রাস্তাঘাট, সেতু, কাপড়টি প্রকৃতির নিক থেকে প্রকৃত উন্নতি হয়েছে। মন্ত্রী কিষ্টি গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন আগেই মানুষের অনেকদিনের নুখ-কণ্টের লাঘব ঘটিয়ে কোচবিহারের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগকারী সেতু জোখা সেতুর উদ্বোধন করেছেন।

মন্ত্রী মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, ধরলা নদীর উপর সেতু তৈরি

হওয়াতে মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার এসেছে। ওপারের ৪/৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় এক লক্ষ মানুষের উপকার হল। বেশ কয়েক বছর আগে এই সেতুর রেলিং ভেঙে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একটি বাস নদীতে পড়ে ভেঙে পড়ে ১৭ জনের সলিল সমাধি হয়েছিল। কোচবিহার জেলায় বহু কাঠের সেতু আছে। এই সেতু রক্ষণাবেক্ষণ করতে প্রতি বছর সরকারের বহু টাকা ব্যয় হয়। তাই যদি সব সেতুগুলি পাকা করা যায় তবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় অনেক কমে যাবে। মানুষের স্বার্থে যদি ভাল কাজ করা যায় তবে মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, সবার মনে তৃপ্তি আসে। তিনি আমাবাড়িঘাটের সেতুর দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন যে, এই সেতু তৈরির ফলে সিংগাই ও শীতলকুটির সঙ্গে এমন বি. বামোবেশের সঙ্গেও যাবদা-বাগিছার সুবিধা হবে।

বামোবেশের বন্দরগুলি ব্যবহার করলে খরচও কম হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, আমাবাড়িঘাটের সেতুর বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া একা রাস্তা সরকারের পক্ষে এই সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়। কারণ, এতে ব্যয় হবে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা।

প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রসার, সম্পদায় কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গীতেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মূল্যবান ভাষণে বলেন, এই সেতু তৈরি হওয়ার ফলে এলাকার মানুষের প্রকৃত উপকার হল। তিনি বলেন, এই অঞ্চলকে লোক তরাই অঞ্চল বলেই জানে। কোচবিহারের রাস্তা দিয়ে সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাড়িত্যো চলাচল করে। কোচবিহারের জোখা নদীর উপর নবনির্মিত সড়ক সেতুর উদ্বোধন করে



উদ্বোধনের পথ হল্লা দেও

বলেন, এই সেতু তৈরির ফলে ওধু কোচবিহারের জনগণই নয়, সমস্ত উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম হল।

এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকাও সন্তুলান হয় না। নাবার্ড (Nabard) থেকে টাকা ধার নিয়ে এই কাজ করতে হয়। আবার সেই ধারের টাকা ব্রাহ্ম সরকারকে ফিরিয়ে পাও করতে দিতে হয়। অ্যাকশন গ্র্যান অনুযায়ী কোচবিহার জেলায় নদীর ভাঙন বন্ধ করতে হলে মোট ৫৮ কোটি টাকা প্রয়োজন। কোচবিহার জেলার মানুষ হলদিখালি খণ্ডারায় রাজ্যের তিনটি ব্রহ্ম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করার দাবি করেছেন। এই সেতু তৈরি হলে হলদিখালির মানুষ খুব কম সময়ে কোচবিহারে যাতায়াত করতে পারবে। মন্ত্রী মন্ত্রণার আরও বলেন যে, উত্তর বাঙ্গালার বড় সংকট হল নদী। জেলায় বিভিন্ন ছোট ছোট কাঠের সেতু তৈরি

করা যাবে। ওধু যাকি থাকবে দুটি বড় নদী। এই নদীগুলিকে পাশলা নদী বলা হয়। তাই এই নদীগুলিকে যথাযথরূপে সংস্কার করতে না পারলে সমস্ত উত্তর বাঙ্গালার মরুভূমি হয়ে যাবে।

তিনি বলেন যে, বিত্তীয় সংকট হল রেললাইন। সিসল লাইন নিয়ে ট্রেন চলাচল করে। ফলে কখন কলকাতা বা কোচবিহারে ট্রেন পৌঁছাবে তার কোনও সময়সীমা নেই। তাই এই লাইনগুলি যাতে ডবল লাইনে পরিণত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্র, রাজ্য এবং জনগণ সবাই মিলে এই ব্যবস্থা করতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযুক্ত তিরুকে এই সেতু তৈরি হওয়ার ফলে এলাকার কৃষকদের সুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের চ্যাম্পালের পথ সুগম হল এবং গরিব

কৃষক কৃষিপণ্য বাছারে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত দামে বিক্রি করতে পারবে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গঠনমূলক কাজের জন্য অর্থ আদায় করার আহ্বান জানান।

সভায় যুগত ভাষণ দেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তবকার অমিত্যভ চ্যাটার্জি। তিনি বলেন যে, গত ১৯৯৮ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল এবং মাত্র দেড় বছরের মধ্যে সকলের সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন হয়ে আজ তার শুভ উদ্বোধন হল। তিনি জানান, এই সেতু তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

পরিশেষে সভার সভাপতি বিহারক জাঃ ফজলে হক সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে, রথবাড়িঘাটের এই সেতু তৈরি হওয়ার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল।

প্রবন্ধক : সত্য লেন ও কবি কর্ণ



আব্দুল কবির জাদু ও মেলোকেয়ার সোসাইটির প্রচলিত বৈঠকে জাফা মিঞা অসহায় সংগঠিত স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যায় : সকে উপস্থিত
গৌরাল সরকার ও অমর বিদ্যায়
ছবি : শ্রীশৈল বিদ্যায়



২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলা চলিত সাহিত্য সংস্থা ১ম বার্ষিক সন্মেলনের উদ্বোধন করেন বর্ষশাল মহোদয়। বাংলা জাফা মেল সঙ্ঘের
সহায়ক সম্পাদক অমর বিদ্যায় এক সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠে বর্ষশাল।

ত্রিপুরার শিবসংগ্রামী ও বিশিষ্ট কবি জাফা সরকার (জাফা সরকার) চলিত সাহিত্য—সাহিত্যের নতুন দিগন্ত' আলোচনার সংগ্রহ করেন।
অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল চলিত কবি সন্মেলন, 'চলিত সাহিত্য জাফারের বিত্তীয় স্বেচ্ছায় সাহিত্যিক' শীর্ষক বিতর্ক এবং 'বঙ্গ : প্রতিবেশ
ও প্রতিকার' বিষয়ক আলোচনা-সম্মেলন। আলোচনায় অমর বিদ্যায় বিশিষ্ট আত্মজীবনী লেখক অমর বিদ্যায়।

সংগঠন পক্ষ থেকে এ বছরের ডা আবেদনকারী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট শিবসংগ্রামী ও প্রাক্তন উপাচার্য ডা সন্তোষকুমার
সরকারকে।
ছবি : শ্রীশৈল বিদ্যায়



বীরসা মুক্তার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসবে
ভাষণ দিচ্ছেন অন্যান্যের সংগঠন বজ্রাণ
বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিসু, মাকে
নেত্রবন্দ (বিভাগীয় চিহ্ন)



সাদু রামাঙ্গিক মুন্স পুরস্কার দিচ্ছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিসু



পুরস্কার দিচ্ছেন (বী নিক থেকে) রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেশ্বর মুন্স, সভাপতি পুলিন বাস্কো এবং সি আর আই-এর উপ-অধিকর্তা ডঃ স্বপন দে
(বিভাগীয় চিহ্ন)



উত্তরণ

সাময়িকী

দ্বিপর্বাণ □ প্রথম বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ কাছান-চৈত্র ১৪০৭ □ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০১



অনুগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



ডঃ সুখবিলাস বর্মা

ডঃ সুখবিলাস বর্মা, আই এ এস সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্গত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব পদে যোগদান করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি পশ্চিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিয়োজিত উত্তরণ সাময়িকী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি পদে কৃত হয়েছেন।

বিলাসর স্তর থেকেই সুখবিলাস বর্মার পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ লক্ষিত হয়। কোচবিহারের কৃষ্ণপুর গ্রামের সঞ্চিত তপস্বী সুখবিলাস কোচবিহারেরই আচার্য ব্রজেননাথ শীল গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কোচবিহার কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তিনি ১৯৬৭ সালে যাবনপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে এম এ পাস করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ভারত অর্থনৈতিক কৃত্যক (ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভিস)-এ যোগদান করেন। সে কাজে বেড়ে বছর নিযুক্ত থাকার পর ১৯৭৩ সালে তিনি ভারত প্রশাসন সার্ভিস-এ (ইন্ডিয়ান অ্যাজমিনিষ্ট্রেশন সার্ভিস-আই এ এস) নিযুক্ত হন। আই এ এস হিসেবে তিনি পশ্চিম মিনাকপুরের জেলাশাসকর পদ (১৯৮০-৮১) থেকে রাজ্য রাজধানীর

সচিবালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে, বিশেষ করে অর্থ বিষয়ক কাজের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি অন্তর্গত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব পদে অধিষ্ঠিত।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পাশাপাশি ডঃ সুখবিলাস বর্মা শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাওরাইয়া চর্চা তাঁর এই শৈল্পিক জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের এই লোকগীতি ও লোকসংস্কৃতির পরিধি ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে উভয় বাংলায় জনমানসভূমিতে বিদ্যুতি লাভ



১. ভাওরাইয়া পটভূমিতে ডঃ বর্মা

করেছে। লোকসংস্কৃতি ও লোকগীতিমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর গবেষণা-সম্পর্কিত 'ভাওরাইয়া চর্চা ভাষাতাত্ত্বিক এবং নৃ-সঙ্গীতাত্ত্বিক অধ্যয়ন' (লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড এথনোমিউজিকলজিক্যাল স্টাডিজ) রবীন্দ্রভারতী থেকে পি এইচ ডি লাভ করেছে।

ভাওরাইয়া চর্চা ও লোকসংস্কৃতি সাধনার সূত্রে ডঃ সুখবিলাস বর্মা আব্বাসউদ্দিন শরণ সমিতি গঠন করেন এবং ১৯৯০ সাল থেকেই তিনি এই সমিতির সম্পাদক পদে কৃত হয়েছেন। ভাওরাইয়া-সহ বিভিন্ন লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের কাজে প্রতী রয়েছে এই সমিতি। ডঃ বর্মার উদ্যোগে এই সমিতি বাংলার বিভিন্ন লোকসংগীতের প্রামাণ্য দলিল তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাংলার লোকসংগীতের নানা ধারাকে একসূত্রে বেঁধে রাখার প্রয়াসে ডঃ বর্মা নজরুল ও আব্বাসউদ্দিনের প্রামাণ্য গীতিমালায় ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা জনচিত্রে আণিয়ে তুলেছেন।

ডঃ সুখবিলাস বর্মার রাজবংশী কবিত্ব সমাজের সবচেয়ে বড় সামাজিক সংস্থা কবিত্ব সমিতির সঙ্গে ছাড়াবস্থা থেকেই গড়িত হয়েছেন। কোচবিহারের তফসিলি জাতি ফেডারেশনের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।

ডঃ সুখবিলাস বর্মার প্রধান অভিযান (গানন) ভাওরাইয়া। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রকল্পের তাঁর নিবন্ধগুলি সুবিষয়ভাষ্যের সহশব্দে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এগুলি ছাড়া তাঁর দু'খনি গ্রন্থ (১) জ্ঞান গান এবং (২) ভাওরাইয়া বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর গবেষণা নিবন্ধটি অচিরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

सांख्यिकी

ବିଦ୍ୟାବାରୀ ☐ ଶ୍ରୀମତୀ ସର୍ବଜିତା ☐ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହାବଳୀ ☐ ଆଶୁ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୧୪୦୭ ☐ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-ସାହିତ୍ୟ ୨୦୦୮ ◆ ନାମ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনঙ্গর সম্ভাব্য কল্যাণ বিভাগ থেকে ডা. মানসকমল গৌহাী কর্তৃক প্রকাশিত এক
বস্তুসী স্মরণোত্তর নিম্নোক্ত, ১৬৬, বিপিবিন্দ্যী গান্ধী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত
কার্যালয় : সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা, পি ১/৪, সি আই টি ভিভা, ৭এম, ডি আই সি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৪

দ্বাদশ রাজ্যস্তর ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও গাজিলিং জেলার সমস্ত অঞ্চলের কিছু অংশের আপামর জনসাধারণের সংস্কৃতির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ভাওয়াইয়া লোকগীতি। এই লোকগীতির বিকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুপ্রসার সাক্ষরতা কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রায় এক শৃণু ধরে রাজ্যস্তর ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দ্বাদশ রাজ্যস্তর এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর—এই ১২টি জেলা থেকে প্রতিযোগীরা কলকাতার কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে গত ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডঃ মানসকমল চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

প্রতিযোগীরা ভাওয়াইয়া (চটকা ও দরিদ্রা বিভাগে) সংগীত পরিবেশন করেন। মঙ্গত করেন সুবীর বিশ্বাস ও গৌতম দে। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন রঞ্জিত অধিকারী, রবিশঙ্কর মিশ্র ও শিবব্রত কর্মকার।

চটকা ও দরিদ্রা বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ৪০০, ৩০০ এবং ২০০ টাকা প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেন অনুপ্রসার সাক্ষরতা কল্যাণ বিভাগের বিশেষ সচিব ডি সি সরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানধিকারীরা জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর রাজ্যস্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জোগ্যতা অর্জন করলেন।

অনুপ্রসার সাক্ষরতা কল্যাণ বিভাগের উপসচিব সুকুমার দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার কলাকল নিচে দেওয়া হল :

প্রতিযোগীর নাম ও ঠিকানা	স্থান	প্রতিযোগীর নাম ও ঠিকানা	স্থান
দরিদ্রা		চটকা	
১। প্রথমিতা-পাল এশিয়াটিক গ্রাস প্রোডাক্ট ৩০ বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০০৬	প্রথম	১। সুজত বৈদ্য পারীজপ, ২৯৩ সূর্য্য মঠ, দক্ষিণ বহরমপুর মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১	প্রথম
২। মাধবী ডাকুরা পুলিস আবাসন উপেটোডাঙ্গা, ব্লক ডি/২ কলকাতা-৭০০ ০৫৪	দ্বিতীয়	২। মাধবী ডাকুরা পুলিস আবাসন উপেটোডাঙ্গা, ব্লক ডি/২ কলকাতা-৭০০ ০৫৪	দ্বিতীয়
৩। সুজত বৈদ্য পারীজপ, ২৯৩ সূর্য্য মঠ, দক্ষিণ বহরমপুর মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১	তৃতীয়	৩। রত্না ব্যানার্জি ৭এ নিমাই বোস লেন কলকাতা-৭০০ ০০৬	তৃতীয়

প্রতিবেদক : রত্না ওষ

লোকসংগীতের আনন্দরূপ ভাষ্যমাইয়া

ভাষ্যভারতবর্ষে বেঙ্গের যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগের বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম যুগ যে সংগীত চর্চা, তার সবই ছিল সীমিত সমাজের মনোরঞ্জনই বাড়ে। খবির ভূপোবনে, ভিক্রম মঠে, মন্ত্রভট্টের জগদবজ্রে, রাজার বদ্রসভায় ও বাম্ভাঙ্গের দরবারে সেন-সব সংগীত ছিল উচ্চবর্ণের সাধনার ফল। সে সুরের তর্নধারার অবগাহনের অধিকার ছিল না জনগণের। জনমনে সেন-সব রাগ-রাগিণী অনুগ্রহের চাহিদাও ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আদি মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ যে নথ প্রকাশ করত, তার খরগ্রামের ওঠানামা ছিল তার চাহিদা মেটাতে, উচ্চভ্রমে পৌছতে তার কবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করতো। সেই সুরেলা কথাই পরবর্তীকালে সংগীতের রাগ লাভ করে। মানুষ পরিবেশ-প্রকৃতির নানা শব্দ অনুকরণ করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সুরে বেঁধে ফেলে। সে যুগে কোনমিনিই, সম্ভবত, ভাষা সুবহীন আমেজো লাগিত হয়নি। মানুষ তার ভাকাকে সুরের বাহন করে সৈমশিন প্রয়োজনে সংগীতলাহরি রচনা করেছে। সে লাহরি হলকর্মে যেমন খেতকে করেছে স্পন্দিত, তেমনিই তার সমাজজীবনকে করেছে নন্দিত। সংগীত তাই জীবনচাপনের উপদান সাগ্রহে জনের হ্রাদি উপশমের এবং ঘাটের মানুষের, গ্রামের কারিগরের, পালকিযাত্রকের, ছাদ পেটানোর প্রমিকের একঘেরেই কটানোর রহস্যগীতি — লোকসংগীত। পটীর কর্মরত জীবনের বাহ্যবিবরণী।

সে বাহ্যবিবরণী বালোর ঘাটের গছ, স্রোতযতীর কন্ডোলে, ছায়ানিবিড় অরণ্যশ্রীর নানা জনির সমৃদ্ধ সুরে বালোর গ্রামজীবনের অদুল্য সম্পদ সরবরাহ করে চলেছে। কীর্তন, মৃদুর, ভাটিরাগি, বাউলের লোকসংগীত সম্প্রদেয় স্বাভাবিক সংযোজন ভাটরাগি। পরিবেশ-প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের ভাটরাগি পূর্বের অসাম থেকে পশ্চিমের গুজরাট পর্যন্ত তার সুর বিস্তার করেছে। ত্রিপুরার শতীন মেঘবর্ণ, আসামের ভূপেন হাজারিকা, বালোর নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দিনের কথা ও সুর বঙ্গজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে আব্বাসউদ্দিনের গানে, স্বভাবতই, গ্রামজীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর প্রতিফলিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা উৎসাহ ও নিশীড়নের কথা ও কহিনী তার ভাটরাগিয়ার সুরে ধরা পড়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নিশীড়ন, সেই নারীর নিশীড়নের নিগড় ভেঙ্গে মুক্তিলাভের প্রয়াসের কহিনী আব্বাসউদ্দিনের ভাটরাগিয়ার ফুটে উঠেছে। লোকসংগীতের এ ধারার গান সমাজের সুবিধাভোগী জোতদার-মহাজননের স্রেণীস্বার্থের দাপটে পলিত হুছিল। কবী নজরুল ইসলামের সমগ্রতার আব্বাসউদ্দিনের সংগীত সঙ্গীত হয়ে উঠল। আব্বাসের ভাটরাগিয়ার সুরে নজরুল এক নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করলেন। নজরুল ইসলাম তার স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে, আব্বাসউদ্দিনের ভাটরাগিয়ারে নবজীবনে উজ্জীত করলেন।

আব্বাসউদ্দিনের সুললিত কণ্ঠে— “নারী নাম কতরা

মাহ মারে মাহুরা

সুই নারী দিখোত ছাক পাড়া।”

তবে কবীসাহেব মুগ্ধ হলেন। তিনি লিখলেন— “নারী নাম সই অল্পনা

নাচে জীরে বন্ধনা

পাখী সে না,

নাচে কলো জাঁবি।”

আব্বাসউদ্দিন গাইলেন নজরুলের সেই সংগীত।

নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দিন দুজনেই ইসলাম বর্ষাবলদী হলো বর্ষানিশ্চয়তার আলোকে উদ্ভাসিত তাঁদের সৃষ্টি। নজরুলের পটীগীতি এবং আব্বাসের ভাটরাগি হিন্দু-মুসলমানের একসুরে গীতা। তাঁদের যুগ প্রতিভা যৌলবাণের নিগড় থেকে হিন্দু-মুসলমান কৃষকমহাজকে নতুন দৃষ্টিতে জাগিয়ে তুলেছে। সে দৃষ্টি জোতদার-মহাজনের আকম্পের বিরুদ্ধে তেজাগ/আখিয়ার লড়াইয়ের মহানে সবেবদ্ধ লড়াই সংগঠিত করেছিল। সে-লড়াইয়ে ১৯৪৬ সালে জোতদারের ঠান্ডাড়ে বাহিনী এবং ব্রিটিশ পুলিশের তরীতে প্রথম যুগ শহিদ বরণ করেছিলেন শিবরাম হারি ও শেষ সমিরউদ্দিন।

মাটির কল্যাণি মানুষের জীবনজয়ের সুর স্বকৃৎ ছিল আব্বাসউদ্দিনের ভাটরাগি সংগীতে; জীবনের সর্বকালীন ও সার্বিক আনন্দরূপ ফুটে উঠেছিল তার সুরে। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সেই আনন্দরূপকে আশ্রয় নিলেন ‘চিত্রকন সত্য’ : “সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ—সে মানবের নিজের অস্তিত্ব মোচনের অতীত বলেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের; — রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বলে হয়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরকাল।”

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সমাজে শিক্ষা বিস্তারে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের তীক্ষ্ণরসী ন্যায়িক আবেগবাহুর প্রথম রাষ্ট্রী ছিল 'শিক্ষা সাও'। তাঁর সেই রাষ্ট্রী মূর্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই সমাজে সর্বাঙ্গিক নিশীড়িত মলিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। অন্যায়ের সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের বক্যমান প্রতিবেদনে সেই সব কর্মসূচি রূপায়নের বিবরণ দেওয়া হল :

১। বিনামূল্যে পুস্তক ও পরীক্ষার ফি বিতরণ

এই প্রকল্পে সমস্ত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীতে পঞ্চম শ্রেণীতে ২০ টাকা, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৫০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ১৫০ টাকা, নবম শ্রেণীতে ২০০ টাকা ও দশম শ্রেণীতে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এ প্রকল্পে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ তফসিলি ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রায় ২ লক্ষ আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়।

তফসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়

১৯৭৭-৭৮ সনে মোট ৪৬.৮৮৪ জনকে ২০.৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২-২০০০ সনে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ ২৮০০ % সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয়

১৯৭৭-৭৮ সনে ১০,০৫২ জনকে ৬.৯৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২-২০০০ সনে প্রায় ২ লক্ষ জনকে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০০০ %।

সপ্তম তফসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৯ গুণ আর আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ।

২। মাধ্যমিক স্তরে উন্নয়ন-পোষণ ভাতা

ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা বার্ষিক আয় ১৮,০০০ (আঠার হাজার) টাকার অধিক নহে। তফসিলি জাতির ক্ষেত্রে ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা এক লক্ষ ৭৯ হাজারে বেঁচে দেওয়া হয়। কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন সকলশই এ ভাতা পাবে, কোনও উর্ধ্ব সংখ্যা নেই। পূর্বে এ ভাতা ছিল না। জনপ্রিয় প্রকল্পটি ১৯৭৮-৮০ সনে বামফ্রন্ট সরকার চালু করে। বর্তমানে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ৩৬০ টাকা করে দেওয়া হয়।

তফসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

১৯৭৮-৮০ সনে ২০,০০০ জনকে ৪৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২-২০০০ সনে ১ লক্ষ ১০ হাজার জনকে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫৫০ % অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ, এ ছাড়া ১৯৯২-২০০০ সনে ৮৮.০৬২ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

৩। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রাবাস বৃদ্ধি

সারা রাতে অনূর্ধ্ব ৩২ হাজার তফসিলি জাতি ও ২৮ হাজার আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভাতার হার বার্ষিক ৬,০০০ টাকা।

তফসিলি জাতির জন্য

১৯৭৭-৭৮ সনে ৭,৪১৭ জনকে প্রায় ২৮.৫৪ লক্ষ টাকা, ১৯৯২-২০০০ সনে ৩২ হাজার জনকে প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০০ % বা প্রায় সাড়ে চার গুণ।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

১৯৭৭-৭৮ সনে ৪,১৮০ জনকে ১৬.২০ লক্ষ টাকা, ১৯৯২-২০০০ সনে ২৮,০০০ জনকে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৭০০ % বা প্রায় ৭ গুণ।

৪। আশ্রম ছাত্রাবাস

২০ অথবা ৩০ জন আবাসিকের জন্য প্রাথমিক ও জুনিয়র হাই স্কলের মোট ২৪২টি আশ্রম ছাত্রাবাস সারা রাতে চালু আছে। এ ছাড়া শিক্ষা বিভাগ থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র সমেত ২৪টি আশ্রম বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস অনুপ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ গ্রহণ করেছে। ফলে এখন মোট আশ্রম ছাত্রাবাসের সংখ্যা ২৬৬। আশ্রমবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা

মোট ৭,২০০। ১৯৯৯-২০০০ সনে এই প্রকল্পে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়।

এতদিন পর্যন্ত খাওয়া খরচ বাবদ যে টাকা জেওয়া হয়েছে তা ছিল অপ্রকৃত। অতি সম্প্রতি খাওয়া খরচ মাসিক ৩০০ টাকা করা হয়েছে। অন্যান্য খরচ বাবদ টাকাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভেঙ্গ, সাবান, কেডারসিন, পোশাক, বিদ্যমান, ওষুধ, ফেলাবুলা বাবদও টাকা দেওয়া হয়।

অপরিসর পোষ্য বিবৃতি তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অনেক সময় নিম্ন নিম্ন বাড়িতে, পড়াশোনার পরিবেশ, থাকে না। সেজন্য এই বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্রম ছাত্রাবাসেই রাখার চেষ্টা হচ্ছে। আশ্রম ছাত্রাবাস ও আশ্রমিকের সংখ্যা ক্রম বাড়বে বলে আশা করা যায়।

৫। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে ছাত্রবৃত্তি

মাধ্যমিকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়। বার্ষিক ৫০,৯২০ টাকা পর্যন্ত আয়ের পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বৃত্তি পেতে পারে। প্রাপকের সর্বোচ্চ কোনও সংখ্যা বাধা নেই। যোগ্যতাসম্পন্ন সকলেই এই বৃত্তি পেতে পারে।

তফসিলি জাতির জন্য ১৯৭৬-৭৭ সনে ২৫,১৪০ জনকে ২২৫.০০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৯-২০০০ সনে ১ লক্ষ ২৪ হাজার জনকে ২১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫০০ % বা প্রায় ৫ গুণ।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

১৯৭৬-৭৭ সনে ১,৮৪০ জনের জন্য ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ১৯৯৯-২০০০ সনে ১২,০০০ জনের জন্য ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬৫০ % বা সাড়ে ছয় গুণ।

৬। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিশেষ মেধা বৃত্তি

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ভাল ফল করে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মেটিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার ভর্তির সুযোগ পায় সে উদ্দেশ্যে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে হস্টেল চার্জ ও প্রাইভেট কেটিং-এর ব্যয় চালাবার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে মাসিক ৪০০ (চার শত) টাকা করে এই বিশেষ মেধা বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রত্যেক জেলায় কোটা ভাগ করে দেওয়া হয়। এ বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বায়বীয় সরকার ১৯৮৮ সন থেকে চালু করেছে। বিগত বছর পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে সারা রাজ্যে ১০০ জন তফসিলি জাতির ও ৫০ জন করে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়া হত। ১৯৯৯-২০০০ সনে এই বিশেষ মেধা বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ১,২০০। এই প্রকল্পে বর্তমানে মোট বার্ষিক ব্যয় হবে সাতায় লক্ষ হাট হাজার টাকা।

৭। মাধ্যমিক স্তরে বালিকাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি

মাধ্যমিক স্তরে পাঠরতা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্রীরা প্রত্যেক মাসে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা বিশেষ বৃত্তি পায়। প্রাপকের সংখ্যা বছরে ২,৪০০। ১৯৯৯-২০০০ সনে এ বাবদ ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

৮। কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস

উচ্চ শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার সুবিচারে সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এ যাবৎ ৪৪টি ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস পরিচালনা করছে। সবগুলিতে বর্তমানে ২,৯০০ জন ছাত্র ও ছাত্রীরা সিট আছে। আরও ৪০টি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস মঞ্জুর হয়েছে। সেগুলি নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। শিকানুরাশী ব্যক্তিরের সাহায্যে স্থানীয় প্রশাসন এই কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসগুলি পরিচালনা করে। সিট থাকলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের এগুলিতে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সব ছাত্রাবাসের মধ্যে তফসিলি/আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিকোত্তর ছাত্রবৃত্তি পেয়ে থাকেন।

৯। আবশ্যিক অন্যান্য ফি

বিদ্যালয় উন্নয়ন, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিদ্যালয় থেকে আবশ্যিকভাবে ধার্য এ সমস্ত ফি বাবদে শুধুমাত্র আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বার্ষিক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৯৯৯-২০০০ সনে ১ লক্ষ ১০ হাজার জন ৩৮ লক্ষ টাকা পায়।

১০। বুক ব্যাংক প্রকল্প

জাকারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিজ্ঞান, পত্রিকাবিদ্যা প্রকৃতি পেশাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের দ্রাভক ও ডিসেমো স্তরে প্রতি দুজন তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এক সেট করে সর্বোচ্চ ৭,৫০০ (সাতো সাত হাজার) টাকা মূল্যের বই কিনে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই বই শিক্ষার্থে স্নেহিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্র গিতে হবে।

১১। ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মেধা বৃত্তি

তফসিলি ও আদিবাসী ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য ও তাদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৯৯৫-৯৬ থেকে বিশেষ মেধা বৃত্তি প্রকল্প চালু হয়েছে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ২,৪০০ ছাত্র বর্তমান আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে উপকৃত হবে। বৃত্তির পরিমাণ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য মাসিক ১০০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য মাসিক ১২৫ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য মাসিক ১৫০ টাকা। এই প্রকল্পে বর্তমান আর্থিক বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

১২। অপরিচ্ছন্ন পেশায় নিযুক্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি

মলমূত্র পরিষ্কার করা ও জীবজন্তুকে সরিয়ে লোকলগ্নকে বাসযোগ্য রাখার পেশাকে সর্বভারতীয়ভাবে অপরিচ্ছন্ন পেশা করা হয়ে থাকে। এ পেশায় নিযুক্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যে স্কেন ও হস্টলে থেকে পড়াশুনা করলে মাসিক ২০০-২৪০ টাকা ও অনাবাসিকরা ক্রেশীভেসে ২৫-৩০ টাকা, তা ছাড়াও প্রত্যেকে এককালীন বাৎসরিক ৫০০ টাকা পাবে। সমাজের দুর্বলতম অংশের স্বার্থে এ প্রকল্পটির ব্যাপক প্রচার আবশ্যিক। ১৯৯৯-২০০০ সনে ২১৫ জনকে ২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

১৩। আবাসিক বিদ্যালয় প্রকল্প

আদিবাসী ও তফসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনঙ্গর সম্মুখীন কল্যাণ বিভাগের আছে। সেখানে অল্প কিছু অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের থাক ও পড়ার ব্যবস্থাও আছে। তবে সেখানকার তফসিলি ছাত্র-ছাত্রীরা মাসিক ৩০০ টাকা হার্টেল চার্জ হিসাবে পায়।

ভাড়াগ্রহণের বৈশিষ্ট্যবাহিত্যে একমাত্র এলাপ একটি আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

১৪। আবাসিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়

রাজ্যে পাঁচটি জেলার জলপাইগুড়ি, বাকুড়া, মেদিনীপুর, পুর্নুলিয়া ও মালদহে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (এম ক্রেশী থেকে ১০ম ক্রেশী) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় চারশত বৃত্তিজন করে ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পাবে।

১৫। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী দুর্বল-দুর্বলীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর জন্য বাকুড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও জলপাইগুড়িতে তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র

স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ৫০ জন করে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

১৬। প্রশিক্ষণ তথ্যা উৎপাদন কেন্দ্র

বিভিন্ন জেলায় তফসিলি জাতি ও আদিবাসী দুর্বল-দুর্বলীদের চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, সীবনকারশিল্প, কাঠের কাজ ইত্যাদি পেশাবার জন্য প্রশিক্ষণ তথ্যা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এখানে তারা প্রশিক্ষণ নেয় তাদের মাসিক ১২০ টাকা করে ভাতা ও কাজ শেখার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়।

১৭। প্রাক-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য জলপাইগুড়ি ও কলকাতার স্টপ লেকে প্রাক-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অনুশূল আর একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমান জেলায় দুর্গাপুরে তৈরি হচ্ছে।

১৮। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মাধ্যম ও পেশাগত সমস্ত সরকারি/সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট আসনের ২২% তফসিলি জাতি ও ৬% আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য নিশ্চিত সরকারি আসনে দেওয়া আছে। স্নাতক পাঠক্রমে ভর্তির জন্য আগে ১০% 'এলিজিবিলিটি ব্যাড'-এর যে বাধা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক স্নাতক পাঠক্রম ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ক্ষেত্রে 'এলিজিবিলিটি'-এর বাধা ১০% থেকে শিথিল করে ২৫% করা হয়েছে। তার নিচে নম্বর থাকলে আর ভর্তি করা হবে না।

মোটের উপর সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলোতে আনা ও তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করার যথা দিয়ে এই সমস্ত মানুষের সমাজের মূল স্রোতে আনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সে জন্য সরকারি বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও তাদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ সরকার ও সমাজের গৃহীত নীতি। সরকার ও সমাজ সকলেই এ নীতি প্রয়োগে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ তত্ত্ব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ ব্রাহ্ম সঙ্কৃতি ক্ষেত্রে ঐকতান গবেষণা সমসদের উদ্যোগ

গ্রামীণ জনমানস, বিশেষ করে গৌরমোহন নটীমোহন মহাবিদ্যালয়ের নিখিড়ে রাখা দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সঙ্কৃতি ও সাহিত্য গবেষণার ডেডা সরকারের উদ্দেশ্যে ঐকতান গবেষণা সমসদ গঠ ১৬ জুলাই দলিল বারানসিতে পাঁচঘড়া গ্রামে অভিনয় পরিচরিত পুষ্টিগ্রামে এক আলোচনা সভায় আয়োজন করে।

গৌরমোহন নটীমোহন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও গ্রামীণ সঙ্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্কর সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুখীয়া মুখা। প্রধান কভা ঐকতান গবেষণা পরিষদের সম্পাদক ও কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-নিবন্ধক নীতীন বিশ্বাস গ্রামীণ সাংস্কৃতিক গবেষণার

কাছে দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডেডনকে বাগত জানিয়ে বলেন যে, গ্রাটীন ভারতে বিশেষত বৈদিক এবং মহাকাব্যের দুগে ভারতীয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষণ ও সাহিত্য-গর্নে ব্রাত্য সমাজের যেসব অবদান উচ্চশ্রেণীর ঈর্ষার বিবর ছিল, সার্বিক চর্চায় তার পুনরুদ্ধার ঘটবে।

মনীষী পঞ্চানন বর্মা জাতীয় স্তরে আশ্বেদকরের মতোই উত্তরবঙ্গে চেতনা-সঞ্চারের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্বোধনী ভাষণে
মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুমার মন্তব্য

মনীষী পঞ্চানন বর্মা সামাজিক চেতনা-সঞ্চারের মাধ্যমে পিছিয়েপড়া মানুষদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দূর করার যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি সে আন্দোলনকে অর্থনৈতিক আন্দোলনের রূপদান করেন। তাঁরই আন্দোলনের ফলে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী তমসিলভূমির সুযোগ লাভের পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ডঃ বি আর আশ্বেদকর যেমন জাতীয় স্তরে এক আর্থ-সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাও তেমনই উত্তরবঙ্গের জনসমাজের চেতনা-সঞ্চারের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী উৎসব এবং দ্বাদশ রাক্ষা ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে অনুপ্রসার সম্মদার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুমার উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

ওইদিন এক বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠান-মণ্ডপে এসে পৌছবার পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর উত্তরবঙ্গের নৃত্যের মধ্য দিয়ে অতিথি বরণ করা হয়।

মহিমহোদয়ের প্রদীপ জ্বলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতিত্ব দীপ্তি দণ্ড উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ, বিশেষ অতিথি ছিলেন অনুপ্রসার সম্মদার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন্দ্র কিশু এবং পূর্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহর ভিরাণ্ডে। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জোয়াকিম বাকলা, বিধায়ক নির্মল দাস, বিধায়ক সুশীল কুমার, বিধায়ক সালিম টমো, আলিপুরদুয়ারের পৌর পিতা অরুণকুমার ভৌমিক, অনুপ্রসার সম্মদার কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব ডঃ সুখবীলাস বর্মা এবং বালোসমেশের বিশিষ্ট শিল্পী

রবীন রায়। অন্যান্য বিশিষ্ট গায়কদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিবিস্তৃত জেলাসভ্য শ্রীকুমার মণ্ডল, মহকুমা শাসক নীলম হীনা রায়, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডঃ মানসকমল চৌধুরী ও উৎসব কমিটির মুখ্য সম্পাদক সুশীল রায় প্রমুখ।

মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও আকাসউদ্দিনের প্রতিভূতিতে অতিথিদের পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুমার আরও বলেন যে, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উচ্চারণ প্রচলিত, একই মূল ভাবের উৎসব উজারগকে কথ্যভাষা বলা হয়। কিন্তু লেখাপড়া বা সরকারি ভাষা হিসেবে যে বাংলাভাষা গণ্য হয় তার সঙ্গে ওই সব আঞ্চলিক উচ্চারণের তফাত থাকতেই পারে। সেই তফাৎের জন্য কথ্যভাষাকে পৃথক ভাষা বলা চলে না। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সেহেতু লেখাপড়া, সরকারি কার্যকর্ম প্রভৃতিতে বাংলাভাষার একাধি রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভাওয়াইয়া সংগীতে ব্যালোর মাটি ও জলের রূপরবণের ছাপের কথা উল্লেখ

করে মহিমহোদয় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক গানের সত্তার এখনও ব্যক্তিগত চেনাশ্রীবারে পুরোপুরি পৌছয়নি। ভাওয়াইয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত এমনই এক সংগীত। এ গান উত্তরবঙ্গের মানুষের নিঃস্বপ্ন। এ গান হারিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সে আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে গত ১২ বছর ব্যবং ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংগীতের জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, সার্থক শিল্পীদের পুরস্কৃত করে ভাওয়াইয়ার প্রতি শ্রমিদমাজের আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সংগীত জগতে ভাওয়াইয়া এখন এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারি। ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্পী তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

রাজ্যের বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মণ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী এবং ভাওয়াইয়া সংগীতের মাধ্যমে এক মহামিলনের ব্যবস্থা করেছে। তিনি ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সামাজিক আন্দোলনের কথা স্মরণ করেন এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভাওয়াইয়া গানের চর্চা যে

আজকের দিনে কতটা প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা করেন।

অন্যদের সম্ভার কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিছু ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সমাজ-সংস্কেতবৃত্তার আন্দোলনে জনসমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দ্বারা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভাওরাইয়া সংগীত উত্তরবঙ্গের জনগণের মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে তৈরি করে অশাস্ত্রবৃত্তি রোমের বাতাবরণ রচনা করেছে। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সভাপতিত্বের কেন্দ্রের কাজের বিবরণ দিয়ে উপেন কিছু বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও নানা সমাজের বেসব নাচ-গান ও গ্রামীণ সাংস্কৃতিক দ্বারা এককাল অবজ্ঞাত ছিল সেসব ঐতিহ্যমণ্ডিত গা-সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে, নিয়ত চর্চার মাধ্যমে মূল সংস্কৃতির পানপ্রণীশে আনার চেষ্টা করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এসব কাজে জনসমাজের মধ্যে উৎসাহ ও লোক-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যদের সম্ভার কল্যাণ বিভাগ সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কর্মশালা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে।

পূর্ত বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোহর তিরুকে তাঁর ভাষণে জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসারের এরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিশেষ সংস্কৃতির আয়োজন এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিহত করার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে জোরদার করার পক্ষে ভাওরাইয়া সংগীত এক প্রবল হাতিয়ার। তিনি দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করার আবেদন জানান।

অন্যদের সম্ভার কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব এবং ভাওরাইয়া বিশেষজ্ঞ

সংগীতশিল্পী ডঃ সুবিনালাস বর্মী ভাওরাইয়া গানের জনক প্রয়াত আব্বাসউদ্দিনের শতবর্ষের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর শতবর্ষ উপলক্ষে এ বছরের মঞ্চের নাম আব্বাসউদ্দিনের নামে করা হয়েছে। তিনি তাঁর ভাষণে ভাওরাইয়া গানের বিভিন্ন সুর ও কথাও মধ্যে পরীক্ষাধারের সুর ও ছন্দের রূপ কণ্ঠন করেন। মন্ত্রী পঞ্চানন বর্মার জনশ্রুতনা সকারের জীবন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতির উল্লেখে তিনি শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে সভাপতিশ্রী শ্রীশ্রী নন্দু এই অনুষ্ঠানকে উত্তরবঙ্গের এক মহামিলনের আখ্যা দেন। তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রী পঞ্চানন বর্মার ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী ও দ্বাদশ ভাওরাইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং বইমেলায় আয়োজন উত্তরবঙ্গের জনজীবনে এক মন্থন উজ্জীবনের সৃষ্টি করেছে। এই সব আয়োজনের পানপানী পূর্ণ ও সবজি প্রশমী এবং প্রতিযোগিতা উত্তরবঙ্গের গ্রাম-শহরের অধিবাসীদের এক মিলনমেলায় টেনে এনেছে, তাঁদের মধ্যে যে অভিনব উৎসবের সুর বেজে উঠেছে বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তা এক প্রচণ্ড আঘাত হানবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি মন্ত্রী পঞ্চানন বর্মী জীবন ও কীর্তি আশোচনা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এর পর সন্ধিগণ গভ বছরের রাজ্য ভাওরাইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারীদের হাতে পুরস্কার ফুঁল দেন।

মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী মীনেশচন্দ্র ডাকুরা বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগ জেলা, বইমেলায় উদ্বোধন করেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে গভ বছরের বিজয়ী শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। উত্তম দাস ও তাঁর সম্ভার জাগীদান পরিবেশন করেন। বালাহেশ্বরের প্রসিদ্ধ শিল্পী রবীন্দ্র রায়-সহ বং আমন্ত্রিত শিল্পী তাঁদের গানে হাজার হাজার মানুষের মন নিক্ষেপ করেছিলেন যাটির গন্ধে, আর্দ্রত করেছিলেন তাঁদের সুরের কর্ণধারায়।

১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন বেলা আড়াইটায় গভ হত ভাওরাইয়া সংগীতের প্রতিযোগিতা। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ১০টি করে প্রাথমিক কেন্দ্রের ৪০ জন প্রতিযোগী এবং শেষ দিন ৮টি কেন্দ্রের ৩২ জন প্রতিযোগী আসে নেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ ও সবজি প্রতিযোগিতার ৪০টি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা, মহুমা শাসক, পূর্ণ ও সবজি প্রতিযোগিতার বিচারকগণ এবং বিভিন্ন উৎসব কমিটির সদস্যগণ।

প্রতিদিন প্রতিযোগিতার পর আমন্ত্রিত বিভিন্ন ভাওরাইয়া শিল্পীরা, বিশেষ করে পদ্মশ্রী প্রতিমা ফকরা ভাওরাইয়ার মূল সুরের বিভিন্ন আঙ্গিকের গান পরিবেশন করে উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার মন জয় করে নেন।

দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিদিনের সংগীত অনুষ্ঠানে ২৫ হাজারেরও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। কেবল জালিপুরদ্বার শহরের জনসমাজই নয়, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এই মহামিলন মেলায় সমবেত হয়েছিলেন। সমাগত জনগণের মধ্যে যেমন ছিল বৈচিত্র্যের সমাহার, তেমনই ছিল জাতি, বর্ণ, বর্ণ, নানা কথ্যভাষাভাষী বিবিধ মানুষের মর্যে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংস্কেতির মহামিলনের এক অপূরণ দৃশ্য।

(জনি জেলা)

বিজয়ী প্রতিবেশন

বর্ণভিত্তিক সমাজে মানুষকে ছোট করে দেখার অবিচারের কষ্টই অদ্বৈতকে তিতাস লিখিয়েছিল

অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কারপ্রাপক অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য

“বর্ণভিত্তিক এই সমাজে মানুষকে ছোট করে দেখা—এই চেয়ে বড় অবিচার আর কিছু হয় না। এ অন্যায় আমাদের বুঝ কষ্ট দেয়। সম্ভবত এই কষ্টই অদ্বৈতকে গিরে লিখিয়ে দিয়েছিল তিতাস একটি নদীর নাম আর রবীন্দ্রনাথকে গিরে চতুর্লিঙ্গ কিংবা রমণের রসি। ধর্মভিত্তিক এই অর্থমাননায় যে ক্ষত, তাতে কেবল ধর্মভিত্তিক ক্ষতি নয়—সর্ব মানবের ক্ষতি।”
গত ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলায় ইউ বি আই অডিটোরিয়ামে অদ্বৈত মল্লবর্মণ শ্রুতি পুরস্কার-২০০১-এর প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণ করে শ্রবণ ভাষণে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন।



অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিতাস একটি নদীর নাম। ওম-এর
ছবি: ত্রিপুরা সরকার

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে আরও বলেন,
‘যারে ভূমি নীচে ফেল
সে তোমারে বধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।’

“এই চানা-পড়নের ছালাতেই আমরা ছলছি, হাজার বছর ধরেই ছলছি, লিখছি এবং বলছি—না লিখে পুরছি না বলে, না বলে পারছি না বলে।”

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক নীতীশ বিশ্বাস উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের পরিচয় প্রদান করলে তাঁদের পুষ্পার্ঘ্যে সর্বের্ষিত করা হয়। এর পর অদ্বৈত মল্লবর্মণ: উৎসব কমিটির সভাপতি তথা ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা জাতি কল্যাণ দপ্তরখয়ের মন্ত্রী কবি অনিল সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সভাসাধন চক্রবর্তী, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, গণশক্তির সম্পাদক ধীপেন ঘোষ, প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক অরুণ বসু এবং সমাগত সুবিমলসীকে ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে

সম্রাট অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে অদ্বৈত মল্লবর্মণ শ্রুতি পুরস্কার প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, “ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামের পাশে তার মনন ও সংস্কৃতি বিকাশের সংগ্রামেও দায়বদ্ধ। এই অসীমতার থেকেই গড়ে উঠেছে একটি ধীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত কৃতিত্বের জন্য ঘোষিত হয়েছে রবীন্দ্র, নজরুল, শচীন দেববর্মণ ও সলিলকৃষ্ণ পুরস্কার। পাশাপাশি হাজার বছরের অবহেলা, নীড়ন ও অনবিচারের দলিত, পচাংগণ ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণিজনদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ঘোষিত হয়েছে ডঃ বি আর আম্বেদকর, বিদ্যাসাগর এবং আবুল কালাম আজাদ পুরস্কার সহ অদ্বৈত মল্লবর্মণ শ্রুতি পুরস্কার।

“তিতাস একটি নদীর নাম এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে কেন, সারা বিশ্বসাহিত্যেই একটি দুলভ নাম। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ডাবী কালের কবিরের কাছে রবীন্দ্রনাথের দাবির

উদ্ধারণ: ‘কৃষকের জীবনের শরিক যে জন/ কর্মে ও কথার সত্য আত্মীয়তা করেছি/ অর্জন/ যে আছে মাটির কাছাকাছি/ সে কবির যাদী লাগি তখন পেতে আছি।’ অথবা ‘সুক যাত্রা সুখে/ সুখে/ নতশির শুদ্ধ যাত্রা বিশ্বের সমুখে/ গুণে তপী/ কাছে থেকে দূরে যাত্রা তাহাদের যাদী যেন ওমি।’ (একতান) অদ্বৈত মল্লবর্মণ রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষিত কবি ও চর্যান্বিত। তিতাস পারের মালাপাড়, গোকর্নঘাটের জেলে বস্তির, সুখা মৃত্যু অনাহার অবজ্ঞা শোষণ নীড়ন ও অসহ্যমানের অঙ্কুর থেকে উঠে এসেছিলেন, ধীর্ঘজীবী হতে পারেন নি অদ্বৈত। দারিদ্র্য অপুষ্টি তাঁকে দিয়েছে কল রোগের ডিল ডিল অপমৃত্যু। কিন্তু অমর হয়ে আছেন মালাপাড়ার



ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী ও বি. জি. সনকর মহোদয় জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে অমৃত ময়ূরবর্ণ পুরস্কার প্রদান করছেন। তাঁর জনস্বিকৃতি বক্তৃতায় বঙ্গভ্রমের পশ্চিমবঙ্গের বিহারের ছাউনী বিদ্যালয় এবং অনুপ্রবেশের সফলতা উল্লেখ করা হয়।

কাহিনীকার অমৃত ময়ূরবর্ণ এবং তিতাস একটি নদীর নাম। সৌখিন বহুব্রুহিবিহীন কর্ম ও কথার, ভাষা, ভ্রম, মননে এমন নিখাদ স্বীকৃতিমূলক উপন্যাস বিশ্বজুড়ে সম্ভবত একক। তাই অমৃত ময়ূরবর্ণ ভারতীয় প্রগতি সাহিত্যের অভিন্ন আত্মা এবং দলিত সাহিত্যের অগ্রদূত পুরুষ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একই বৃষ্টি কুসুমের মতো। ত্রিপুরা সরকার বিশ্বাস করে, অমৃত চর্চা সর্বত্র জ্ঞানী ও বর্ণশীলনে অবনতিত ভারতীয় দলিত শোষিত সর্বদ্বারাণ্যের একটি মহান সাংস্কৃতিক পরিমাণ, অজ্ঞান ও অজ্ঞানপ্রতির সাশ্রমকে উদ্ভীষ্ট ও জাগ্রত করবে। এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও জাগরণের লক্ষ্যেই ত্রিপুরা সরকারের তত্ববিলি জাতি, পশ্চাদ্গমন জ্ঞানী ও সংবাদ্যু কল্যাণ দত্তর কর্তৃক ঘোষিত অমৃত ময়ূরবর্ণ স্মৃতি পুরস্কার নিবেদিত।

প্রতি বছর সামাজিকভাবে নিম্নবর্ণের শোষিত নিপীড়িত মানুষের জন্য জনসেবা, সামাজিক আন্দোলন, গবেষণা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধ ও নিজনদের সবেকনা ও পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত হর অমৃত ময়ূরবর্ণ জ্ঞানোদয়। ইতিমধ্যে এই পুরস্কারে

সম্মানিত হলেন ত্রিপুরার লোককবি একেশ্বর দাস এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাম্যবাদী লেখক, সাংবাদিক ও কথাসিদ্ধী অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। আমরা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করেছি, যেখানেই নিম্নবর্ণের দলিত জ্ঞানী উপর কর্তব্যী আক্রমণ নেমে এসেছে, সেখানেই এই শিখী যোদ্ধা প্রতিবাদী হয়েছেন। আক্রান্ত মানবতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিদ্যাহীন কঠোর জ্ঞানী ও বর্ণের বর্বরতাকে বিচার জানিয়েছেন। এ বছর তাঁর 'মানুষের রঙ' উপন্যাসের জন্য তাঁকে অমৃত ময়ূরবর্ণ স্মৃতি পুরস্কার ২০০১-এ সম্মানিত করে ত্রিপুরা সরকার নিম্নে পৌরবাচিত মনে করছে।

ত্রিপুরা করতালির মধ্যে কবি অনিল সরকার অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য ৭১ হাজার টাকা রুpee এবং মানপত্রসহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান পেন।

জনুয়ারীতে সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের

ভাষণ:

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সভ্যসাধন চক্রবর্তী অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের

পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা একত্রে অধ্যাপক আন্দোলন করেছি, মিছিলে একত্রে যেতেছি; আমি উপন্যাস লিখতে পারিনি কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশ লিখেছেন এবং একই সঙ্গে পণ্ডিতবৃত্তি আন্দোলনে অগ্রদূত হয়েছেন। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজে একত্রে জড়িয়েছেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সমাজে ব্যাঘাত যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত তাদের বেকনা তাঁর কলমে মুক্ত উঠেছে।"

তিনি পুরস্কার প্রদানের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কতি বিদ্যালয় প্রথমেই পুরস্কারপ্রাপক অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ত্রিপুরা সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "১৮ বছর আগে এই বিনে চার্লস ডিকেন্স জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জন্মদায়িত্ব হারিয়েছেন। অমৃত ময়ূরবর্ণ ও অন্যান্য কথ রচনার মধ্যে একখানি উপন্যাস— তিতাস একটি নদীর নাম—লিখে

অগণিত্য হয়েছেন। ডিকেন্সের জন্মদিনে অথৈত মনবর্ষণের নামাঙ্কিত পুরস্কার একজন উপন্যাসিক শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া বখাওই অভিনন্দনযোগ্য।”

তিনি আরও বলেন, “বাঙ্গালোব্যায় আরও বেশি বেশি রচনাধর্মীর প্রয়োজন। কেননা, আজ বাংলাভাষা প্রচণ্ডভাবে অক্ষাণ্ড। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই। তিনি আরও বেশি ও সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করে দেশবাসীকে উপহার দিন।”

ডা অমিলরঞ্জন বিশ্বাস অথৈত মনবর্ষণের নামাঙ্কিত এই পুরস্কারের প্রাপক অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং গত কয়েক বছর ধরে এই পুরস্কার প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অভিনন্দন জানান। অথৈত মনবর্ষণের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িকতার উল্লেখ করে ডা বিশ্বাস বলেন যে, অথৈত সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি গিয়েছিলেন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্তির প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ডা বিশ্বাস বলেন যে, “তিনি হৈত ভাব ত্যাগ করে অথৈত ভাব গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কালের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কবি সবাইকে আদান জানিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বিশ্বাসের সম্পর্কে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণসেবের জন্য একটি পানপোড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।” তিনি তাদের উপর মুটি নর্ভ আরোপ করেছিলেন : ‘এস ব্রাহ্মণ ওচি করি মন/ ধর হাত সবাকার।’ কেননা, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধিকভাবে অত্যাধি; পৈতর মাধ্যমে সে অন্যকে দূষা করে। এই অত্যাধি পরিহার করতে পারলেই ব্রাহ্মণ সবায় হাত ধরার অধিকারি হবে। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় উদারতা দেখিয়েছেন; তাঁর মনুষ্য বা মানবিকতা রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বদানবে; তাই তিনি বিশ্বদানবের পক্ষে অবিসারী। তিনি রত বিচার না

করে সত্যিকার মানুষের ঐক্য—যে জন্য আমরা এত সাধনা করছি সেমিকে এগিয়ে চলেছেন। এই অগ্রগমনের জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

বঙ্গভক্তি সম্পাদক দীপেন ঘোষ— “অথৈত মনবর্ষণ স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপক বহু ও সংগ্রামী সাথী জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে। অথৈত ৩৭ বছরের দক্ষকর্মী জীবনকালের সাহিত্যক্ষেত্রে মানিক, তারাসম্বর, বিতুতিভূষণের ধারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার হৈত অথৈত মনবর্ষণকে আমাদের মধ্যে চিরজাগরক রাখার জন্য প্রতি বছর অথৈত মনবর্ষণ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে।”

প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক অঞ্জন কু অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে এরূপ ব্যতিক্রমী সাহিত্যকে পুঙ্খভূত করার কাজকে একজন সাংবাদিক হিসেবে, একজন বাঙালি হিসেবে তিনি অভিনন্দন জানানছেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলা সাহিত্য থেকে মাটি জল ঘাম, রক্ত, অঙ্গর গন্ধ ছাড়িয়ে গেছে, তার বসলে এসেছে কবি, ঘোঁরা, সুরা ও আভরের গন্ধ। কিন্তু এসব ছাড়াও কিছু ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক আছেন, জ্যোতিপ্রকাশ তাঁদের অন্যতম। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁরই মতো ব্যতিক্রমী সাহিত্যকর্মীরা বাঙালির অস্ত, বাঙালির বেঙ্গনা, মাটির গন্ধকে আগামী দিনে বিকৃত সাহিত্য হিসেবে তুলে ধরবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নতুবা কংক্রিটের ঘর, বৈঠকখানা এবং ল্যাবরেটর মধ্যেই সাহিত্য ছাড়িয়ে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের ভাবধের অবনিষ্টাণ

ত্রিপুরা সরকার বিশেষ করে ত্রিপুরার তফসিলি জাতি ও অন্যান্য পঞ্চাংশ

শ্রেণী কল্যাণ এবং শিক্ষামন্ত্রী কবি অনিল সরকারের প্রতি অথৈত মনবর্ষণ পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য অভিনন্দন জানান করেন। তিনি পড়াশোনার জন্য তাঁর জননীকে উদ্দেশে এবং সাহিত্যচর্চার জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত বছর এই বইমেলাতেই তাঁর মানুষের রক্ত ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক এ বছর পুঙ্খভূত। উপন্যাসটি প্রকাশ করার জন্য কবি অঞ্জন ঘোষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান করে কবিকে সাহিত্য জগতের মহীসহ বলে বর্ণনা করেন।

পুরস্কারের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে প্রয় করে তিনি বলেন, “ডক্টরেডভি পুঙ্খভূত হবনি, পুঙ্খভূত হবনি অথৈতও। মহাকালের নির্মম ছাঁকনি বিচার করবে কে থাকবে, আর কে থাকবে না। অথৈত ১৯৫১ সালে মারা যান আর তাঁর জিভাস একটি নদীর নাম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে—তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর। যে পুরস্কারে ত্রিপুরা সরকার আমাদের ধনা করেছেন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অনন্য নাম—অথৈত; ও শু অনন্য নয়, অমর। এই পুরস্কারের জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারের প্রতি, যাঁরা নির্বচক তাঁদের প্রতি, বিশেষ করে ত্রিপুরার শিক্ষা দপ্তর এবং তফসিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান করছি।

“আমাদের এই সমাজ, এই দেশ সহজে বদলায় না; এক-এক সময় মনে হয়, একটা মহাশয়র ঘটে গেলেও সমাজ যেখানে ছিল, সেখানেই থিরে আসবে। ধনবায়ের ভিত্তিতে শত শত বছর ধরে যে সমাজ চলেছে, সে-সমাজে দলিতরা, শূদ্ররা, সর্বহারারও সর্বহারা। কিছু অর্থনৈতিক ন্যায় হয়তো মানুষ লড়াই করে আবার করে নিয়েছে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে।”

পরিশেষে তিনি বলেন যে, “নির্নীতিভিত্তি ও দলিত যে মানুষ সর্বহারে

পড়াই করে বার সামাজিক ন্যায়ের জন্য, সুস্থির জন্য তার আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য—এই সংগ্রাম তার নিজের সমাজে, বৃহত্তর বিশ্বে এবং তার মধ্যে, তার অন্তরে একই সঙ্গে চলে। তার যন্ত্রণা তার সংগ্রামের কথা, তার হস্তের কথা, আঁখি ডাবি এবং লিখি। এই জনেই হয়তো তাঁরা আমাকে এই পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছেন। এই পুরস্কার আমি কীভাবে গ্রহণ করছি। কিন্তু আমি মনে করি না, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, দলিত মানুষের যে সংগ্রাম ও যন্ত্রণা—যে কথা আমি আমার উপন্যাসে এবং অন্যান্য লেখায় লিখে থাকি—তারই স্বীকৃতিতেই এই পুরস্কার। তবে এই পুরস্কার যদি আমার চেয়ে উচ্চতর সাহিত্যিককে—মাদো বা অন্যান্য কোনও ভাবার সাহিত্যিককে দিয়ে তাঁদের প্রদানিত করে, তাঁরা যদি ভাবেন সেইসব লিহিরেগড়া, অবহেলিত, নির্দোষ দলিত মানুষের কথা এবং তাদের জন্য যদি তাঁরা কলাম করেন, দশজনের মধ্যে একজনের কলামও যদি নড়ে ওঠে তাহলেই আমার এই পুরস্কার পাওয়া সার্থক হবে।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুরস্কারের অর্থমূল্য দশ হাজার টাকা চারটি ভাগে ভাগ করে প্রথম তিনটি ভাগ সমান এক-তৃতীয়াংশ ৩০০১ টাকা হিসেবে বৎসরক্রমে গুজরাটের তুর্মিকশ্ববিধাত্ত মানুষদের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্দদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যমন্ত্রীর দ্রাণ তহবিলে প্রদান করেন। তৃতীয় ভাগ তাঁর ছাত্র-আবেগলনের সহযোগিতা কবি অনিল সরকারকে দলিত মানুষের সুখের কথা যেসব কলাম বলাবে সেসব কলামকে উৎসাহিত করার কাজে ব্যয় করার জন্য প্রদান করেন। অবশিষ্ট ৯৯৭ টাকা তাঁর লেখার প্রেরণাধারী মালবিকা চট্টোপাধ্যায় এবং সুমিতা নাথারের জন্য রেখে দেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : ত্রিপুরা সরকারের মংস্য ও পরিবহনমন্ত্রী সুকুমার বর্মণ তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে সাহিত্যিক, সাহিত্যপ্রেমিক ও গণিজনদের অভিনন্দন জানিয়ে এ বছরের (২০০১) অম্মৈত মন্ত্রবর্ধন পুরস্কার অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে পারায় জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি সমাজিক নীতীশ বিশ্বাস ও তাঁর ঐকতান

গবেষণা পত্রিকার কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের উপসংহারে পর্বাণ্যে সমাজিক নীতীশ বিশ্বাস ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের এই মহৎ প্রয়াসে বৃক্স থাকার জন্য গর্ব প্রকাশ করে বলেন যে, অনুষ্ঠানটিকে সাংস্কায়মিত্ত করার কাজে সহায়তার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতিতে প্রবানত অম্মৈত মন্ত্রবর্ধন এডুকেশন্যাল অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি—যারা এখানে অম্মৈতচর্চাকে দীর্ঘদিন ধরে রেখে তিতাস নদীর বহুতাকে ধরে রেখেছেন। তাঁরা, চতুর্থ পুনীয়া, সূর্য্য এবং ঐকতান গবেষণা পত্রিকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গস্থিত ত্রিপুরা সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার শি কে চাকমা, শিনির দাস প্রমুখ কর্মী উপসমিতির কাজকে সর্বপ্রথমে সতল করে তুলছেন।

মানুষের রক্ত উপন্যাসের প্রকাশন সংস্থা সেখ বৃক্স স্টোরের মালিক সুধাংগ দে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের মানুষের রক্ত উপন্যাস-সহ অন্যান্য গ্রন্থের এক-এক গ্রন্থ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদান করেন।

দলিত ও গরিব শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ

যাঁদবপুর অঞ্চলের দলিত জনগোষ্ঠী, নিম্নলিখিত সমাজ ও সংখ্যালব্ধ পরিবারগুলির ও প্রতিবন্ধী শিশুদের এবং বাটার্স ব্যক্তিদের বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিতরণে ৯০ নং ওয়ার্ড জনস্বাস্থ্য কমিটি এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কমিটির সভাপতি এবং নিত্যযোগ হিসেবজ ডাঃ প্রাশনকর সাহ্যর নেতৃত্বে

একদল চিকিৎসক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শ্রিশ গেল্যাম মহাঙ্গন রোডের ইয়ানুয়েল স্কুলের ১০৫ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। অন্যান্য বেসর চিকিৎসক বোম্বাসেবায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বি বি সোম, দীপকর ভট্টাচার্য, এস সি সেন, কল্যাণ ভৌমিক, স্ট্রেণ্ডত ভট্টাচার্য, গৌতম দাস ও ধীরেন মজুমদার। ২৫ ফেব্রুয়ারিও ডাঃ প্রাশনকর

সাহ্যর নেতৃত্বে চিকিৎসকরা সি আই টি পার্কে অনুগ্রহণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করেন। এখানে ১৫০ জন শিশু এবং কিছু সংখ্যক বাটার্স ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই কমিটির সম্পাদক অঙ্গণ আগরওয়ালার উদ্যোগে কমিটির কর্মীরা বিনামূল্যে ওষুধপত্র প্রদান করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষা সমিতির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষা সমিতির উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভাড়া সভাখারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উপাচার্য অ্যানিস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। রাজা সরকারের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সহ-উপাচার্য (অর্থ) হিরণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালোদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সচিব হোমারেং উদ্দিন আহমদ ও প্রচার সচিব আবদুর মান্নান হালদার এবং মাতৃভাষা সমিতির পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ ও অশোক চৌধুরী। বিশিষ্ট ব্যক্তির শহিদ ফলকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অধ্যাপিকা মণিকৃতলা হালদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সভা এক ঘিনিট নীরবতা পালন করে ভাষা বহির্বিষয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সমিতির সম্পাদক নীলীন্দ্র বিশ্বাস ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষণে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মাতৃভাষা সমিতি গত পাঁচ বছর যাবৎ এই দিনটি পালন করে আসছে। ২০০০ সালে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে ঘোষিত হয়। এ দেশে ১৮টি স্বীকৃত ভাষার অধিকার স্বীকৃত হয়নি বলেই সাংস্কৃতিক ফেলবন্দন হয়নি বলে তিনি অভিযোগ প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই বাঙালিরা বাবহারের সিদ্ধান্ত এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিকে বিশেষ ভাষণে ঘোষণা করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করার দাবি জানিয়ে সুজিত ভট্টাচার্যের প্রস্তাবের সমর্থন করে অধ্যাপক



জনা নরিন : পেরিত পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অ্যানিস বন্দ্যোপাধ্যায়
ওচি : ইন্ডিয়ান বিজনেস

জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালির ভাষা আপোলনে আত্মদানের বহু আগে ১৯৩৯ সালেই আইরিশ মাতৃভাষা আপোলনের সমর্থনে কলাম ধরেছিলেন। বালোভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বালোদেশের নাগেন বিশ্বাসের অবদানের উল্লেখ করে তিনি সেদেশে বালোভাষার উন্নতি সাধনের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অফিসার সমিতির বেসাশি বিশ্বাস, কর্তী সংসদের বপন বসু ও ছাত্র সংসদের পক্ষে শিশির চট্টোপাধ্যায়ও প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারি সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগ না হওয়ার জন্য জড়তা ও আড়ম্বল্যকে দাঙ্গী করেন। তিনি বলেন যে, বালোভাষা ও বাঙ্গালিকে বিভক্ত করার এক দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে; রাজনীতি ভুলে আমাদের

সকলকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সর্বনাশ রুদ্ধত্ব দিতে হবে।

সহ-উপাচার্য (অর্থ) হিরণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ও সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীদের অপেক্ষা ইংরেজির ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদানের সমালোচনা করে বলেন যে চীন ও জাপান মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা নিচ্ছে।

বালোদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের হোমারেং উদ্দিন ২১ ফেব্রুয়ারিকে তাঁদের জীবনের এক বিরাট অধ্যায় বলে বর্ণনা করে বলেন যে, ১৯৫২ সালে যে সশ্রাম শুরু হয়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যে তা পরিণতি লাভ করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাচার্য অ্যানিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মাতৃভাষা আমাদের উত্তর আবেগ দ্বিগুণ ভালবাসা। এর সঙ্গে দেশপ্রেম, মানবের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, (৩৮ পাঠার শ্রেণী)

একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই গরিব মানুষদের কাছে বই পৌঁছে দিয়েছে

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বইমেলায় উপেন কিস্কুর ভাষণ

“সাঁ’র ভারতের মধ্যে একমাত্র সরকারই গরিব মানুষের কাছে বই পৌঁছে দিয়েছে। এদের কনক ও হস্তশিল্পীদের মধ্যে অবিশ্বাস্যই একনিলি ও আশ্বিনী, তারাও আজ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় সাক্ষর হয়ে বইপড়ার সুযোগ লাভ করেছে। পরী অফলেও তাই বইমেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বইকে কেন্দ্র করে উপেক্ষের যে আরোহণ, নবর খেতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে, তা এক সুই চেনানোবোনের পরিচয়।”



বইমেলায় ভাষণ দিচ্ছেন রাজ্যের ক্ষমতাসর সচিবালয় জ্যেষ্ঠ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কুর। মঞ্চে তাঁর ওপার্শ্বেও বামফ্রন্টের উপদেষ্টা হুমায়ুন বিহারক রাজ্যেরও বৈরাল, উপনিষদসহ সভাপতি চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভাষার চক্রবর্তী

ছবি : ইন্টেল বিলাস

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি টি রোডের মরকতবুজু গ্রান্ডেয়ে আয়োজিত বইমেলায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যের অন্তঃসর সচিবালয় কন্ডাল বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী উপেন কিস্কুর উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ছাত্র সমিতি

আয়োজিত এই বইমেলা উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সভাস্থান চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের উল্লেখ করেন যে, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বইমেলা রবীন্দ্র ঐতিহ্যেরই অনুসারী।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ভাষার চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের বলেন যে, তাঁরা যেন গান আর বইকে অবলম্বন করে ছেলোমেয়েদের গড়ে তোলেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বাসুদেব বর্মান বলেন যে, বই সংগ্রহ করলেই কাজ শেষ হবে না। বই পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয় বিদ্যারক রাজসেও গোয়ালার তাঁর অগ্রাধীনের অভিভাবতার উল্লেখ করেন যে, তাঁর মাতৃভাষা হিন্দি হলেও পরগুজের শ্রীকান্ত উপন্যাস পাঠের ভাণ্ডারে এক মাসের মধ্যে বাংলা শিখেছিলেন। তিনি রবীন্দ্র ভারতীর প্রাক্তন ছাত্রদের এই গুণ কাজকে সর্বরকম সহায়তার প্রতিক্রিয়া দেন।

মেসার তাংনর্থ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি নীতীশ বিশ্বাস ও সম্পাদক দুলার সরকার। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবং বং জনপ্রিয় শিল্পী সাক্ষেতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মেসার শেব সিন ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

(৩৭ পাতার পর)

সাক্ষেতিক প্রতি প্রেম ওভপ্রোভভাবে জড়িত। তিনি আরও বলেন যে, আর একটি বিক হল আবেদবর্জিত বৈবরিক বিক। কবি বলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া সাধারণ মানুষের বৈবরিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে

উপাচার্য বলেন যে, মাতৃভাষা ব্যবহারের অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি এই বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি শিক্ষাও বর্জন করা যায় না। তেমনি ভারতের অন্যান্য ভাষার চর্চাও প্রয়োজন দেশের সাংস্কৃতিক সঞ্চেচনের খাতিরে বলে তিনি অভিমত

প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে হৈমবতী সরকার ও সনৎ মারিক সঙ্গীত পরিবেশন এবং সুমন মণ্ডল ও হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শশাং মুখোপাধ্যায়।

অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর (ও বি সি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা

অনিল মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি জেলার মধ্যে অন্যতম উত্তর ২৪ পরগনা ভৌগোলিক দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র। জেলাটি একদিকে বাঙ্গালেশ্বরের সীমারেখা বরাবর, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত। একদিকে যেমন কৃষিজমির সঙ্গে নদী-নালা প্রভৃতি রয়েছে, অন্যদিকে ভেতর দিকে রয়েছে বেশ কিছু শহরও। তাই দেখা যায়, এখানকার মানুষ যেমন কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ মানুষ কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা বা চাকরির উপর নির্ভরশীল। কারণ, এই জেলা খান উৎপাদনে বাটতি জেলা বলে পরিগণিত। এই জেলার বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে, তারা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও এই জেলায় বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্পের বিকশা অন্যান্য জেলা থেকে ভাল। বাঙ্গালেশ্বরের সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় ফলে এই জেলার লোকসংখ্যা সব সময় হ্রিতিশীল নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে ৬০টি অন্যান্য অনুন্নত জাতি ঘোষণা করেছে, উত্তর ২৪ পরগনার ৬টা ব্লকে ২০টি গ্রামে ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষাটিতে মূল করেকটি বিষয়ের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে : যেমন এই সম্প্রদায়গুলির মোট পরিবার, লোকসংখ্যা, শিক্ষা, পেশা, জমির পরিমাণ এবং আয় বিয়ের কয়েকটি সারণির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। উন্নয়নশীল সমাজব্যবস্থার মানুষ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই মানুষকে জানতে পারলে সমাজব্যবস্থা যেমন জানা যায়, তেমনি ওই মানুষগুলির সম্বন্ধেও জানা যায়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাটির ক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর পর্যালোচনা করা যায় তাহলে তার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, তাই পাঁচটি সারণির মধ্যে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ব্লকের ২০টি গ্রামে যে ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে, সেগুলি হল—জাপালিক, বর্কর, কর্মকার, শাঁবারি, কীসারি, ছুতার, ময়রা, মোমক, কুম্ভকার, ঘোষী নাথ, নাপিত, সত্যাবী, তেলি, বাকুজী ও গোয়াল।

জাপালিক : কৃষিকাজ ও তাঁত বোনার কাজে নিযুক্ত থাকত, কিন্তু বর্তমানে এরা কেবল কৃষিকাজ ও অন্যান্য ছোট-বড় ব্যবসা ও চাকরি করে থাকেন।

বর্কর : এদের মূল কাজ সেলা ও রূপের গহনা তৈরি করা, বর্তমানে এরা উক্ত কাজ করা ছাড়া কৃষিকাজ করে থাকেন।

শাঁবারি : এদের মূল কাজ শব্দ থেকে শাঁখ তৈরি করা, বর্তমানে এরা এই কাজের সঙ্গে শব্দ থেকে নানা ধরনের আংটি, পলার মালা ইত্যাদি তৈরি করেন।

কীসারি : এরা সাধারণত কীসার বাসনপত্র তৈরি করে থাকেন, বর্তমানে অনেকে কীসার এই কাজ ছাড়া অন্যান্য ব্যবসাও করে থাকেন।

ছুতার : এরা কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করে থাকেন। আবার অনেকে এই ব্যবসাও করে থাকেন।

ময়রা / মোমক : এরা বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি করে থাকেন। এছাড়া এই ব্যবসাও করে থাকেন। বর্তমানে এর সঙ্গে এরা কিছু জমিজমারও কাজ করে থাকেন।

কুম্ভকার : এরা নানাব্যবস্থার মাটির বাসনপত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন। বর্তমানে এই কাজ ছাড়াও অনেকে কৃষিকাজ করে থাকেন।

কর্মকার : এরা লোহার নানাব্যবস্থার জিনিসপত্র তৈরি করে থাকেন। এছাড়া এরা কৃষিকাজ এবং অন্যান্য ব্যবসাও করে থাকেন।

ঘোষীনাথ : এদের মূল কাজ তাঁত বোনা ও কাঁধ সেলাই করা। বর্তমানে এদের কেউই কাজ করেন না, তাঁরা কৃষিকাজ ও ব্যবসা ও অন্যান্য চাকরি করে থাকেন।

নাপিত : এদের মূল পেশা মানুষের চুল-দাড়ি কাটা ও পুষ্কার উপকরণ এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে উপকরণ জোগাড় করা ও বিয়ের আসরে হুড়া কাটা। বর্তমানেও এই সব কাজ এরা করে যাচ্ছেন।

সংগ্রাহী : এঁদের মূল কাজ হল কৃষিকাজ, পশুপালন এবং বাবসা-বাণিজ্য করা। বর্তমানে এরা অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করেননি।

তেলি : এঁদের মূল কাজ হল সরিষা থেকে তেল বের করে বাজারে বিক্রি করা। বর্তমানে কেউই উক্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। এরা এখন বাবসা ও চাকরি করে থাকেন।

বারঞ্জীরা : এঁদের মূল কাজ পান-বরফ করে পান তৈরি করা, কিন্তু এই জেলায় কোনও বারঞ্জীরা উক্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। বর্তমানে এরা মূলত বাবসারী ও চাকরিজীবী। এই জেলার এই সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য শিক হল, এঁদের অধিকাংশই পূর্ববাংলা (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে আগত।

মোয়াল্লা : এঁদের মূল কাজ হল গোপালন এবং গরুর দুগ্ধ বাজারে বিক্রি করা। এছাড়া কৃষিকাজ করা, কেউ কেউ খামার তৈরি করে দুধের ব্যবসাও করে থাকেন।

উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির ধর্ম সকলের এক, অর্থাৎ হিন্দু, তাই তারা হিন্দুদের সমস্ত সেবা-সেবতার পূজা-আর্চা করেন। বাড়িতে শিব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কি আচার-অনুষ্ঠান সবই হিন্দুদের মতো। এমন কিছু বিয়ের ব্যাপারেও প্রায় একই আচার-অনুষ্ঠান করে থাকেন। কেবল সংগ্রাহীদের বিয়েতে একটা ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান হয়। সেটা হল মেয়ের বাড়িতে বিয়ের সময় একটা ঝাঁক-ঝাঁকো ও একটা লাঠল পাঠকাটি দিয়ে তৈরি করে বিয়ের আসরে উপস্থাপিত করা, উক্ত ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় নিজস্বের মধ্যে পারস্পরিক উচ্চ-নিম্ন জাতির ভেদাভেদ নেই। এই ব্যাপারে সবাই একই মত পোষণ করেন।

কলপ, সকলে (উক্ত ১৪টি জাতি) উচ্চ জাতি বলাতে প্রাকল আর নিম্ন জাতি বলাতে ততসিলি জাতি বোঝেন। এই জেলায় ২৬৬টি অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের পরিবারগুলির মধ্যে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, প্রত্যেকটি পরিবার উচ্চ ও নিম্ন জাত সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে পাঁচটি সারশির মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সারশিগুলির পরস্পর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১নং সারশি জাতিভিত্তিক জনসংখ্যার সারশি (১) এ ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতির মোট ২৬৬টি পরিবারের মোট জনসংখ্যা ১৪৭৯। এঁদের মধ্যে পুরুষ ৭৮৩, স্ত্রী ৬৭৮ এবং বালক ৭, বালিকা ১১। এই ২৬৬টি পরিবারের গড় লোকসংখ্যা ৫.৫৬। এই ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতির মধ্যে বৌগীনাথব্রহ্ম পরিবারগুলির মধ্যে সব থেকে বেশি ৬.৪০ জন গড় লোকসংখ্যা। কম লোকসংখ্যা মাপিত। যাঁদের পরিবারশি গড় লোকসংখ্যা ৪। এর কারণ মাপিতদের মধ্যে শিকিদের হার বৌগীনাথ থেকে বেশি। এছাড়া অন্যান্য কম একটি জাতির পরিবারশি গড় লোকসংখ্যা এইরূপ—কলপালিক ৬, হরিশ্বর ৬.১৫, শাখারি ৫.১৪, কাসির ৬.১, ছুতার ৬.৭, মরহা / মোক

৪.৮৫, সংগ্রাহী ৪.৫৬, তেলি ৪.৫৭, বারঞ্জীরা ৪.২৩, গোয়াল ৬.৪৭, তরফার ৫.১৫। পশ্চিমবঙ্গে গড় লোকসংখ্যা পরিবার শিখ ৬ জন। সেই দিক থেকে উপরোক্ত ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতির গড় লোকসংখ্যা পরিবারশি ৫.৫৬। ভৌগোলিক অবস্থানে ভিত্তা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের গড় লোকসংখ্যার সঙ্গে প্রায় এক। এছাড়া মোট ১৪৭৯ লোকসংখ্যার মধ্যে বিবাহিত পুরুষ-স্ত্রীর সংখ্যা ৬৯৩; এঁদের মধ্যে পুরুষ ৩০৮ এবং স্ত্রী ৩৪৬। অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা ৭৭৯। এঁদের মধ্যে পুরুষ ৪৪৫ জন এবং মহিলা ৩৩৪ জন।

১নং সারশির প্রতিফলনগুলিকে উপরে বর্ণিত কন্সার উল্লেখ্য হল এই যে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সারশিগুলির সঙ্গে ১নং সারশির একটা সমন্বয়পাঠন করা।

জাতিভিত্তিক শিক্ষাগত মানের বিভাজন ২নং সারশির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতি ২৬৬টি পরিবারে ১৪৭৯ লোকসংখ্যার মধ্যে ১০৮৩ পুরুষ ও মহিলা শিক্ষিত, তার শতকরা হার হল ৭০.৯১ জন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের শিকিদের হার ৫২.২১, পশ্চিমবঙ্গে ৫৭.৭০, উত্তর ২৪ পরগণায় ৫৭.৯৯। জেলার মোট শিকিদের হার থেকে উক্ত ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতিগুলির শিকিদের হার প্রায় শতকরা (৭০.৯১—৫৭.৯৯) বা ১৬ জন বেশি, তথা তাই নয় ভারত ও রাজ্যের শিকিদের হার থেকেও বেশি। এই সম্প্রদায়গুলি এই জেলায় শিকিদের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। ১৪টি অন্যান্য অনুন্নত জাতির মধ্যে (মরহা/মোক)দের শিকিদের হার সব থেকে বেশি—৯৪.১১ এবং গোয়ালার শিকিদের হার সব থেকে কম।

এ ছাড়া অন্যান্য অনুন্নত জাতিগুলির শিকিদের হার এরূপ—কলপালিক ৬৮.৩৯, হরিশ্বর ৭০.৩৫, শাখারি ৯১.৬৭, কাসির ৮৮.৫২, ছুতার ৮২.০৯, ব্রহ্মকর ৬৩.৮০, কলকর ৬১.১৯, বৌগীনাথ ৭৮.৭২, নলিত ৮৭.৫০, সংগ্রাহী ৭০.৭০, তেলি ৭১.৮৮, বারঞ্জীরা ৮৫.৪৬, ২নং সারশি থেকে দেখা যাচ্ছে যে উল্লেখিত অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে মোট শিকিদের সংখ্যা ১০৮৩, তার মধ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিকিদের সংখ্যা (২৬০ + ৪৪৪ + ১৪৪) বা ৪৪৮ জন এবং (৬৩ + ৮২ + ১৩ + ৭) বা ১৬৫ জন। মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত শিকি শিক্ষা অর্জন করেছে। এই মাধ্যমিকস্তর শিকিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ব্রহ্মকর স্তর পর্যন্ত শিকিদের সংখ্যা ১৩ এবং ১৩ জনের মধ্যে মরহাতে ১ জন, কলকর ১ জন, বৌগীনাথের ৪ জন, সংগ্রাহী ৬ জন এবং তেলিতে ১ জন এর এ পাস করেছে। এই সারশির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মাধ্যমিক (১৪৪ + উচ্চ মাধ্যমিক + ৬৩ + বি এ, বি এসসি ১১৪ জন + ও কারিগরি শিক্ষা ৭ জন) বা ২৭১ জন শিকিত পুরুষ ও স্ত্রী, তারা চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অত্যধিক প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী বালক ও বালিকা ২৬০ জন এবং

এম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী বালক-বালিকার সংখ্যা ৪৪৪ অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে (৪৪৪-২৬০) বা ২৮৪ বেশি। এতে বোকা হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে পেশাপড়া করে বা বন্ধ করে দেয় না, তাই পরবর্তী স্তরে বালক-বালিকার সংখ্যা বেশি।

এই সারণির মূল উদ্দেশ্য হল যে ১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতির পেশাগত বিভাজনের পর্যালোচনা করা ১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতির ২৬৬টি পরিবারের মধ্যে ৩৯৯ জন বিভিন্ন মূল পেশায় নিযুক্ত অর্থাৎ পরিবারপিতৃ ১.৪৪ জন। ৩৯৫ জন মূল পেশায় নিযুক্তদের মধ্যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ৭৮ জন যার সংখ্যার শতকরা (২০.২৬), চাকরিতে নিযুক্ত ২০ জন বা মূল পেশার (২২.৭৮) জন, ব্যবসা নিযুক্ত ১৭০ জন বা মূল পেশার নিযুক্তদের (৪০.০৪), নিম্নের পেশায় নিযুক্ত ১৩ জন যার মূল পেশার ৩.২২ জন, এই সারণির আর একটি নিক হল কৃষির উপর নির্ভরশীল (৭৮+৪০) বা ১৭৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৪৫.০৬ জন চাকরি, ব্যবসা এবং নিজস্ব পেশায় নির্ভরশীল (২০+১৭০+১৩) বা ২৭৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৯.১১। সুতরাং উক্ত জাতিগুলির পেশাগত দিক থেকে একটি বিশেষ নিক হল এরা কৃষি ছাড়া চাকরি ও ব্যবসার উপর নির্ভরশীল বেশি। তাই দেখা যাচ্ছে জেলার অন্যান্য জাতিগুলির থেকে পেশার ক্ষেত্রে একটি উন্নত ভাষাগায় অবস্থান করছে।

১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতিগুলির মূল উপজীবিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যোগীনাথ পরিবারপিতৃ ২০৫ জন, মূল পেশায় নিযুক্ত বা অন্যান্য অনুমত সম্প্রদায় থেকে বেশি, সব থেকে কম হল কর্মকার ৭৮ জন। এ ছাড়া কাপালিকের পরিবারপিতৃ ১.৩৮, স্বর্গাকরের ১.৭০ জন, শাঁখার ১.৭৯ জন, কঁসারি ১.৮ জন, ছুতার ১.৮ জন, ময়রা/মোসক ১.২৯, কুস্তকার ১.৬৪ জন, নাপিত ১.৮ জন, সত্কাষী ১.৪৪ জন, তেলি ১.০০ জন, বারুজীঘী ১.৫৫ এবং গোয়াল ১.৩১ জন। আর একটি উল্লেখযোগ্য নিক হল এই ১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতিগুলির মধ্যে শাঁখারি, কঁসারি, ছুতার, ময়রা/মোসক, কুস্তকার, নাপিত, সত্কাষী ও গোয়ালারা নিজস্ব জাতিগত পেশার ও ব্যবসায় নিযুক্ত, এরা নিজস্ব জাতিসত্তা রক্ষা করে জীবিক নির্বাহ করছে। ২১ জন সহপেশায় নিযুক্ত। এর মধ্যে সৈনিক মজুরির কাজ করেন ১১ জন। কৃষিতে কাজ করেন ৭ জন এবং ব্যবসায় করেন ৩ জন। তাই দেখা যাচ্ছে সহপেশায় সৈনিক মজুরির কাজ বেশি জন করে থাকেন। জাতিভিত্তিক চাষযোগ্য জমির বিভাজনের প্রকৃতি এই সারণির মধ্যে বিদ্যমান; আগের ৩ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল নয়। ৪ নং সারণিতেও দেখা যাচ্ছে যে ২৬৬টি পরিবারের মধ্যে ১৭১টি পরিবারের কেনও চাষযোগ্য জমি নেই। অর্থাৎ মোট পরিবারের ৬৬.৫৪% পরিবার ভূমিহীন, ১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতির মধ্যে ছুতার, শাঁখারি, কঁসারি, ময়রা ও বারুজীঘী পরিবারগুলির কেনও চাষযোগ্য জমি নেই। অর্থাৎ

পরিবারগুলি সবসময়ই ভূমিহীন। এ ছাড়া অন্যান্য অনুমত জাতিগুলির ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দ্ব্যাক্রমে কাপালিকের ২৯-এর মধ্যে ৪, স্বর্গাকরের ৩০-এর মধ্যে ২৭, কুস্তকারের ৩৯-এর মধ্যে ২৭, কর্মকারের ১৩-এর মধ্যে ১১, যোগীনাথের ২২-এর মধ্যে ৪, নাপিতের ১২-এর মধ্যে ২, সত্কাষী ২৭-এর মধ্যে ২১ জন, তেলির ১৪-এর মধ্যে ১১ এবং গোয়াল ২০-এর মধ্যে ২ জন। যে সব পরিবারের জমি আছে তারও একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যেমন (০০.০০০ একর) পর্যন্ত ২৩টি ৮.৬৫% ১.০৪—১ একর পর্যন্ত ৩১টি, ১১.৬৫% ১.০০—৬.৬৫ একর পর্যন্ত ১৩টি, ৬.০২% ১.৬৬—০০০ একর পর্যন্ত ১৭টি পরিবার ৬.০২% এবং ৩.০১—৮.২৬ একর উপরে ৮টি পরিবার আছে।

২৬৬টি পরিবারের মধ্যে বাস্তব পরিবারের সংখ্যা ২২ ৮.২৭%। (২৬৬-২২) বা ২৪৪টি পরিবারের বাস্তবজমি ও বাড়ি রয়েছে। এদের মধ্যে ৯৩টি পরিবারের ০১—০৪ কঠার মধ্যে বাস্তবজমি রয়েছে, যা শতকরা ৩৪.৯৬%। ৩০টি পরিবারের বাস্তবজমি রয়েছে ০.১১—২০ কঠার মধ্যে বা শতকরা ১১.২৮% এবং ২৮টি পরিবারের বাস্তবজমি ২০ কঠার উপরে রয়েছে বা শতকরা ১০.৫০% যে ২২টি পরিবারের বাস্তবজমি নেই তারা সবসময়ই ভাড়া বাড়িতে থাকে।

এই সারণিতে জাতিভিত্তিক পরিবারের আয়ের বিভাজন দেখানো হয়েছে। ২৬৬টি পরিবারের মধ্যে দারিদ্ররেখার নিচে বাস করে (২৫+৩০+৪৭) বা ১০২টি পরিবার বাসের বার্ষিক আয় ৩০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৫০.৭৫। আর দারিদ্ররেখার উপরে বাস করে (৬৮+১০+১২+৬+৮+১০) বা ১২৪টি পরিবার বাসের বার্ষিক আয় ১৫০০১ থেকে ৮০,০০০ হাজার টাকার উপরে অর্থাৎ শতকরা ৪৯.২৫। দেখা যাচ্ছে অর্ধেক পরিবার দারিদ্ররেখার উপরে অবস্থান করছে। এই দারিদ্ররেখার নিচে (৩০০০—৫০০০) হাজার টাকার মধ্যে ২৫ জন বাসের দর ৯.৪০%। (৫০০১—১১০০০) হাজার টাকার মধ্যে ৪৭টি পরিবার বা শতকরা ১৭.৬৭%। দারিদ্ররেখার উপরে হাজার টাকা বাস করে তাহাদের মধ্যে (১৫০০০—২৫০০০) হাজার টাকা আয়ের মধ্যে ৬৮টি পরিবার বা শতকরা ২৫.৫৬%। (২৫০০১—৩৫০০০) হাজার টাকা ১০ জন পরিবার বা শতকরা ৩.৭৬%। (৩৫০০১—৪৫০০০) হাজার টাকা আয়ের মধ্যে ১৯টি পরিবার বা শতকরা ৬.০২%। (৪৫০০১—৮০০০০) হাজার টাকার ৮টি পরিবার বা শতকরা ৩.৭৫। ৮০,০০০ হাজার টাকার উপরে ১০টি পরিবার বা শতকরা ৩.৭৬%। এই (১০+৮) বা ১৮টি পরিবার উচ্চবিত্ত বলে ধরা যায়। বা সাধারণ অপরূপ সাধারণ উচ্চবিত্তের সমান। এই ১৮টি পরিবার হল—কাপালিকের ২টি, ময়রা/মোসক—২টি, যোগীনাথের—৩টি, সত্কাষীর ৪টি—তেলির—২টি, বারুজীঘী—২টি পরিবার। সব থেকে গরিব ২৫টি পরিবারের

মধ্যে কণাসিক ৭টি, ময়রা/মোদক—২টি, কুস্তকার—২টি, কর্মকর—২টি, যোগীনাথ ১টি—নাগিণ ১টি এবং সখ্যাদী ১টি।

উপযোক্ত ১৪টি অন্যান্য অনুমত জাতির আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করার পরে কতকগুলি সমস্যা সূচক। প্রথমত দেখা যায় যে যারা জাতিগত পেশার নিবৃত্তি আছেন যেমন শাখারি, কীসারি। এদের কেন্দ্রে কীচামাল পাওয়ার অনুবিধা আছে। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের কোনও সুবিধা নাই। দ্বিতীয়ত সেকেন্সে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে এবং ব্যয়ও বাড়ছে। তৃতীয়ত চালু ও স্থায়ী মূলধনের অভাবে, উৎপাদন ও ব্যবসা দুই মার খাচ্ছে। চতুর্থত যে সব এলাকার তাঁদের বাড়ি ও কারখানাগুলি আছে—সব জাগার বিদ্যুৎ থাকলেও রক্তাঘাট, জল ও ফ্রেনের ব্যবস্থা হুটেই নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, আবার হুড়তার ও কর্মকরের পরিবারগুলি যে সব জাগার ও পরিবেশে বাস করে সেই সব এলাকার অভাবী মানুষের সংখ্যা কম বেশি। ফলে এলাকাতে দু'ব একটা স্থানীর কাজের বরাত পাচ্ছেন না; এক কথায় এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নত না হলে এদের উন্নতি সম্ভব নয়। পঞ্চমত জাতিগত বা অন্যান্য কারণিগরি পেশার ব্যাধি রয়েছে তাঁরাও কিছু করতে পারছেন না। এর প্রধান কারণ হল—এদের কারণিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নাই। যদিও কোর্টাগাতে একটি পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এদের Tradeগুলো ওই সমস্ত পেশাতে অবর্তমান। বর্ডন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নিম্ন জাতির পেশাগত কাজে উৎসাহিত। তার কারণ তাঁদের লেখাপড়া অন্যান্য উচ্চ জাতের সমান। কোথাও তার থেকে বেশি। তাই তাঁরা চান সরকারি চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। বা আজ্ঞাও তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। ওই সব পরিবারের সিক্ত সদস্যদের মধ্যে একটা হতশা ডাব সেবা যাচ্ছে। সপ্তমত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি দু'একটি কেন্দ্রে লেনদেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ঠিক কিন্তু সকলেই পাননি। আবার বীরা পেরেছে তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর জন্য করল হলো এদের প্রকল্পগুলো ঠিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারে অনুমোদিত নয়। কেবল সরকারি অনুমোদিত হোট হোট প্রকল্পগুলো নিতে হচ্ছে বা তাঁদের অভিপ্রেত নয়।

এই সমস্যাগুলি যদি দূর করতে হয় তাহলে দুভাবে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। একমিকে কিছু স্বয়ংসহায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথমত কীচামাল বাছাতে ন্যায্য মূল্যে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত সর্বত্র বৈশ্বাসিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে হবে। কেবল বৈশ্বাসিক লাইন থাকলে হবে না ওই লাইনের ৪৪০ ভোলটের লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত বড় অঙ্কের মূলধনের ব্যবস্থা করতে হবে এমনভাবে যার মধ্যে একটা অংশে অনুদান থাকে। তাই কল করতে গেলে সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ করাটা সম্ভব নয়, তাই

ব্যাংকে এই কাজে যুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত সরকারকে স্বত্বকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইহাতে উৎসাহের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে পঞ্চমত সরকারকে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কেউ টাকা নিয়ে অন্যথাতে ব্যয় করতে না পারে। প্রয়োজনে কীচামাল; মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি উন্নয়ন করে দিতে পারে। সেই জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। পঞ্চায়েতকে রক্তা-জল ও কলমিকালির ব্যবস্থা করে শেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পঞ্চায়েতকে এমন কতগুলি ব্যবস্থা নিতে হবে, যার ফলে কেবল খরচা হবে না, পঞ্চায়েতের আয়ও বাড়বে। সপ্তমত যারা চাষাবাসের সঙ্গে যুক্ত তাদের সেতের ব্যবস্থা করা বা পাম্পসেটের ব্যবস্থা করা, সমস্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এই ব্যবস্থা আছে। কেবল ওই ব্যবস্থাটা যেখানে অবর্তমান সেইখানে চালু করার ব্যবস্থা করা। অষ্টমত পরিকাশের উন্নতি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাড়ির সঙ্গে যে কারখানাগুলি রয়েছে তাহা ভিন্ন জাগার হানান্তরিত করে দুশপ-মুস্তের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে ইহার ব্যবস্থা করতে পারে। পরিসেপকে দুশপ-মুস্ত করতে হলে সামাজিক বনসুজনের ব্যবস্থা করতে হবে। নবমত উৎপাদিত দ্রব্যগুলি সরকারকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে বেশি করে উৎপাদন করতে পারে। ফলে দ্রব্য আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। দশমত মানুষ যদি সুখ ও সবল না থাকে তাহলে সে কাজে উৎসাহ পায় না, তাই চাই নীরোগ মানুষ। সেই জন্য ডাক্তার ও হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। বনমুল্যের বিনিময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এ ছাড়া কোনও মানুষ প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার বেশি না পরিশ্রম করে। ওইসব কাজের জন্য শিওরমিক যেন না নিয়োগ করে ডার দিকে পঞ্চায়েতের দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

মানুষ মানুষের জন্য এই সভা থেকেই মানুষ প্রয়োজন-ভিত্তিক সুশ্র, সবল, উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে থাকে। মানুষই বর্তমান ব্যবস্থাকে পালট এক নতুন সুশ্র সর্ব্বনের দ্বার খেঁচতে পারে। তাই সবকিছু উন্নতির সুশ্র মানুষ। সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি মানুষের সমর্থনযোগ্য আদাসের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে, তাঁকে বোঝাতে হবে এই সমাজব্যবস্থায় সে-ই অমূল্য সম্পদ। তাই তাঁর উন্নতির মানে সমাজের উন্নতি। সমস্ত সাক্ষর থেকে যুক্ত হওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। আর এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে চাই বাবা, বাসদ্বান ও শিক্ষার সমর্থন। উত্তর ২৪ পরগনার ১৪টি জাতি, ২৬৬টি পরিবার, ২০টি গ্রামে বাস করছে। ওই গ্রামগুলির যদি না উন্নতি হয় তাহলে ওই জাতিগুলির উন্নতি করে কোনও লাভ হবে না। লেখা শেষ করার আগে একটি কথা বলা উচিত। এই লেখাটি সম্পাদিত হল সম্পূর্ণ সংপূর্ণিত ডক্টর ভিত্তিতে।

সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ
সার্বভৌমত্ব-১

[illegible]

জাতিভিত্তিক শিকাগত মানের বিভাজন

সারণি-২

ক্রমিক নং	জাতি	মোট পরিষদের সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	প্রত্যেক সদস্যের ভোটে ভোট সংখ্যা	পঞ্চম সদস্য সংখ্যা	সদস্যের সংখ্যা	উচ্চ-মধ্যমিক	বি.এ./ বি.এসসি/ বি.এসসি	এস.এ./ এস.এসসি/ এস.এসসি	অতিরিক্ত সদস্য	মোট সদস্য	মোট সদস্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জাতিগত	২২	৪১৫	৩৩	৩৩	৩৩	১০	১০	—	—	১২২	৪১৫
২	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৩	শিক্ষার	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৪	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৫	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৬	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৭	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৮	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
৯	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১০	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১১	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১২	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১৩	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১৪	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩
১৫	কর্মসূচ	৩৩	৩৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩	৩	—	—	৩৩৩	৩৩৩

জাতিভিত্তিক পেশাগত বিভাজন সারণি-৩

ক্রমিক সং	জাতি	পরিবার		কৃষি	মূল পেশা				সেট	সহ পেশা			পরিবার শিল্প উপার্জনশীলতার স্তর
		পরিবার	সংখ্যা		দৈনিক সময়	চাকরি	ব্যবসা	পেশাগত		দৈনিক সময়	কৃষি	অন্যান্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	কৃষিক	২৫	১৭৮	২১	২	৫	১	—	০৪	৪	২	—	৪১
২	অধিকার	৩৩	২০০	—	২৪	১০	১৫	—	৫১	৪	—	—	৪০১
৩	শ্রমিক	১৪	৭২	—	৪	১	২০	—	২৫	—	—	—	০৭১
৪	কর্মসূচী	১০	৬১	—	—	৬	৪১	—	৭১	—	—	—	৪১১
৫	কর্মসূচী	১০	৬৭	—	৪	—	৪	—	৭১	—	—	—	০৭১
৬	অধিকার/অধিকার	৭	৩৪	—	—	১	৭	—	৭	—	—	—	০৭১
৭	কর্মসূচী	৩৫	২২১	১	১১	২	১৪	—	৪৭	৪	৪	—	৪০১
৮	কর্মসূচী	১০	৬৭	—	১	৪	৪	—	০১	—	—	—	০৭১
৯	কর্মসূচী	২৭	১৪১	৩	—	২২	২১	—	৪৪	—	—	—	৪০১
১০	অধিকার	১২	৭৪	১	২	—	০১	—	০১	—	—	—	৪০১
১১	অধিকার	২৭	১২০	৩	১০	১৭	৭	—	৩০	—	—	—	৪০১
১২	অধিকার	১৪	৬৪	—	৪	৭	২	—	৪১	—	—	—	৪০১
১৩	অধিকার	১০	৫৪	—	১	৭	৭	—	৪১	—	—	—	৪০১
১৪	অধিকার	২৩	১৪৭	৫	৩	১	০১	—	২৩	—	—	—	৪০১
১৫	অধিকার	২৩	১৪৭	৪৪	১১	১১	১১	৩২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

জাতিভিত্তিক পরিবারের জমির বিভাজন সারণি-৪													
ক্রমিক সং.	জাতি	পরিবারের সংখ্যা	মোট সংখ্যা	প্রত্যেক পরিবার						মোট পরিবার			
				০.০০- ১.০০ একর	১.০১- ১.৫০ একর	১.৫১- ২.০০ একর	২.০১- ২.৫০ একর	২.৫১- ৩.০০ একর	৩.০১- ৩.৫০ একর	৩.৫১- ৪.০০ একর	৪.০১- ৪.৫০ একর	৪.৫১- ৫.০০ একর	৫.০১- ৫.৫০ একর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	আপসিক	২৮	১৪	৮	১	১	২	১০	১	১	—	—	৮
২	ফরকার	৩০	২০০	৩	৩	—	—	—	—	—	—	—	৩
৩	শাখরি	১৪	৭২	১৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৪	কিসরি	১০	৩১	১০	—	—	—	—	—	—	—	১	২
৫	ফুতার	১০	৩৭	১০	—	—	—	—	—	—	—	১	৩
৬	ঘররা/ঘোরা	৭	৪৩	৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৭	ফুকার	৩৯	২৭১	৭৭	৮	৪	—	—	—	—	—	১২	৩
৮	ফরকার	১৩	৬৭	১১	১	১	—	—	—	—	—	—	—
৯	ফৌজি	২২	১৪১	৩	৫	৫	৫	১	—	—	—	—	২
১০	নাতি	১২	৭৪	৫	—	২	১	—	—	—	—	৩	১
১১	সত্যাবী	২৭	১২৩	২১	২	২	২	—	—	১	—	৫	১১
১২	ফৌজি	১৪	৪৭	১১	—	১	২	—	—	—	—	১	১০
১৩	ফারাকী	১৩	৪৩	১৩	—	—	—	—	—	—	—	—	৩
১৪	গোয়াল	২৩	১৪২	২	৩	৭	৩	৪	—	১	১	—	৮
	সর্বমোট	২৬৬	১৪৭২	১৬১	২৩	৩১	১৬	১৭	—	৩	২	২২	৩৪
	শতকরা হিচাব			৬৬.৫৪	৮.৬০	১১.৬৪	৬.৩২	৫.৩৯	—	—	—	৮.২৭	৩৪.৯৩
													১১.৭৮
													১০.৪৩

উত্তরণ

সাময়িকী

নবমখণ্ড □ প্রথম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ চৈত্র ১৪০৭—বৈশাখ ১৪০৮ □ এপ্রিল-মে ২০০১



অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



উত্তরণ

সাময়িকী

অন্যসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

সংস্করণ : □ প্রথম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ চৈত্র ১৪০৭ - বৈশাখ ১৪০৮ □ প্রিন্স-মে ২০০১ • লন্ডন-লুটাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদিত

দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া

চঃপ্রঃপঃ মন্ত্রী, অসম্ভব সমাজের কল্যাণ বিভাগ

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী

উপেন কিছু

কৌশলী, অসম্ভব সমাজের কল্যাণ বিভাগ

ডঃ সুখবিলাস বর্মা

প্রথম সচিব, অসম্ভব সমাজের কল্যাণ বিভাগ

উপসম্পাদক

দীনেশ চন্দ্র

সমস্যা

মহানন্দ চক্রবর্তী

বিশ্বকোষ বাহ্যে

অসম্ভব সমাজ

সীতেশ বিশ্বাস

ডঃ মানসকল্য চৌধুরী (সম্পাদক)

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ প্রসন্নকান্ত দেববর্মা

সুখেন্দু দেব

কল্পিত সহকর্মী

দ্বিগোপ্তা দুর্বার

দুর্গা দুর্গ

৪৪ সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

ডঃ অরুণচন্দ্রের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রভা নিবেদন

৫০

সম্পাদকীয়

● সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মানবের সংগ্রহের সেনাপতি

৫১

আন্তর্জাতিক আন্দোলন

● পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের অসম্ভব সমস্যা

৫২

কৃষি শ্রমিকের অসম্ভব

● বিদ্যা মৃত্যু : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসম্ভব

৫৩

অসম্ভব — অসম্ভব বিশ্বাস

কৃত্রিম তত্ত্ব, কৃত্রিম পথে

● বিভিন্ন বিবেচনা ● কৃত্রিম অসম্ভব — অসম্ভব সরকার

৫৪

গল্প

● শিকারের কথা — অসম্ভব দাস

৫৫

ভাষা প্রসঙ্গে

● 'কল্যাণপুত্রী' ভাষার জন্য অসম্ভব ও প্রাসঙ্গিক কথা — সীতেশ বিশ্বাস

৫৬

আসিয়ার উন্নয়নের মুখোমুখি

● জলপাইগুড়ি জেলার চৌধুরীর অগ্রগতি : একটি সমীক্ষা — দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

৫৭

● অসম্ভব উপগ্রহের নিম্ন অসম্ভব পরিবর্তনের অগ্রগতি

মূল্যায়ন : জেলা জলপাইগুড়ি — অসিত দেবনাথ

৫৮

● পুস্তিকা জেলার বিভিন্ন প্রকল্প : মূল্যায়নের কিছু তথ্য — সীতেশ বিশ্বাস

৫৯

● ধীরেন্দ্র জেলার একটি অসম্ভব জায় : সহায় প্রকল্পের সম্পূর্ণ সমলতার

একটি প্রতিবেদন — সীতেশ বিশ্বাস

৬০

□ গ্রন্থের বিষয় :

মহানন্দ চক্রবর্তীর ডঃ অরুণচন্দ্রের অগ্রগতি মূর্তির পাশে পাশে
পুস্তিকা অর্পণ করছেন (বাঁদিক থেকে) জনমতো বিমান বন্দু, অসম্ভব
সমাজের কল্যাণ বিভাগের প্রধান সচিব ডঃ সুখবিলাস বর্মা এবং
কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-নিবন্ধক সীতেশ বিশ্বাস।

ছবি : সুমিত্র গগনবীণ ও সীতেশ বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসম্ভব সমাজের কল্যাণ বিভাগ থেকে ডঃ মানসকল্য চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত এবং

কুমতী কর্পোরেশন প্রিন্টেড, ১৬৬, বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

কার্যালয় : সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা, সি ১/৪, সি আই টি স্ট্রিম, ৭এম, ডি আই সি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

চলমান তারিখ : ১১-৫-২০০১

ডঃ আবেদকরের ১১০তম জন্মবার্ষিকী : কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধানিবেদন

বা বাসাহেব ভীমরাও রামজি আবেদকরের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল কলকাতায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও মরণোত্তর বাসাহেবের মর্মের মূর্তির পাদদেশে সকল ১০টার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত শ্রদ্ধাঙ্গারপন অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জননেতা বিমান বসু, অগ্রদূতের সখ্যভায়ে কম্পানি বিভাগের প্রধান সচিব ডঃ সুখবিন্দাস বর্মা, দলিত সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে ডঃ বাসুসেব বর্মা, জসিমউদ্দিন আহমেদের পৌত্র সর্কার, 'ত্রৈকুতন গবেষণা পত্রের' মীর্জা বিদ্যাস, সারা ভারত নন্দমূরু সমিতির পক্ষ নরেশ দাস, অনুরের সখ্যভায়ে কম্পানি বিভাগের মুখপত্র 'উত্তরণ সাময়িকী'র উপদেষ্টা ধীরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ।

এরা ছাড়া বেসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পিত হয় সেতুলি হল : অল ইন্ডিয়া এস.সি. এস টি, ও বি সি এমগ্রিক্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, অল ইন্ডিয়া এস সি, এস টি ব্যাচ এমগ্রিক্স অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিসি অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতাসিএন অব ও বি সি, এস সি, এস টি অ্যান্ড হাইনরিটিজ গুয়েস্ট বেসল এবং গুরিয়েটাল ব্যাচ অব কমার্শের কর্মচারী সংস্থা প্রকৃতি।

বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত বাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজি আবেদকরের মর্মের মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় বাসাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আয়োজক 'আবেদকর সোসাইটি' কর সোসিও-ইকনমিক অ্যান্ড কলচারাল রিসার্চ-এর প্রাক্তন কমিটি।

সভার শুরুতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাসাহেবের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সমাবেশের উদ্বোধন করেন 'অধিকার' পত্রিকার সম্পাদক গৌরাস সর্কার।

বিশেষ অতিথি মীলকান্ত ভক্ত তাঁর ভাষণে হাজার হাজার বছর ধরে মনুবাদী সমাজে শূন্য নীড়নের উল্লেখ করে বলেন যে, বাসাহেব আবেদকরই তাঁর শূন্য চেতনায় শূন্য সমাজের চেতনা স্কার করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদায় উন্নীত করার সফল সঙ্গ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-নিবন্ধক মীর্জা বিদ্যাস ডঃ আবেদকরের জীবন ও কীর্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, যার যার দিভাতাসের প্রতিটি শিতকে এক একজন আবেদকর জৈরির কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষক, চেতনায় তাদের গড়ে তুলতে হবে বলিত সমাজকে, দেশের পঁচানি শতাংশ মানুষকে তাঁর অধিকার অর্জনের সঙ্গ্রামে গামিল করতে পারলেই বাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সার্থকতা লাভ করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সত্যপতি সুধীররঞ্জন দাস তাঁর ভাষণে বাসাহেবের আদর্শ ও কর্মপ্রেরণা অনুসরণ করে, তাঁর চিন্তাধারায় উদ্ভীষিত হয়ে দলিত সমাজের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সমসংশোধন

'উত্তরণ'-এর চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় 'রায়গঞ্জে একাত্তর নটক প্রতিযোগিতা' শিরোনামে প্রকাশিত ছবিখানির পরিচিতিতে অনবধানতাবশতঃ 'রায়গঞ্জে' উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবিখানি এবং ২৪ পৃষ্ঠায় ছবিখানি শিল্পগুড়ি থেকে পাঠানো হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

সাধু রামচাঁদ মূর্মু স্মারক প্রতিযোগিতা, ২০০০

বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারীদের নাম দেওয়া হল :

নাম	স্থান	ঠিকানা
সত্যরঞ্জন কিশু	প্রথম	উত্তরণগড়া
অনুভূতকুমার সরেন	দ্বিতীয়	সাগর
মনোমোহন হুডু	তৃতীয়	মুর্গাপুর
রশিনাথ হেমব্রহ্ম	চোথিপদ	
রূপচাঁদ হুডু	প্রথম	পূর্বলিয়া
স্নাতন কিশু	দ্বিতীয়	বাঁকুড়া
	তৃতীয়	বর্ধমান
	কবিতা	
বিনাম হেমব্রহ্ম	প্রথম	কোটবিহার
সদীপকুমার হেমব্রহ্ম	দ্বিতীয়	বাঁকুড়া
দিকমাল মূর্মু	তৃতীয়	মুর্গাপুর

সর্বাধিক শোষিত মানুষের সংগ্রামের সেনাপতি

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে অসহন্যের পাকঘণ্টনের রক্তাশে প্রবাহিত প্রবল উচ্ছ্বাসিত রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বহু দৃষ্টি ও সুহৃৎ চিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট ও অসীম শক্তির এদেশের কৃষকদের বহু কল্যাণের সম্ভারের মোড়করা বইয়ে দিয়েছিল। সেই মোড়কগুলির সিক্ত পরশে উনবিংশ শতকে আর এক প্রাণবান ভারত পথিকের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে যুগ যুগ ধরে 'মানুষের অধিকারে যুক্তিত' মানুষগুলির মুক্তির পথ রচনার সংগ্রাম চলেছিল। তিনি বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আশেবন্দর। সন্ততি দেশবাসী তাঁর ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশে ব্রহ্মা নিবেদন করলেন।

প্রতিস্মরণীয় শতের অপরাধে ভারতের সর্বাধিক নিপীড়িত-দলিত শ্রেণী বহন সার্বিক আক্রমণের শিকার বাবাসাহেব তখন আবিষ্কৃত হলেন তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বাণী নিয়ে।

অশিষ্ট সামাজিক অকল্যাণ ও লাঞ্ছনা ভীমরাও রামজিকে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আত্মীয় লড়াইয়ের প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর পূর্বসূরি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আত্মা ফলি আশেবন্দরের চেতনায় মিশে গিয়েছিল। ভারতে শূদ্র জাগরণের যে ভবিষ্যৎদী পোষিত হয়েছিল ভারতের সুব জাগরণের দায়িত্ব বিবেকানন্দের কণ্ঠে এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাজের দ্রাব্য শ্রেণীকে আড়াল করে রাখার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আশেবন্দরের দলিত জাগরণের সংগ্রামের নিশিবি আলো ছেলে দিয়েছিল।

আশেবন্দর তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন নিপীড়িত মানুষকেই তাঁর প্রতি নিপীড়নের অবসান ঘটতে হবে। শোষণমুক্তির লড়াই একমাত্র শোষিত শ্রেণীই চালাতে পারে। কণ্ঠ ও শ্রেণী শোষণের শিকার দলিত শ্রেণীকেই সমাজের কণ্ঠদী ও শোষণ শ্রেণীর আক্রমণ পূর্ণবল করতে হবে। উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হতই মহানুভব হোন না কেন, পরিষদের লাঞ্ছনার প্রতি তাঁর সমবেদনার বাণী হতই সোজার হোক না কেন, সমাজতন্ত্রের মরা ভাল ফটাইট করে সমাজসংস্কারে হতই সুদৃঢ় রূপ দেবার চেষ্টা হোক না কেন, আত্ম সংস্কারের প্রয়োজনে সে বিবৃক্তের মূল উপপটনের কাজ না হলে কেন ফলই হবে না।

সমাজের অশুণ্য দলিত শ্রেণীর মানুষদের গাছীজি 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছিলেন, উচ্চবর্ণের সমাজ-প্রভুদের বিবেকের কাছে আবেদন জানানোই প্রবন্ধনা থেকে অশুণ্যদের মুক্তির উপায় বলে তিনি মনে করতেন। হরিজনদের সামাজিক মুক্তির আবেদনে তিনি অনশনকেও এক উপায় বলে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু আশেবন্দরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "....প্রবন্ধকের বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন নয়, অধিকার আদায় করতে হয় অবিয়াম সংগ্রামের দ্বারা।" একই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারায় : শোষণ শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শোষিত শ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি সমাজ বিকাশের দার্শনিক দ্রষ্টার শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছিলেন। ভারতের শ্রেণী সম্পর্কে জাতি-ব্যবহার স্থির ভঙ্গিতে লক্ষ্যে রাখতে তিনি বলেছিলেন, ভারতে বিকাশের সমস্ত অগ্রগতি ব্যতী হলে রয়েছে কণ্ঠব্যহার।

কার্ল মার্কসের মতো আশেবন্দরও সমাজ-ব্যবহার, সমাজের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণীর সংগ্রামই তাদের মুক্তির পথ বলে মনে করতেন। সমাজে শূন্যতা ছাড়া আর আর কিছুই হয়বার নেই সে সর্বহারা, আর সমাজে যে কিছুই নয় সে দলিত। এ দুয়ের যুদ্ধ সংগ্রামেই ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। তাই আশেবন্দরের আদান : সমাজ-দাসত্বের অবগান ঘটতে হলে দলিত শ্রেণীকে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এই মুক্তি আর্থনের পথে আশেবন্দর দলিতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই প্রথম কাজ বলে মনে করতেন। কেননা, তিনি জানতেন, শিকাই চেতনা আনে। তার পরেই তিনি নিয়েছিলেন সংগঠন গড়ার ডাক। শিক্ষার সমাজ-সম্প্রদায় মানুষ সংগঠন পড়ে চলে—যার পরিণতি ঘটবে সামাজিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক নিপেষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন—আত্মীয় সে আন্দোলন সংগঠন করে আত্মীয় সংগ্রামে দলিত ও তা সর্বাধিক শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনা করে গেছেন দলিত মুক্তির সেনাপতি বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আশেবন্দর।

পূর্বভারত ও বাংলাদেশের আদিবাসী

উদ্ধৃত সমস্যা সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

১৯-২০ মার্চ, ২০০১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে অনুষ্ঠিত হল পূর্বভারত ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উদ্ধৃত সমস্যা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, সমাজসেবক ও কয়েকটি জনজাতির বিদগ্ধ ব্যক্তি। আলোচনাসভাটির উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক বুদ্ধদেব গৌড়ী। বাংলাদেশের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেক্টিভ, কলকাতার ক্যারিড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডঃ আবদুল করিম ফউলেন পোহিত এই আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনাসভার মূল ত্র্যক্ষ (Key-note address) দেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডঃ বি কে রায়বর্মা। প্রবন্ধ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ডঃ এইচ কে অরিনিন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ রঞ্জন রায়। আলোচনাসভার উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও সদস্য ডঃ রমেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

দুদিনের এই আলোচনাচক্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সকেট, অর্থনৈতিক সমস্যা, মহিলাদের অবস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিষ্কণ্ডার প্রতি আলোকপাত করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রশাসনিক / পরিকল্পনাত্মক ভ্রষ্ট-বিচ্ছিন্নতার ফলে বাংলাদেশ ও পূর্বভারতের বিভিন্ন জনজাতি যে কী নিদারুণ অত্যাচার ও



ডঃ বি কে রায় বর্মা। আলোচনাচক্রের মূল ভাষণ দান করছেন

বঞ্চনার নিকার তা তথ্যের সাহায্যে ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে ৩০টি গবেষণাপত্র। প্রবন্ধের মাধ্যমে ডঃ বি কে রায়বর্মা তাঁর মনোজ্ঞ মূল ভাষণে আদিবাসীদের সমস্যা তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি তাদের বর্তমান অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন যে ভারত বা বাংলাদেশ নয় সমগ্র বিশ্বের জনজাতিগোষ্ঠীগুলি এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছে। বিচারনের প্রচণ্ডে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখন সংকটাপন্ন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য চাই এক বিশ্বজনীন প্রতিরোধ। যে প্রতিরোধের মূলে থাকবে মানবিক আবেদন, আবেগ ও পারম্পরিক যোগাযোগ। ডঃ অরিনিনও অসিহীন সকেট মোরনে আপাতদৃষ্টি মনোভাব পোষণ করেন। মোষণীস সমাজে তা সত্ত্ব।

আদিবাসী সমস্যা সম্পর্কিত এই আলোচনাসভার বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ

ফেরদৌস, আর ডি সি-এর ডঃ মেসবা কলম, ছিল উইমেল ফোরেশনের ইন্দিরা মেওয়ান। বাংলাদেশের উপজাতিদের সমস্যার কথা ভুলে ধরেন মানস গৌড়ী, সঞ্জীব দ্রোস ও মঙ্গলকুমার চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

পূর্বভারতের বিভিন্ন জনজাতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বপনকুমার গ্রামাণিক, নৃতাত্ত্বিক ডঃ শ্যামলজাতি সেনগুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ রঞ্জিতকুমার ভট্ট ও ডঃ এস আর হতুল, অরুণাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক ডঃ সরিৎকুমার গৌড়ী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ মালবিকা দাসগুপ্ত, ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সর্বকর্ষ-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ও উপ-অধিকর্তা বহুক্রমে ডঃ অজিতকুমার পণ্ড ও ডঃ মণীন্দ্রকুমার রায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-নিবন্ধকার ডঃ নীতীশ বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ধীরেন্দ্রনাথ বাবু ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাংস্কৃতিক গবেষণাগারের আধিকারিক ডঃ প্রসেনজিৎ দেববর্মা প্রমুখ।

এই আলোচনাসভার বিশেষ প্রতিটি ছিল কয়েকটি জনজাতি প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বৈদেশিক মধ্যে উল্লেখ্য চাকমা, গারো, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে আদিবাসী সমাজ ও সমস্যার আলোচনা করেছেন। আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডাবা, পরিচয় ও প্রশাসনিক পূর্ণতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে বলে জনৈক আদিবাসী বক্তা মন্তব্য করেন। সকলের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক মানের এই আলোচনাচক্রটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।।

বিরসা মুণ্ডা : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের অবদান

মনোহর বিশ্বাস



চিত্র : আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে

ভারতে আদিবাসীদের সংগ্রামের দুটি পর্ব আছে। একটি পর্ব স্বাধীনতা পূর্বকালের এবং আরেকটি পূর্ব স্বাধীনতা উত্তরকালের। দুটি পর্বের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীনতা পূর্বকালে তাঁরা আত্মবিসর্জননের ভিতর দিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন ‘নিজদের’ অর্থাৎ দেশীয় শোষকদের হাত থেকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিলেন বিশেষি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে। সেখানে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা উজ্জ্বল এবং নানাভাবে স্মরণীয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালের ইতিহাস সঠিক অর্থে কোনও স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস নয়। সে ইতিহাসে আত্মবিসর্জন আছে, সশস্ত্র সংগ্রাম আছে, কিন্তু করেছেন তাঁরা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে—আর্থিক ও সামাজিকভাবে সাহা আদায়ের জন্যে। ভারতীয় মুক্তবাহিনীর পরিকাঠামোতে গিরিবাসী-ওহাবাসী, মলবাসী-হনবাসী মানুষেরা সুব্যবস্থায় বন্ডিত হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং সেই সুব্যবস্থার দ্বারাও সমর্থনের জন্যে তাঁরা করেছেন সংগ্রাম। তাঁদের সে-সংগ্রাম আইডেনটিটির

প্রশ্ন, সকল মানুষের সঙ্গে সমর্থনালয় প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন। সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে গিরে কখনও কখনও দু-একটি ভ্রাতা মানসিকতার পুষ্টি লাভ করেছে সে প্রশ্ন। বশুতঃ নয় ব্যবহার করে নির্বাহী মানুষের রক্ত করেছে অর্থাৎ ভাই ভাইকে করেছে পুন। উপহাস দিয়ে বলা যায়, ত্রিপুরার এক বিদ্রোহী অজল ভূতে উপভোগি ভাইয়েরা লিপ্ত হয়েছেন দ্রোহাযোগ্য হত্যাযজ্ঞে। এটি উদ্দেশ্য লাভের লক্ষ্যে সঠিক পথ নয়—একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম মুক্তবাহিনীর পরিকাঠামোতে ওই কাজ যাদের এক ভুল পথে হাঁটা। দেশের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অগ্রগতি সম্ভব তাকে পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া। আর দ্বিতীয় আর একটি ভ্রাতা মানসিকতা স্বাধীনতা-উত্তরকালে আদিবাসী সংগ্রামের মধ্যে কাজ করেছে, তা হল দেশটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে আত্মশাসনের কথা তারা। উপহাস দিয়ে বলা যায়, সাড়ের দশকে আমরা প্রত্যাক করেছিলাম নাগা ও মিজোমের আপোলন। সেই আপোলনের ফলস্বরূপে অসম-কম্বা ভাগ হয়ে গিয়েছিল মাত ভাগে। নাগাল্যান্ড মিজোরাম মনিপুর প্রভৃতি নতুন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু তা যে সুব্যবস্থার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে—এ দাবি কি এখন আর কেউ করতে পারেন? সেই একই ধারায় জন্ম হয়েছে আরও তিনটি নতুন রাজ্যের। অতি সাম্প্রতিককালের ঘটনা। বিহার ডেহে জন্ম হয়েছে কাড়বাগের, উত্তরপ্রদেশ ডেহে জন্ম হয়েছে হরিদ্বারের রাজ্যের। কিন্তু কি লাভ হয়েছে এতে? এর মধ্যে কি আসল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে? নিকটই নেই। তা হলে ওই ভ্রাতা পথে হাঁটা কেন? যে কারণে যৌথ সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো করে গিয়েছে পাকা মানুষটি আর আর উন্নতিতে পুষ্টিলাভ করতে অক্ষম, সেই একই ধারা সমানে বয়ে চলেছে ওই ভ্রাতা মানসিকতার মধ্যে।

তাঁরা ওই মুহুর্তে কামতাপুরি আপোলন করছেন কিংবা করছেন গোখালান্ডের আপোলন এবং পশ্চিমবঙ্গের দেহ ডেহে টুকরো করতে চাইছেন তাঁরা ইতিহাসের থেকে বোধ করি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন যে ওটা কোনও সঠিক পথ নয়। ওই ভ্রাতা পথ পরিহার করে তাঁরা নতুন পথের সন্ধান খুঁজে নিতে পারেন।

এই নিবন্ধের মূল ভাবনায়, আদিবাসীদের পদসংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে কতটা অবদান জুগিয়েছে তা নিতে আলোচনা করা। আর বিরসা মুন্ডার স্বকণ্ঠতা বলা।

বিরসা হোনিগপুন্ডের ‘জঙ্গলবাসী’ মানুষ—বিরসা হোনিগপুন্ডের গিরিবাসী মানুষ। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে কিছু

মহাত্মার থাকলেও কিন্তু তাঁর মুক্তাঙ্গিন নিয়ে কোনও মহাত্মার নেই। রীতি জেলার উলিহাটতে তাঁর জন্ম ১৮৭৫ সালের ১০ নভেম্বর। শিভা সূ্যনা মুণ্ডা—সূ্যনা ছিলেন তাঁর শিভা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর মায়ের নাম কই মাণ্ডা—তিনি ছিলেন নিম্বার মুণ্ডার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিরসা ছিলেন তিন ভাই এবং দুই বোন। এবং বিরসাও ছিলেন শিভামাতার দ্বিতীয় সন্তান। মুণ্ডা পরিবার খ্রিস্টধর্মী ছিলেন এবং মিশনারিদের স্ট্রেন্ট শিকার আলোক প্রবেশ করেছিল তাঁদের পরিবারে। বিরসার জন্মের অনেক আগে তাঁর পিতৃপৈত্র সূ্যনা মুণ্ডার বড় ভাই কান্দু মুণ্ডা উলিহাটতে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। সূ্যনাও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এর কিছু দিন পরে। আপন প্রতিভার সূ্যনা মুণ্ডা জার্মান মিশনারি প্রচ্যাবক পদে উন্নীত হন।

মুণ্ডা পরিবার ঘরটিটা ডাঙাশড়ার শিকার হয়েছিলেন দীর্ঘদিন। ছান থেকে হানান্তরে তাঁদের উঠতে হয়েছিল কয়েক পুরুষ। রীতির পাশ নিয়ে এক ছোট্টা ডোমলগরা বয়ে গেছে। কয়েক পুরুষ আগে বসবাসের জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তাঁর পূর্ব পুরুষ উপস্থিত হয়েছিলেন ডোমলগরার ফুল। দুই ভাই দুই আর নাও মজ এক কাঠের গুড়িতে ঢেপে পার হয়েছিলেন মসী। রীতি জেলার ঘুরি মহাকুমার সারাংগালদা নিকট টিমলায় বসবাস শুরু করেন। তাঁদের কেউ বা নতুন গ্রাম বনভিদি প্রতিষ্ঠা করেন, কেউ বা প্রতিষ্ঠা করেন উলিহাট, কেউ বা মিলুয়া, কেউ বা সিলামা, কেউ বা মইলপতি, কেউ বা জোঁচনা, কেউ বা বাগরি, কেউ বা শেলবা আর কেউ বা প্রতিষ্ঠা করেন চালকান গ্রাম। জঙ্গল কেটে কসল উপগদন হয়ে গাঁড়ায় পেশা। জঙ্গলের ফলমূল দ্রুতিবারণ করে ক্ষুধার্তের। এমন খায়ার জীবন চলতে থাকে মুণ্ডাদের আদি ও অনন্তকালের থেকে। শিখুভাঙ্গির মুণ্ডাসমাজে পঞ্চায়েত শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কঠোরভাবে চালু অনানিবার্য থেকে। নারীরা করেন রাধাবায়া, সসোয়ের সেবাফোনা আর চাষের কাজ। নারীর সম্মান আর মূল্যবোধ এই সমাজে ভিন্ন মাত্রার। পাপপ্রবণ মত নারীর প্রতি অসহনকার, অভিশাপ চালু নেই তাঁদের সমাজজীবনে। চুবি, খুন, বলাৎকার এই সমাজের অমার্জনীয় অপরাধ। সন্তীষাহের মতো কুসংস্কারও নেই তাঁদের সমাজে।

বিরসার বাল্যকাল অতিবাহিত শিভামাতার সঙ্গে তাঁর পিতার মাটুল গ্রাম চালকানে। শৈশবে শোণাশড়ার সুযোগ জেটেনি তাঁর। রাখাল বালকের কাজ করতে হয়েছিল মাঠে মাঠে। চর্যাক হত ডেড়ার পাল। রাখালিয়া কীলিতে সুব তোলায় হয়ে উঠেছিলেন নিপুণ। পতপাখিও কান পেতে ওনত তাঁর বশির টান। নিমকশ খারিয়ার কারণে তাঁকে পরিচয়ে বেতরা হয়েছিল তাঁর মাটুল গ্রাম আদুবাহাটতে। তাঁর বড়ভাই কুমতাও ওক করেছিলেন অন্যের বাড়িতে রাখালির কাজ। আদুবাহাটতে থাকাকালীন বিরসা ভর্তি হন বিদ্যালয়ে। এখানে পড়াশুনার কাজ দীর্ঘস্থায়ী হলেন। আদুবাহাটতে থেকে ফিরে আসেন মা-বাবার কাছে চালকানে। সেখান থেকে বাড়ীতে গিয়ে জার্মান মিশনারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথমিক পরীক্ষার বসেন এবং উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬-এর মার্চ ৭-এ চাইবাসাতে তাঁর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠান হয়। চাইবাসার উচ্চবিদ্যালয়ে এই সময়ে স্থিত বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করত। বিরসা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেননি; তেমন তিনি আবার হিন্দুধর্মের প্রতিও হৃদয় পারেননি আন্তরিক। তিনি আদিবাসীদের সেবা নিয়োজ্যকে মানতে চাণবান বলে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে তিনি যখন চাইবাসাতে উচ্চ প্রথমিকের পাঠ নিতে চেয়েছিলেন, তদানীন্তন রেভারেন্ড আগুস্তি জনিয়েছিলেন তাঁর ভর্তির ব্যাপারে। কিন্তু শৈশব থেকেই বিরসা ছিলেন আপনায় ভিতরের এক ঐক্যবিশিষ্ট বসীদান। তাই তিনি চাইবাসাতে পড়বার জন্য হস্তে উঠলেন নাচোড়বালা। কয়েকজন অভিভাবককে নিয়ে বিশেষ করে বে-সকল ছাত্ররা ভর্তি হয়ে বার্ষ হরয়েছিল তাঁদের অভিভাবকদের নিয়ে উপস্থিত হলেন মিশন কর্তৃপক্ষের প্রধানের কাছে। ল্যাপিরলির বোহনের পুর অভিগ্রাম, মসী বাসের পুর বাবা ও ইনককে সঙ্গে নিয়ে বিরসা ভর্তি হলেন চাইবাসার বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে মাধ্যমিকের পাঠ শেষ হতে না হতেই তিনি জড়িয়ে পড়েন ছোট্টাপপুরের 'সহসার' আন্দোলনের সঙ্গে। বিশেষ শাখকদের তিনি কখনও প্রচার আসনে বসাননি। ধর্মীর ও রাজনৈতিক পোষক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁদেরকে। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ অবধি চাইবাসাতে কাটানোর পর সহসার আন্দোলনের সমর্থনে ত্যাগ করেন জার্মান মিশনের সদস্যপদ, ত্যাগ করেন চাইবাসা।



বিরসা মুণ্ডার জন্মশতাব্দীর উপলক্ষে কলকাতায় কলক জোয়ার থেকে নির্বাচন পোতাঘরে

চুবি : সহসর বর

বিরসা ঐকীশভিত্তিতে এক পত্তিমান পুরুষ। তিনি সেই ঐকীশভিত্তি প্রয়োগ করে একদিকে পালিরদের প্রভাব প্রতিহত করেছেন, আর অন্যদিকে হিন্দুদের শৌভলিকতার প্রভাব এবং কংগ্রেসবাদের প্রভাব থেকে আদিবাসী সমাজকে নতুন হাওয়া উত্থাপন করেছিলেন 'সিংঘোজা' নামের একমাত্র ঈশ্বরকে আরাধনার মধ্য দিয়ে। নানান জাকজমকপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের থেকে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে এনে এই ধর্মের মানুষের উপর থেকে অর্থনৈতিক চাপ কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এটা তাঁর জীবনের ধর্মীয় সংস্কার। ধর্মীয় সংস্কারের থেকে যা বড়: তা হল তাঁর নিষেধিত রাজনৈতিক আন্দোলন। তিনি কৃষিজমীরা আদিবাসী সমাজকে কংগ্রেসজাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। জমিদারি আর ব্যক্তিমালিকানাের চাপে দূর্বল হয়ে পড়ছিলেন কৃষিজমীরা। কৃষিব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বাঁচাকল। অস্বাভাবিকগীরা, সুস্বাদ্য ও মহাজনেরা অভিজিত করে তুলেছিল কৃষিজমীরা ও অরণ্যজীবীদের। বহিরাগত সৈন্যের ফড়ে ব্যবসায়ীদের চাপে চাহিয়া কসলের নানানমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় গরিবরা ব্যাকুতে থাকে আদিবাসীদের। মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারে লাগে হাওরা। ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে ধর্মান্তর। বিরসার ধর্মীয় আর রাজনৈতিক আন্দোলনের উপাদান হয়ে গাঁড়ায় ওইসব। বিহারের রীতি, লিট্‌লুম জেলা সহ সমগ্র ছোটনাগপুর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিরসার গণ-অভ্যুত্থান। ডাক আসে উলতলানের, মুন্সির।

উনিশ শতকের প্রথম দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগুতায় আসে ছোটনাগপুর। এ দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে একটি টাংবোয়ার গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় কোম্পানির অধীনে। বিরসার উলতলানের ডাক আসে ১৮২৫ সালে। তাঁর সঙ্গে সহযোগী হয়ে বাঁরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা পোষণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নারসার মার্টিন মুণ্ডা, কসবারের জন মুণ্ডা, চালকায়ের জন মুণ্ডা, মেসৌ মুণ্ডা প্রভৃতি উল্লেখ্য নাম। কিছুদিনের মধ্যে বিরসার আন্দোলন সমগ্র জাগ পঠিগ্রহ করে। তাঁর ধনুক কুঠার আর কামে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে বাহিনী। ঐকীশভিত্তি, সাংগঠনিক নেতৃত্ব আর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য কিছুদিনের মধ্যে চালকায় হয়ে ওঠে এক তীর্থক্ষেত্র। বিরসাকে ডগবান বিরসা বলে ডাকতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। কাজারে কাজারে মানুষ এসে গাঁড়াতে থাকেন তাঁর পাশে। কৃষকরা জমিতে হল ঘোড়ানা বন্ধ করে যেন। ব্রিটিশ সরকার শিখায়া হয়ে পড়েন। বিরসা মূর্তি-পূজা বিক্রোদী, বিরসা বর্ষবেদী ইত্যাদি বলে প্রচার চালাতে থাকেন তাঁরা।

২২ আগস্ট ১৮২৫ পর্বত বিরসাকে স্রেস্তারের কেননও পরিকল্পনা তদানীন্তন সরকারের ছিল না। ২৫ আগস্ট বিরসার ডাকে ৬০০০ সশস্ত্র মানুষ চালকায়ের বিরসার গ্রামে জড়ো হন। এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন ২৭ আগস্ট তাঁরা শত্রুর উপর

হুজালালা চালাবেন। সকল বিশেষিকে একদিনে শেষ করে দেওয়াই ছিল তাঁদের প্রকল্প—এই প্রকারের এতটা গুরুত্ব সৈন্য দিকুবাহিনী সরকারের কানে পৌঁছে দিলে তাঁকে স্রেস্তারের ব্যবস্থা করেন। ১৮২৫-এর ১৯ নভেম্বর বিহারের রায় প্রকাশিত হয়। জেল ও জরিমানা দুটোই আরোপ করা হয় তাঁর উপর।

আড়াই বছর পর জেল থেকে ছাড়া পান বিরসা। প্রথম অধ্যায়ের পর আবার নতুন অধ্যায় শুরু করেন তিনি। এবার তিনি অনেকখানি অল্যাস মানুষ। কৌশলগত দিক থেকে মুকলেন, চালকায় তাঁর আন্দোলনের নিরাপত্তা স্থান নয়। তিনি এবার মুণ্ডা-মুণ্ডারিদের দিয়ে বেঙ্গা জনপদ জোঁমবাড়িতে বেয়ে নিকেন তাঁর আন্দোলনের শীর্ষ হিসেবে। ১৮২৮-এর ফেব্রুয়ারিতে মুণ্ডা প্রতিদ্বন্দ্বিদের সভা বলে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য পরের সভা হয় মার্চ ১৮২৮-এ সিমঝুয়া পাহাড়ে। ডাক আসে গলায় হার, ফুলের মালা, চিকনীর ব্যবহার, নৃত্যগীত সবকিছু পরিহারের। মুণ্ডা প্রতীক সাধারণতাকার চার পাশে কৃত্রিম কুঙ্কন তৈরি করা হয়। আর একটাই মাত্র পন তাঁদের 'দিকুবাঙ ধংসে কম'। ব্রিটিশ সরকারও তখন কঠোর থেকে কঠোরতর। রীতি ও সিদ্ধান্ত জেলা জুড়ে সর্বত্র জাল পাড়া হল বিরসাকে স্রেস্তার করে তাঁর আন্দোলন কয়েক করেতে।

১৮২৯-এর শেষের দিকে সরকারের কানে বিরসার পুনঃ অবিভাবের উদ্বেগজনক খবর আসে। ছোটনাগপুরের বিদ্রোহ অঙ্গল জুড়ে তীব্রবৃত্তি আর অগ্নিসমোপের ঘটনা ঘটতে থাকে। বিরসার গণ-অভ্যুত্থান থামতে সিদ্ধান্ত হয়ে পড়েন সরকার। ওই বছর ফিটমাস উৎসব জান হয়ে গিয়ে এক কলপ চেষ্টায়া লাভ করে। ৫ থেকে ৬ জানুয়ারি ১৯০০-তে জনপোকবি, যোগেটা, শক্তরা ও গোড়হাট জসলে বিরসাকে স্রেস্তারের জন্য ব্যাপক জমাদি চালান হয়। এই সময় বিরসার কর্মক্ষেত্র ছিল অন্যত্র বিস্তৃত। ৬ জানুয়ারি তাঁরা বোরটোভিতে মিটিং করে ৭ জানুয়ারি সকাল ১০টার বৃত্তি থানা বধলের উল্লেখ্য ঘরা করেন। জানুয়ারের গ্রাম থেকে মুণ্ডারা দলে দলে এসে সমাবেশের কলবের বৃত্তি করতে থাকেন। তাঁর-ধনুক, বর্শা আর ভোমালি হাতে, পরনে তুবার ওড় বৃত্তি, মাথায় পাগড়ি।

খানার পাঁচজন হামিলদার, দুটি রাইফেল আর সাধারণ কিছু কার্তুজ ছাড়া কিছুই ছিল না। ফুলফুল করে এগিয়ে আসা জনতার কাছে লাল পাগড়িওয়ালা লোকওলোর প্রতিরোধ সহজেই ভেঙে পেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল রীতিতেও। তখন রটল ৮ জানুয়ারি বিরসা অগ্রসর করবেন রীতি থানা। শহর থেকে সুসজ্জিত ৪০০ সৈন্য আসা হল রীতিতে। এবং ৭ তারিখের ঘটনার পর রোটার ইনচার্জ অফিসারকে ১৫০ জনের একটা বিশাল রাইফেলবাহিনী নিয়ে বৃত্তি বাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে খবর আসে বিরসাবাহিনী সহিলকে অগ্রসর করতে আসছেন। খবর নিয়ে স্ট্রেক্টিভ ৪০ জন জোরান ও ক্যাপ্টেন রোভিকের সঙ্গে নিয়ে সহিলকে পৌঁছে যান।

তখন সাইক্লের মাঝ তিন মাইল দূরে ডোমবাড়ির কিছু দূরে
স্টেইলারকন্ড পাখড়ে ৯ জানুয়ারি বিশাল সমাবেশ করেন বিরসা
ও তাঁর শিষ্যগণ। পাখড়ে যুদ্ধ করেন পাখরের বড় বড় উঁই।
বাঘার-বাঘার, রান্নার সামান্যপ্রায়, অসংখ্য টাঙ্গি, তাঁর, ধনুক
জার পাখর ছোড়ার কিঙ্গা। একটা মুখোমুখি লড়াইয়ের
সামাগ্রিক রং। লড়াইতে ব্রিটিশ সেনাদের ক্ষমকতি ভেঙে না
হলেও প্রভুত ভক্তি হয়েছিল বিরসা বাহিনীর। জানা যায় ৪০০
মুতার মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনার বিরসার মেরুতও ভেঙে
গিয়েছিল অনেকখানি। এই পরাজয়ের সূত্র ধরে অত্যাচার বৃদ্ধি
শেয়েছিল তাঁদের উপর। ২২ তারিখে বিরসা-শিষ্যদের সন্তাষা
আজ্ঞাপনের হুক/প্রায় সোমসতা, ডেনা, রাইফুল, কলিবিয়াতে
অনুসন্ধান চালান হয়। ২৬ তারিখে বারিশীঘের থেকে ধবর
পেয়ে জেলিনারের টিকা মৃত্যু, কেলিনার এক মৃত্যু ও তামুরার
মলকু মৃত্যুতে প্রেরণ করা হয়। কিছু কিছু মৃত্যু পুরস্কারের
লাভে বিরসার শিষ্যদের ঘরিতে দিতে সাহায্য করে। ফেব্রুয়ারি
৩ তারিখে সাত্ভাবার পশ্চিমবঙ্গের জল থেকে সিংড়নের ডি
সি এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে গভীর রাতে মৃত্যু
অবস্থার বিরসাকে প্রেরণ করেন। বিরসা অস্ত্রপ্রাণে সুসজ্জিত
থাকলেও সেন্স প্রয়োণের ফেন সুযোগ পাননি। দীর্ঘদিন তাঁকে
বন্দী করে রাখা হয় জেলে। একদিকে শরীরের প্রতি অবহেলা আর
অন্যদিকে অনুগামীদের জন্য দুশ্চিন্তা। তাঁর সাত্ভার ভরসসা
ভাঙ হয়। ২০ মে ১৮৫৭ থেকে ২-২০ মিনিটে তাঁকে জেলে যে
খাবার সেওয়া হয় তিনি তা গ্রহণ করেননি। ২-২০ মিনিটে অন্য
১৯জন বন্দীর সঙ্গে তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়। তখন তিনি
অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১ জুন জেলখানা থেকে জানানো হয় যে
বিরসা কলেশ্বর আশ্রয় হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য
ডাক্তার ডাকা হয়। ৭ জুন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। ৮ জুন
অবস্থার আবার অবনতি ঘটে। তিনি রক্ত পার্শ্বনা এবং বমি
করেন। ৯ জুন সকাল ১টার তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিরসা মৃত্যুর এই আন্দোলন, যাকে মূলত বলা যেতে
পারে একটা গণ-অভ্যুত্থান, তা এদেশে যতগুলি অবিভাসী
সম্প্রদায় হয়েছে সে-সবের মধ্যে উল্লিখ শতকরা একেবারে শেষ
পর্বের ঘটনা। ভারত ব্রিটিশের কাছে পরাজীত হয় ১৭৫৭
সালে পলাশীর আমবাগানে এক ছুড়ে বিহার, বাংলা ওড়িশার
ভার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।
ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। এই পরাজীততার একশো
বছর পরে ১৮৫৭ সালে সারা ভারত জুড়ে সংগঠিত হয়
সিপাহি বিদ্রোহ। ঐতিহাসিকদের মতে সেটাই আমাদের প্রথম
স্বাধীনতার সংগ্রাম। কথটা কি ঠিক? হ্যাঁ, একদিক থেকে তো
ঠিকই বটে। কারণ সিপাহি বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষার ও
সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা এদেশের মানুষ। প্রাঙ্গর সমাজের
মানুষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সেটাই। যারা আর্থিক বিনিময়ে
সব থেকে দুর্বল, বাক্য শিক্ষার ও সংস্কৃতিতে সব থেকে গাছনে
তাঁরা এদেশের অবিভাসী মানুষ। বিদ্রোহের কথা, পরাজীততার

প্রাঙ্গর যন্ত্রণা প্রাঙ্গর সমাজের থেকে অনেক অনেক আগে
শুটিভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরাই। পরাজীততার প্রার
সমকাল থেকেই বলা যায় শুরু হয়েছিল অবিভাসীদের
স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৭৬০ থেকে ১৯৪৭ অবধি কম করে
৫২টি অবিভাসী বলবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। ঐতিহাসিকদের চোখে অখ্যাত হয়ে থাকা
সে ইতিহাস অনেক দিন থেকে স্তব্ধ। স্বাধীন ও বরগীষ
অবিভাসী সংগ্রামের বিখ্যাত হয়ে থাকা করেকটি হল
১৭৭৪-এ ছোটনাগপুরের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পাহাড়িয়াদের
আন্দোলন, ১৭৮৪-৮৫-এ ময়ূরভট্ট কোল বিদ্রোহ, ১৭৮৯ ও
১৭৯৪-৯৫-এ ছোটনাগপুরে তমার আন্দোলন, ১৭৯৫-১৮০০-
এ বিহারের চোয়াল বিদ্রোহ, ১৮০০-এ অস্ত্রের পূর্ব গোদাবরীতে
কোতা বিদ্রোহ, ১৮০২-২৮-এ ওড়িশা কোল বিদ্রোহ, ১৮২৮-
এ আসমে বাসিয়ারের আন্দোলন এবং তিরাত সিং-এর নেতৃত্বে
ব্রিটিশ সেনাবাহক ও তার সহকারী ব্রিটিশ শিষ্যদের পনহত্যা,
১৮৩১-৩২-এ বিহারে কোল বিদ্রোহ, ১৮২০, '৩২, '৩৭-এ
বিহারে মুতা আন্দোলন, ১৮৩২-৩৩-এ বিহারে ডাগীরথ
ওরগার নেতৃত্বে খেড়ওয়ার আন্দোলন। ১৮৩৮-এ ওড়িশা
নারক বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৭-এ বংলা বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ,
১৮৬০-এ ব্রিটিশের উপর আসামের লুসাইদের আক্রমণ ও
১৮৬ জন ব্রিটিশকে হত্যা, ১৮৬৭-৭০-এ ফনদয়ে সাঁওতাল
বিদ্রোহ, ১৮৭৯-এ নাগা বিদ্রোহ, ১৮৮০-এ ওড়িশার
মালকানগিরির করা আন্দোলন, ১৮৮০-এ আন্দামানে সেটিংল
বিদ্রোহ, ১৮৮৫-এ বিরসা মৃত্যুর স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৯১৩,
'১৪, '২০-২১-এ বিহারে টালা ভগ্ন আন্দোলন ও ১৯২৫-
৪৭-এ দীর্ঘকালব্যাপী মধ্যভারতের অবিভাসী আন্দোলন। ছোট
করে রাখা মানুষের বড় করে ডাবনা প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিটি
আন্দোলনের মধ্যে। ঐতিহাসিকেরা এইসব আন্দোলনের
ইতিহাস বিবৃত করে লিপিবদ্ধ করার জন্যে প্রাঙ্গী ফানি।
কখনো-সখনো এখানে-ওখানে সাহায্য আয়োজিত হয়েছে।
এইসব আন্দোলনের ইতিহাস পুঁজিতে গিয়ে সাহায্য নিতে হয়
'হিষ্ট্র-কলচরাল আনপ্রোগলজিষ্ট'। আসলে নৃতাত্ত্বিক ভেদ-
বেষম্যের জ্ঞানে সমাজের এই মানুষকেই সঙ্গে এদেশের প্রাঙ্গর
সমাজের মানুষের যোগসূত্র বুঝি দুলে। তাঁদের জাখনাচিয়ার
জ্ঞাতাটা তাই অনন্তকাল থেকে যায় প্রাঙ্গর সমাজের
বরাহেয়্যায় বাঁধে।

ঐতিহাসিক কলীকিষ্ঠর দশ সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রার
শতবর্ষ পরে শুরু করেছিলেন তার ইতিহাস লিখতে। 'দি
সাঁওতাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭-এর ভূমিকার তিনি
বীকার করেছেন যে ব্রিটিশ সরকারের অকিস-আদালতের
বিভিন্ন মন্তরে রক্তিত রেকর্ডের উপর নির্ভর করে তাঁকে লিখতে
হয়েছে এ ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর বং
গ্রাম সংগৃহীত নথি-পত্র পৃথকভাবে প্রকাশ করে অনেক অজানা
জাতব্য বিবরণ পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

সিগাথী বিরোধের ইতিহাস নবীন প্রজন্মেরও অশ্রুক্ষেপই জানার সুযোগ হয়েছে। কারণ পাঠ্যসিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে ইতিহাস। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় হল এটি যে সীতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল সিগাথী বিরোধেরও দুবছর আগে। সীতাল বিদ্রোহ তদানীন্তন বাংলা ও বিহারের ব্রিটিশ সরকারকে যে কি পরিমাণ ব্যতিব্যস্ত করেছিল তা সে সময়কার দুবছর ডেপুটি কমিশনারের প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে বোঝা যায়। ওই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল আগস্ট ১৭, ১৯৫৫এল. রাজা বিরোধে কব্র করিয়া অরসেন লুট ও উদ্ধার করিতেছে—আর সৈন্যের সহিত আপত্তি করিতেছে—উদ্ভাষণের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে আপনাদিগের দুর্বুদ্ধি ও দুর্ভর্য জান করিয়া মার্জনা ও পূর্বকার অবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইত্যাদির স্বেচ্ছা বাইতেরে যে গভর্নমেন্ট সর্বথা আপনায় প্রকার সুখ—তাহারা স্বদেশোক্তের পরামর্শে ভূখণ্ডগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তি জাহায্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকার কিংবা কোন পুন করিতে প্রাধান্যরূপে অধিক থাকা প্রকার ইহাবৎ তথিতিরিত্ত সকল সীতালগলা জাহায্য ১০ বিবসের মধ্যে কোন হাকিমের সম্বন্ধে হাকির ইয়াত আজাবাবী ইহবেক তাহাদিগের সেনা মার্জনা করা জাইবেক—অন্য তাহাদের আজাবাবীভুক্ত প্রকাশ ইহাবে তখন তাহাত নালিশ সীতালগলাগিরের বাহ্য প্রমাণযোগ্য তাহা সুখর রূপে তদারক করা বাইবেক কিন্তু যদিও সকল রাজ্যপ্রার্থী এই ইত্যাদির জারির পর বিপরিত্ত আচরণ করে তাহার সন্ত ও নিদারশ সাজা পাইবেক। সীতালগলা নেতৃত্বে সীতালগলা পরগনা যে সেদিন কৈশে উঠিছিল এবং ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা যে ভরে শিনাহারা হয়েছিলেন উপরোক্ত নথিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ ভারতীয়দের উপর অভ্যাসের করেছিলেন মূলত ভারতীয়দের সহায়তার। সীতালগলাদের কাছে এই আশ্বাসের লক্ষ্য শুধু সাধা চামড়ার মানুষ ছিলেন না, তাঁদের অক্রমের লক্ষ্যমূলে দেশীর সিকুয়াও ছিলেন। একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায় দেশীয় সিকুয়ের বেশ কিছু নাম। সীতালগলা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে দেশীর সিকুয়ের নিহত হয়ে হয়েছিল অনেককেই। মহেশলাল গুপ্ত (দ্বিধা থানার দারোগা), মুন্সী (ঐ থানার বরকন্দাশ), মেধু (ঐ থানার বরকন্দাশ), প্রভাণ নারায়ণ (কুমুদুরি থানার দারোগা) প্রভৃতি সরকারি বেতনভুক্ত কর্মীদের। মহেশলাল গুপ্ত নিহত হলে তাঁর বিধবা পত্নী দুটি নাবালিকা কন্যা নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। বাহীর অকল সন্তান পর সরকারের কাছে গ্রাহ্যিটি/কতিপুংস দাখি করেছিলেন। তদানীন্তন গভর্ন ডেপুটি কমিশনার মহেশ লাল গুপ্তের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট বিবেচনায় যে তাঁর পরিবার কোনপ্রকার আর্থিক অনটনে নেই। অভ্যাবস্থার নিরাপত্তা বিভাগের থেকে রিপোর্ট প্রেরিত হয়েছিল অর্থ গুপ্তের। রিপোর্টে তাঁদের হুঁমারের বেতন ছিল ১২ টাকা ৮ আনা। আর

বরকন্দাশের মাসিক বেতন ছিল মাসিক ৩ টাকা। এবং তাঁরা সেই মতন গ্রাহ্যিটি পেয়েছিলেন। সীতালগলা বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন সিনু আর কনু। এই গণ-অভ্যুত্থানে সিনু, কনু, ঠান ও ভৈরব চার ভাই-ই বিদ্রোহ বিবেচনায় প্রাণ। গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল ভাগনাইতির মাঠে খুন. ৩০, ১৮৫৫ সালে। এক বিশাল জনতার সামনে শোকাবহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সেদিন ভাঙ্গল বিবেচনায় সিনু আর কনু।

সেভেন বছর আগের সিনু-কনু-ঠান-ভৈরবের সেই শোকাবহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আজও কি বাস্তবায়িত হয়েছে তারতে ৭ এ বিষয়ে অনুশূন্য সম্ভাবন প্রয়োজন। প্রয়োজন সঠিক বিচার ও বিশ্লেষণের। সেই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য আত্ম কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি। জরুরি সঠিক কারণ নির্ধারণ। প্রাসংগিকভাবে বিদ্যাসাগরের পুত্রিকাসির উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথ একবার বিদ্যাসাগরের পুত্রিকাসির উল্লেখ করেছেন এইভাবে—আমরা আরও করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; বাহ্য অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; বাহ্য বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ছুরি পরিমাণ রক্তনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কর্মক্ষেত্রে পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুকরণে আমাদের সম্মান; পরের চক্ষে মূল্য নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিবেশ বাক্যভূত্বের নিজেদের প্রতি ভক্তি বিহীন ইয়াত ওঠাই আমাদের জীবনে প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হবরহীন, কর্মহীন, দাত্তিক, তাত্তিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক প্রবল বিচার ছিল। আমরা যদি শোকাবহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হয়ে থাকি বাহ্য করি তার মূলে আমাদের চরিত্রের এই সৌচবহীনতা।

পরিশোধ বসি, পোনে দুশো বছর পরাবীন থাকার পর আমরা বাবীন হয়েছি, মুক্তি পেয়েছে ব্রিটিশ শাসনের নাগণশাস থেকে। ব্রিটিশ পরাবীন ভারতে যদি বার বার অসিদ্ধাশনের গণ-অভ্যুত্থান না ঘটত, তাহলে আমাদের যে সাহস ও কতকগুল পরাবীন থাকতে হত তা নির্ণর. করা একেবারেই অসম্ভব। ভারতের বাবীনতা সম্রাটের অসিদ্ধাশনের গণ-আশ্বাসের উচ্ছল অবদান নিভাকালের এক বিবিত ঘটনা। তাকে অসীকার করার অর্থই হল ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ইতিহাস গ্রন্থ—সীতাল গা সত্যের ইতিহাস
২. কবিবির ভা—সীতাল ইতিহাসকন অব ১৯৫৫-৫৭
৩. পত্রিকা পত্রিকা—সীতালগলা বিদ্রোহ সত্য (১৯০১)
৪. সত্যল গা—আমাদের দৃষ্ট বিচার ও পরবর্তী সত্য
৫. অসম্ভব বর্ধ—বিদ্রোহ মূল ও তার সত্য (১৯৮৮)
৬. প্রবাসকৃত্যে কৈতিল—দুই বৈদ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র / ২০০০
৭. অসম্ভব বিচার—সিদ্ধি পরিচয়ের নিবন্ধন / ১৯৯২
৮. —ই— —সিদ্ধি পরিচয়ের নিবন্ধন / ১৯৮৮

ছড়ায় তত্ত্ব, ছড়ায় সত্য

অনিল সরকার

দিগ্লির বিস্ফোরণ

একা রায়ে
রক্ষা নাই
লক্ষণ ঘোমর।
ওয়েস্ট অ্যান্ড
ওয়েস্ট ল্যান্ড
বিকার্য ধূসর ॥

দলপতি
শ্রীলক্ষণ
মারা গেলে কিলে।
'কারে আকমু
প্রাণের তাই
লক্ষণ মরিলে' ॥

রাম কামেন
সীতা কামেন
কামে হুমান।
সোনার হাতে
সোনার কাকন
বিগ্নি কম্পমান ॥

সেনা দল
কেনা দল
কেনা বেচার ফলে।
প্রতিরকার
মাখন চুরি
গোপাল সোসেন কোলে ॥

ওয়েস্ট অ্যান্ড
ওয়েস্ট ল্যান্ড
হাটি হল বহুয়া।
রাতের জন্য
চন্দ্র তারা
দিনের জন্য সজ্জা ॥

জরজরবু
জীহব কানু
লিখেন পদভাগ।
কে দেখেছে
মুই খেয়েছি
কোটি টাকার ভাগ ?

মেহা ভারত
মহান ভারত
এখন কেলেভারি।
মাথার টিকি
ভালে তিলক
চলছে দলের গাড়ি ॥

নিশি বোতল
বিদিলিতি মন
মুক্ত স্বাক্ষর নীতি।
পক্ষতারা
অঙ্ককার
আলো ছায়া গীতি ॥

চোখে রাজার
গাঢ় মায়া
বুকের ভিতর ছায়া।
ছায়ায় মনো
লুকিয়ে আছে
গোষ্ঠী রাজার কায়ো ॥

ঢাকা ছিল
খণ্ড ব্যাধি
বস্ত্রে সঞ্চেপ সাধা
গুণে ক্রিকে
পড়ল ধরা
রাশীর মেলে কাবা ॥

পদজ্ঞানি
যার যে শোনা

শবদ্যায়ার শোকে।
পতনকালে
শোক চিহ্ন
জন্মা দেবীর বুকে ॥

প্রধানমন্ত্রী
কথা সেখেন
এসব কথা মিছা।
টার ললাটে
কামড়ে মিল
মন্ত বড় বিছা ॥

বোফস কাণ্ড
লণ্ডনত
কালিমা ছালি।
দিগ্লি নড়ে
ধরো ধরো
তহলকা দিল কালি ॥

মুদ্র অবিরত

মনে পড়ে মিনতুলি
রক্তে ভাসা গ্রাণগুলি
ধ্বিভা বোন নিহত মা
শিকল খেঁদী—রক্ত জমা।
হাজার লগ্নে পহিন মিনার
রক্তে ডেজা লাক ডিনার
নার্গিস বনে সরীসৃপ
ঘাতকতত্ত্ব নিভালো দীপ ॥
মনে আছে—
সাতের বশক ?
রক্তজমা ঘাসে ঘাসে
ঘাসের ভগ্নায় বুড়ো শিব
কৈর্যচারীর রক্ত জিত

এখানে লাশ ওখানে লাশ
শবের গন্ধে দূষিত শ্বাস
কৃদ্ধ আকাশ বাতাস রুদ্ধ
বেঁচে থাকা শেষের মুদ্র
শরণ কর ধর্মী আসে
পাঁশকুড়া ও গড়বেতার
সর্বনাশে ॥
আবার সুখ শূন্য বুকে
শূন্য বুকে পাখির শোক;
শরণ কর সেখিন তারা
বিচার কর আজকে তারা
সেই লোকটি বারিস্টার
বুদ্ধ বাঘ বাঁতে ঘাস—
ওপের ভিতর একটি গুণ
সুযোগ এলে কমিউনিস্ট পুন।
শরণ করন করণ রাত
আধা ক্যালিস্ট শূনীর হাত।
খোড়ায় চড়ে বুলবুলি
খেয়ে ঘাবে বানতুলি
রক্তস্রোত;
এবার করব প্রতিহত
করতে হবে বাঁচতে হবে
বাঁচার জন্য লড়তে হবে
নতুন বাংলা গড়তে হবে
তাই মুদ্র অবিরত ॥



শিবনাথের কথা

বাসুদেব দাস

সেদিনটির কথা আজও ভুলতে পারিনি শিবনাথ। চোখ বুজলেই চোখের সামনে আজও শিবনাথের জিহ্বার বয়সের খটখটাতর মুখটা ভেসে ওঠে। যে ভ্রমের উপরে মানুষের নিজস্ব কোনো দ্বন্দ্ব নেই তার জন্যও যে সমাজে সে লালিত হতে পারে এ যৌথতা তখনও শিবনাথের হয়নি। তাই আঘাতটা সেদিন এত মর্মান্তিক হয়ে তার অন্তরে বেজেছিল।

শিবনাথ তখন কলকাতা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিকে বাচার লড়াই অপরদিকে পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ এই দুয়ের টানাপোড়েনে তার জীবন তখন কতবিকৃত। গ্রামের দলিত সমাজ থেকে উঠে আসা শিবনাথ স্বপ্ন দেখেছিল বড় হবার। শুধুমাত্র দশটা পাঠটা কেরানিগিরির গ্রন্থিকর জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল সে। শিবনাথ চেয়েছিল সারা জীবন অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকতে কিন্তু তাঁর স্বপ্ন এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ছিটকির বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সদ্য পিউইচীন শিবনাথকে উপদেষ্টাদানের জন্য পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে সীতামতী প্রভিডেন্সিয়া গুরু হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের কয়েকজন হিতৈষী বাড়ি বসে এসে বলে যায় “অর্থেষ্ট হবারে, তোমানের সমাজে এর চেয়ে বেশি পড়াশোনা করলে শেষে বলহীন হয়ে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হবে। সময় বুঝে এখনই কোনো ম্যাড্যচারি গসিটে ঢুকে বাও, মাসিকের সুবন্ধের পড়লে একটা ব্যবসা হলেও হয়ে যেতে পারে।” হিতৈষীদের মধ্যে একজনের ছেলের জন্য ডিনটে প্রাইভেট টিউটর রাখা সত্ত্বেও ছেলেরি গ্রাম সব বিষয়ে খারাপ করেছে। তাই শিবনাথের এই সাক্ষাৎকে যদি তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতেন না পারেন তাতে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না তাকে। বেলাড়া শিবনাথ হিতৈষীদের সপুঙ্খপূর্ণ জন না নিয়ে শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে ভর্তি হয়ে এল।

দুই পরিবারের ছেলে শিবনাথ কলেজের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের এড়িয়ে চলে। অর্থের যেমন ঘোর নেই তেমনই সামাজিক অবস্থানও উচ্চকরবিত একবারে নীচের দিকে। এ নেত তাত্রই অপরাধ। এই অপরাধবোধই তাকে ব্যথ করে আর সবার দ্বৈষাভ্য বর্ষিতের চলাতে। তবুও নিঃস্বের অজ্ঞাতই ক্রমের

একটি ছেলের সঙ্গে কখন যেন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের ছেলেরি সঙ্গে মেলায় জড়তা থাকলেও ছেলেরি আন্তরিকতায় দ্বারে দ্বারে শিবনাথ অনেকটাই সহন হয়ে আসে। এখানেই শিবনাথের ভুল হয়েছিল। যে দেশের ধর্মপ্রচার নির্দেশ থাকে ভারতের সুবানে একপ্রকার মানুষকে কুসূর-বেড়ালের চরেও হীন জ্ঞান করার, সে দেশে ভ্রমে শিবনাথের আরও একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল বইনি।

এবার সেদিনটির প্রসঙ্গ আসি যা শিবনাথের জীবনে চরমতম অবনমনার সূত্র হিসেবে আজও লক্ষণে ঘরের মতো তাকে পীড়া দেয়। বন্ধুটি শিবনাথকে জলের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে। ইতিমধ্যে শিবনাথ বন্ধুর বাড়িতে কয়েকবার দুখে এসেছে, দুখনে মিলে আসর পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রসারবলীও আলোচনা করেছে। প্রথমে নিমন্ত্রণি হলেও তাই সে নিমন্ত্রণে গিয়ে যায়। একটু সকাল সকালই শিবনাথ বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে যায়। দু-বন্ধু মিলে গর-ওজবে মশগুল হয়ে থাকার কখন খাবার সময় হয়ে এসেছে তা টেরও পারনি। চমক ভাতে বন্ধুর বিদ্রিণ ডাকে। দুখনে মিলে খাবারে বসবে। এমন সময় বন্ধুটি ইতস্তত করে শিবনাথকে বলে শিবনাথ, তুমি তো জান, আমরা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ তাই খাবার পর তোমাকে খালাস দ্যুয়ে দিতে হবে। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত আঘাতে শিবনাথ গুঁজ হয়ে যায়। কেউ যে বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে এভাবে ভারতের পোহাই নিয়ে অপমান করতে পারে তা শিবনাথের জানা ছিল না। চোখ ফেটে জল আসতে চাইলেও এক মর্মান্তিক ক্রোড়ে সমস্ত বিশ্বসংসারটাকে তখনই করে ফেলতে চায় সে। কিন্তু তার এই মর্মান্তিক কোথ বইয়ের প্রকাশ পায় না। সমস্ত অন্তরটা ছুঁলেপুড়ে থাক হয়ে যায় তার। প্রতিজ্ঞা করে একদিন না একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এ অপমানের সমুচিত জ্ঞাপ দিতে হবে।

এরপর কটে যায় কয়েক বছর। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গতি অন্তিম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল আসিনার এসে পৌঁছায় শিবনাথ। ক্রমের ঝঁক ঝঁক ফিকে চলে যায় লাহিপ্রতিষ্ঠে। অপরিণীম বিশ্ব নিয়ে তাকিয়ে থাকে বইয়ের ডাকগুলির দিকে। পড়তে পড়তে সময়ের খেয়াল থাকে না তার। কিছুকালের মধ্যেই

কুশা-কুশা ভুলে যায়, ভুলে যায় কেয়ার পথে চাল না নিয়ে গেলে
 রাস্তার আহার জুটবে না। শিবনাথ তখন 'পাথের পাঁচালির'
 অপূর্ণ সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গ্রাম ও কুমহাণ্ডের
 পাটালার সেই অপরূপ প্রতিফলিত—এই সেই জনহীন মধ্যবর্তী
 প্রবাস গিরি। ইন্ডার শিবরমেশ আকাশ পথে সন্তত সঙ্গীর
 সঙ্গারমাণ জলধরপটল সযোগে নিরন্তর নির্বিড় নিলীয়মান
 অলঙ্কৃত...ওনে অপূর্ণ মুখতা শিবনাথের শিরায় শিরায়
 সঞ্চারিত হয়। কখনও বা শিবনাথের মন অপূর্ণ সঙ্গে কুটির মাঠে
 মীলকর্ষ পাখি দেখতে যায়, কখনও বা সোনাজান্ন মাঠের ব্যস্ত
 পায়-হরে ধলকিড়ের খেলাঘরে পৌঁছে যায়। হরিহরের মৃত্যুতে
 অকস্মে শিউড়ী শিবনাথেরও অপূর্ণ মতো মনে হয়—তার
 একান্ত নির্ভরতার পাশ্চ হ্যাসিমুখ যাবা কোথায় যবে যেন উদাস
 পূরবার সুখে আশীর্বল গান করে চলেছে।—

কসে বর্ষভূ পঞ্চম্নে নশ্যশালিনী
 লোকায় লোকাসেন্ত নিরাধার:....

এভাবেই শিবনাথের জীবনে দারিদ্র্যের নিম্পেষণ বহু
 ব্যভূতে থাকে, ততই সে বইয়ের জগৎটাকে আঁকড়ে ধরে। এমন
 সময় একটা বড় কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাবপ্রাপ্ত ডাক
 আসে শিবনাথের কাছে। এক প্রচণ্ড গো-টানার মধ্যে পড়ে
 শিবনাথ মানসিক যন্ত্রণার ক্রান্ত-বিক্রান্ত হতে থাকে। একদিকে তার
 আত্মবিশ্বাসের ব্যর্থ ও সাধনা, অন্যদিকে যেটা যেটা ভাইবোনদের
 মুখে আসে ভুলে নেবার সুখের সুযোগ। শেষ পর্যন্ত শেষেরটাই জয়ী
 হয়। চেষ্টার সামনে থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে মানসিক
 কোম্পাণ্যার, এমনকি তারই মতো দলিত অর্থ সাহিত্যরসী
 তারালকর, বিদ্বত্তিত্বশ্রমের জগৎ। যে শিবনাথ সিনেমা পর দিন
 বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপারে বসে অপূর্ণ মানসসঙ্গী হয়ে সুদূর অমর
 কষ্টক থেকে মেসোপটেমিয়ার ঘুরে বেড়াত। আজ তাকেই মার্চেন্ট
 ব্যাঙ্ক, কলকাতা কলেজি সোনের উপর নিত্য নতুন নোট পড়তে
 হয়। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে কলকাতা জীবনের সেই মর্যাদিক
 ঘটনাটি। মুকুতে পারে এটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধর্মের
 বোঝাই দিয়ে, জ্ঞানপাঠের সোহাই দিয়ে লভ লভ বছর ধরে চলে
 আসছে আমাদের সমাজে এই অবমাননাকর সামাজিক বৈষম্য।
 তাই বাহ্যিকভাবে আবেশকরের মতো মহামানবও এই আভিভেদ
 প্রচার বহুদিক্ত কথাব্যত থেকে রেহাই পাননি। সে তো কোন
 দ্বন্দ্ব।

শিবনাথ তার পুরনো দিনগুলিকে আজও ভুলে যায়নি।
 সময় এবং সুযোগ একেই চলে যায় পুরনো এলাকাতে বৈশাখের
 হুলোবলিত্তে ছিল রয়েছে তার রক্তমাত কৈশোরের দিনগুলি।
 পুরনো হিতৈষীদের অনেকেই শিবনাথকে সহজভাবে মনে নিতে
 পারে না। ওদের মনোভাব অনেকটা যেন শিবনাথ আগের মতো
 অবস্থায় থাকলেই ভাল ছিল। শিবনাথের অবস্থার সুযোগ নিয়ে
 হয় সহানুভূতি জানানোর মধ্যে এক ধরনের জাঙ্কল সুখ ভোগের
 খেলা থেকে এভাবে বঞ্চিত হওয়ার উচ্চবর্বের ওখাকবিত্ত
 হিতৈষীরা শিবনাথের উপর মনে মনে চটে যায়। মনে হতে থাকে
 শিবনাথ যেন অন্যায়ভাবে ওদের উপর টোকা দিয়ে গেল।

মাঝে মাঝেই 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' স্মৃতি শিবনাথকে উদ্মন করে
 তোলে। ছুটে যায় পুরনো অধ্যাপকের বাড়ি ও লাইব্রেরিতে।
 সেখানেও কেমন যেন মনে হয় সুর কেটে গেছে। মনে অতিমান
 মনে ওঠে। যেখানে শিবনাথের ছিল একাধিপত্য আজ সেখানে
 নতুন ছাত্রছাত্রী এসে জায়গা করে নিয়েছে। কালের এই অমোঘ
 নিয়মকে স্বাভাবিক জেনেও শিবনাথ কিছুতেই তা মেনে নিতে
 পারে না। এই অকৃত মানসিকতা থেকে মুক্তি লাভের আশার
 শিবনাথ আবার বইয়ের সমুদ্রে ডুব দেয়। দীর্ঘকাল ধরে হারিয়ে
 যাওয়া এক অংশটি পৃথিবী পুনরায় চোখের সামনে রূপ লাভ
 করে। হাতে আসে নিকোলাই অগ্রেডফির 'ইম্পাল্ট'। বইটির কিছু
 পরক্তি শিবনাথের জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দেয়—“জীবন মানুষের
 সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একটবার। তাই
 এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন
 জীবনযাপন করার ব্যস্তাভ্যাস অনুশোচনার ভুগতে না হয়.....
 এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যু মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে,
 আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার
 সবচেয়ে বড় আদর্শের জন্য।”

শিবনাথ হাতে কলম ভুলে নেয়। তর তর করে এগিয়ে যায়
 তার লেখনি। ফুটে ওঠে তাদের ব্যাভাত্তা জীবনের কাহিনী, যারা
 বিদ্যা, বুদ্ধি ও মেধার সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র তথাকথিত
 নিচু বংশে জন্মানোর অপরাধে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে
 বঞ্চিত। বহু বংশে শিবনাথ, এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ছুরেছে—
 সেখানে বহু বহুকে নিমন্ত্রণ করে জ্ঞানের সোহাই দিয়ে অপমান
 করে না, বলে না তোমরা ব্রাহ্ম, তোমরা হীন অজ্ঞাত তাই
 তোমাদের সঙ্গে একাসনে জ্ঞানের শাস্ত্রের অনুশাসনে নিষিদ্ধ। দিন
 আগত ওই।

ভারতের নির্যাতিত শ্রেণী কখনো উচ্চবর্ণের মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে
 হবে। নিজস্বের স্বাধীনতা, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে নিজস্বেরকে সৈন্য দশা থেকে মুক্ত করতে হবে। অন্যথায়
 আমাদের কেউ দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে না।

—ডঃ বি আর আশ্বকর

‘কামতাপুরী’ ভাষার জন্য আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক কথা

নীতীন বিশ্বাস

সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ‘কামতাপুরী’ আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। রাজ্যের মালা, জলপাইগুড়ি, দারিলাং (সমতল), কোচবিহার, উত্তর-পশ্চিম দিনাজপুর জেলাগুলিতে এর বিস্তার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালিত এ আন্দোলনের বর্তমান প্রধান বর্ণকী তার ভাষায়। ‘কামতাপুরী’ ভাষার স্বতন্ত্র এ আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের প্রকাশ্যে প্রধান বোঝা। তাঁরা পাবি করেন এ ভাষা বাংলা ভাষার চেয়েও প্রাচীন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার জননীরাপা। এই ভাষা ও তাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি তার মুক্তি চান তারা। তাই তাঁদের অসামান্য রাজ্য প্রয়োজন। তা নিয়ে দু-চার কথা।

উপরিউক্ত ভাষাগুলি ও তার সহস্র জ্বাৰ: অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার না চুকলেও আমরা যদি ভাষা হিসেবে ‘কামতাপুরী’ প্রসঙ্গে আলোচনার বাই, তাহলে সহজে যে সিদ্ধান্তে যেতে পারি সে হল ‘কামতাপুরী’ বাংলা ভাষার একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক মতে বি-ভাষা। তার উচ্চারণও বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তাই প্রমাণ করে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ব্যবহৃত ভাষা, বাক ‘কামতাপুরী’-ভাষা বলে প্রচার করা হচ্ছে, আসলে তা বাংলার কমনওয়েল্‌থ উপভাষার একটি রূপ। এ ব্যাপারে বিতর্ক গবেষণা করেছেন রবীন্দ্রভাষ্যী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মল দাস।

তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, “...উত্তরবঙ্গের কিছু সাম্প্রদায়িক রাজ্যপ্রবণ মানুষ নিজস্ব আত্মপ্রাণে ঘেঁষেই এই উপভাষাকে অসামান্য ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং নজির হিসেবে গ্লিয়ারসনকে ভালো করে অধ্যয়ন না করেই তাঁকে কিংবদন্তীর মত নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন। এটা বিজ্ঞাতিকর হলেও তবুটা বিপজ্জনক নয়। কিন্তু সংস্কৃতি উত্তরবঙ্গের কোনও কোনও এলাকায় উপভাষাকে উপভাষা হিসেবে স্বীকার না করে বাংলা থেকে অসামান্য একটি ভাষা বলে দাবি করার সংগঠিত প্রকল্পের কথা শেনা যাচ্ছে এবং বংগের কাগজেও বেরিয়েছে ১৯৮১-র জনগণসভার সময় বেশ কিছু বাংলাভাষী লোক নিজস্বের মাড়ভাষা বাংলা না বলে ‘কামতাপুরী’ বলে নথিভুক্ত করতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে ‘রাজবংশী’ওরালদের মতো নিজস্ব বীরী সাম্প্রদায়িক রাজ্যনির্ভর নয়, এবং এর পেছনে ভিত্তির অন্তত প্রয়োজন থাকতে অসম্ভব নয়। এককিৎ দিয়ে ‘রাজবংশী’ওরাল ও ‘কামতাপুরী’ওরালদের বক্তব্যের মধ্যে ঐক্য আছে।”

রাজনীতির প্রশ্ন: গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০০ কলকাতার জীবনদশ হলো আকাশউর্দীন ‘মরণ সমিতি আয়োজিত সেমিনারের বিষয় ছিল “উত্তরবঙ্গের পরিচিতি ও আমাদের দায়বদ্ধতা।” সভাপতি ছিলেন পরিতোষ বসু (লেখক ও গবেষক)। উদ্বোধক মন্ত্রী দীনেশ জাকুরা। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী যোগেশ বর্মা, বিজয় বর্মা, ড. সুখবিসাল বর্মা, মীলকর্মে সেনগুপ্ত (স্টা ও নটিকায়া), ড. পবিত্র সরকার, সাহিত্যিক অনুর চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সেন (যশোর), রত্না সোম (মণ্ডল) প্রমূখ। ওখানে মন্ত্রী দীনেশ জাকুরা দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর আলোচনায় হিতসাবধী সভার যুগ থেকে ত্রেতাগা আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট, পঞ্চায়েতরাজ, নানান্তরনের সংরক্ষণ ও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বামফ্রন্টের উদ্যোগের কথা বলেন।

পাশাপাশি তিনি সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেন রাজবংশী সম্ভার তথা দলিত পদচারণা অংশের অগ্রগমনের প্রসঙ্গ। এবং যেখানে ভূমিপুত্রের প্রশ্ন সামনে আসছে কামতাপুরীরা তার জ্বাৰে তিনি বৃদ্ধতার সঙ্গে বলেন, বিভিন্ন সময়ে তাঁরা সীমান্তবর্তী বনা জেলায় এসেও অনেককালে অভ্যন্তরস্থ এলাকাত্তেও বসতি স্থাপন করেছেন। এ ছাড়া পূর্বভারতের নানা রাজ্য থেকে ‘বাজলি খেদ’ আন্দোলনের বলি হয়েও অনেকে উত্তরবঙ্গে অবস্থান করতে বাধ্য হয়ে বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁরা আর আমাদের মতই সমানভাবে ভারতের নাগরিক ও সুখ-সুখের ভাগীদার। সুখ-সুখ নিয়ে তাঁরা এসেই থাকবেন। তাঁরা চলে যাবেন এবং সমগ্র চাকরি বাকরি রাজবংশীরা পাবেন বলে যে জাতীয়, অসামান্যিক ও অসামান্যিক হস্ত বিচ্ছিন্নভাবালী নেভারা আত্ম সারসম্মতি বিস্তার সুবক্ষের সামনে তুলে ধরছেন, তারা নিঃস্বারাও জানেন তা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক জগতে নিজস্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সব জেনেওনেও তাঁরা বিজ্ঞাতি ছড়িয়ে চলছেন।

স্রীভাকুরা তাঁর ভাষণ শেষ করেন এভাবে, “কামতাপুরী বিচ্ছিন্নভাবালী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এককলসের, উত্তরবঙ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা। আর সুযোগ বুঝে ধর্মিয়ারা মহাজনীভাষা জেগেদার মহাজনরা আত্ম সঙ্গত জুড়িয়ে চলছে এই বিচ্ছিন্নভাবালীসের। মনে আসা যদি অসামান্য রাজ্য হয়, বামফ্রন্ট যদি কমজার না থাকে তবে, তাঁরা হারানো জমি আবার ফিরে পাবে।”

বনীর স্বার্থপরকারী এই রাজনীতির প্রতীক প্রদান, ভাবাশ্রয় নয়। তার প্রমাণ মেলে এই আন্দোলন প্রসঙ্গে কিছু বাঙালি নবনী নেত্রের কথাবার্তার। সত্যিই ত্রীপ্রবরজন দাম্পত্যী এই আন্দোলনকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন। এছাড়া বঙ্গল পাকিস্তান ব্যাড়া প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বেলমন্ত্রী শ্রীমতী যমতা বানান্দী তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেছেন এই বাঙালি (ভাটিয়া) তাকানোর আন্দোলনের প্রতি। অন্যদিকে অতুল সার যিনি কামতাপুরীঃ মণ্ডিঃ বাল দ্যত তিনি একটি সাক্ষাৎকারে (প্রতিদিন ৩০.৮.২০০০) জানিয়েছেন যে “মমতা বনোপাগার আমদের দাবির প্রতি সহনবৃত্তিসীল। যে ভক্তমহিলা আমাদের পক্ষের কাটা হয়ে নেই তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকটাই তো স্বাভাবিক। তুণদুল কংসের সঙ্গে আমাদের জেলা কর্তারে আলোচনা হয়েছে। ওরা বলেছে সি পি এম হঠাৎ বাংলা কাটাও। আমরাও তাই কাটা। এই পরিণতিতে ঐক্যেত ইংরাজি তো স্বাভাবিক।”

সমাজবাদী যুক্তমতঃ উত্তরে কামতা দক্ষিণে মমতা সম্ভতি যথার্থই এ গ্রোণন তুলেছে। দক্ষিণে জোতদাররা এতদিন পরে দাস বা অনুর বা শূর বা দলিত বা দরিদ্রদের হত ভেতে দেবতা তথা বনী জোতদার, দক্ষিণে কৃপাদনা সামন্তপ্রভুদের অধিকার, ক্ষমতা ও ভূমির দখল পাইয়ে দেবার জন্য মহিষাসুরমর্দিনীঃ কাল এসেছেন। দক্ষিণে গরিব মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে, ভাড়াটে হয়ে বনীর হয়ে কাজ করতে গিয়ে গরিব গরিবকে খুন করল ও খুন হল। তারা তুল বুকে যখন তিরছে তখনই দাবি উঠছে ০২৫ বা ০৩৬ বারা প্ররোগের। আর উত্তরে গরিব হত্যার ভিত্তিতে রান ভাঙ্গা বা জাভাখাটীর নাম করে করা হচ্ছে। শুক হচ্ছে রাজবন্দী-ভাটিয়া দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ মমতাদি দক্ষিণে বলে বাঙালি প্রেম দেবোত্ত বনোপাগারের সব জল চোখে বারন করলেন—তিনিই আবার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে গিয়ে চোখের সব জল বরক করে ফেললেন। কারণ এরা বাঙালি ভাটিয়া-উরাক্সের তাক্তে বন্ধু হাতে দিতেছে—তিনি তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। সম্ভতি (২৮.১.২০০১) মমতাদেবী কামতাপুরী ভাবার বীকৃতির দাবিকে বীকার করে কেন্দ্রীয় বরাদ্দমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। এবং তাদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে বাংলা ভাঙ্গক সমর্থন করেছেন। বা’ বাঙালি জাতির প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা। রাজা ভরগের সমর্থনে নতুন লো ৩৮ করেছেন।

উত্তরবঙ্গে যে ভাটিয়ারা আছেন তারা আলাকরি এ মায়ার হলনা সহজে বুঝতে পারবেন। দক্ষিণবঙ্গে একটি সময় লাগবে। কারণ কেশপুরে এরাই সমাজবাদীদের এক্সট্রেমের রিপোর্ট সত্রেঃ করাকে দেশপ্রতিক কাজ বলে সাটিকিটে দিয়েছিলেন। আর কামতাপুরীঃ তাদের নবীন ভোমের অস্ত্রতালিম নিতে পারিয়ে দিলেন সমাজবাদীদের গোপন ভেড়ার ছুটান আর আগুনে।

মিল সবধিক খেইই আছে—কিন্তু খুন হচ্ছে কুলের শিকল। বকিত হচ্ছে গরিব ছাত্রীরা। ওরা স্বাস্থ্য নিয়ে

পড়াওয়ার পরিবেশ নষ্ট করে দিতে চায়। ধরবে করে দিতে চায় শান্তিপ্রিয় গরিব দলিত সংখ্যাগুরু মানুষের প্রেমপ্রীতিভরা ঐতিহ্যের মিলনের সুস্পর্ককে।

হাটনতার পরবর্তী সমাজবাদীরা ব্রহ্মপুর প্রোজেক্টসহ নানা হত্যাঘের যে ব্রুটিট করেছিল সে পথেই সেদিন ভেঙেছিল বৃত্তফট। ডাঙতে চাইছে বামফট। আর সে কাচ্ছে আর এগিয়ে এসেছেন কামতা ও মমতা। দাসে সামন্তবাদ আর পেছনে সমাজবাদ। ভাবার প্রশ্ন এখানে কইরের মুখোপ। বাঙালিকে শেষ করে দেবার চক্রান্তই এখানে খুঁচ। ছাতে, ভাতে, বাংলাভাগের সুকৌশলী পথে।

তবুও ভাষা প্রশ্নঃ এখানে ভাষাপ্রশ্ন তবুও আসছে এবং আসবে। কারণ উত্তরবঙ্গের এক বিরাট অংশের মানুষকে ভাষা-প্রশ্ন সংকুচিত প্রবে প্রার উন্নত করে তুলছে এককেন্দ্রীয় গবেষক ও পতিভারত। এমনকি যাত্রা সংরক্ষণ হয়ে প্রচণ্ড বিবেচন দিয়েমী ভূমিকা নিয়ে নিচ্ছেন নামে কলত লেপন করেছেন তারাই আবার রাজবন্দী/কামতাপুরী ভাবার লেখা শীতার ভূমিকা নিয়ে বিখ্যাত হতে পেছনা হন না। অন্যদিকে দলিতপ্রমে দারা উন্নত তারাই আবার কামতাপুরী প্রশ্নে, ভূমিপুত্র প্রশ্নে তফসিলি জাতি-উপজাতির মানুষের মধ্যে বক্তগঙ্গা প্রবাহিত করার জন্য ভাটিয়া বনাম বেশি (অর্থাৎ রাজবন্দী বনাম অ-রাজবন্দী) দামার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করছেন তাদের গবেষণা আর নানা উত্তেজক লেখার, কাজে।

তারা এটা ভাল করেই জানেন যে কামতাপুরী আসলে পশ্চিম বাংলাভাবার কামরানী কথাভাষা। তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাব যে চট্টগ্রামের বা পূর্বসিল্লার উপভাষা বাংলার মান (বা প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড) ভাষা থেকে যতদূরে কামতাপুরী ভাষা তার তরে অনেক কাছের। আর উপভাষা পৃথিবীর সব ভাষারই থাকে—একটা ভীষণ ভাবার এ-একটা স্রোতের বৈশিষ্ট্য যা এর প্রণপ্রবাহকে সচল রাখে। বাংলা ভীষণ ভাষা তাই তারও উপভাষা বা কথাভাষা আছে।

বাংলার উপভাষা বিভাজনের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ কুমার ১৯২৬ সালে ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language) প্রবে যে বিভাগ করেছেন তা হলঃ

১। রাঢ়ী — (পশ্চিম অঙ্গ) পশ্চিমবঙ্গীয়

— অধ্য পশ্চিমবঙ্গীয়

— দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গীয়

— কাড়ভটি (মেদিনীপুর-পূর্বসিল্লার-মানভূম — প্রমিত (মান) কথাভাষা (SCB))

২। বরেন্দ্রী (NCB)ঃ আনিক পঃ হঃ/আনিক বাংলাদেশ

৩। কামরানী (NEB)ঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ

৪। বঙ্গালি (EB)ঃ পূর্ব বঙ্গীয় (বাংলাদেশ) ও তৎসং ফরিমগঞ্জ, কাছাড় এবং ত্রিপুরা-মণিপুরী।

আপাতে সর্বশেষ বিভাজনে (১৯৯০) আমরা দেখি পুরোন
মজুমদার কৃত বিভাগ; তিনি বলেন :

প্রভু বাংলা

পূর্ব	পূর্ব-পশ্চিম	পশ্চিম	পশ্চিম-পূর্ব
১। দাউ	১। নেত্রবাড়ি	১। উত্তর	১। উঃ পা টাউ
২। লক্ষ্যপতি	২। পূর্ব টাউ	২। রক্ত	২। মধ্যমদি
৩। নবাবী	৩। শ্রীপুর	৩। উত্তর	৩। উত্তর
৪। পঃ কামদলী	৪। জগদপুর	৪। উত্তর	৪। উত্তর
৫। উত্তর	৫। উত্তর	৫। উত্তর	৫। উত্তর

এখানে পশ্চিমা কামদলী উপভাষার অধীনে আমাদের
আলোচ্য রাজবাড়ী/রাপুড়ী ও কামদাপুড়ী বিভাগ। প্রিয়ারণন
রাজবাড়ীকে 'Separate Dialect' বলেছেন "Separate
Language" বলেননি (—ড. নির্মল দাস)।

এখানে আমাদের সংশ্লিষ্ট কিছু উপভাষার নমুনা আমরা
সংকলন করব এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কত সন্নিহিত গ্রামে
সংশ্রুত করা এই নমুনা যে বাংলা মান ভাষার দৃষ্টিতে (একটি
ছোট গল্পকে কেন্দ্র করে অনুশীলিত) তা প্রথমে উদ্ধৃত করি :

সুন্দর

কাঁকড়া সর্দী : একটি পরিবার। মা ও ছেলে থাকে।
একদিন ছেলেটি মাকে বলল—আমি একটু বিদেশে যাব।
মা বলল—খুব ভাল কথা। ছেলে বিদেশে যাচ্ছে। মার খুব
আনন্দ। মা ছেলেকে ডেকে বলল—আমি আশীর্বাদ করি।
তোমার রক্ষা হোক। কল্যাণ হোক। কিন্তু একটা কথা বলি
বাবু। বিদেশে একা একা যেতে নেই। তাই এই কাঁকড়াটি
থাকে এনেছি। একে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

মায়ের কথা শুনে ছেলের খুব আনন্দ লাগল। সে
মাকে ধন্যবাদ করল—এই কাঁকড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে কি
হবে ? তাহলে একে আমি রাখি-বা কোথায় ?

মা বলল—এক কাজ কর বাবু। তোমার বোতল
মধ্যে একটা কর্পুরের কৌটো আছে। তাতে করেই তুমি এই
কাঁকড়া সর্দীকে নিয়ে যাও।

ছেলেটি মায়ের কথা মত কাজ করল। পরদিন সূর্য
উঠার সাথে সাথে মাকে প্রণাম করে বিদেশে রওনা হল।
ইটিতে ইটিতে সে বকরু গেল। নুপুরে সূর্যের তাপ বাড়তে
লাগল। রোদে পথ ইটিতে ইটিতে ছেলেটি বড় ক্লান্ত হয়ে
পড়ল।

পথের ধারে ছিল সারি সারি গাছ। তাইই মধ্যে সে
একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। বিশ্রাম নিতে

লাগল। গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাস আসতে লাগল। তার
পরীত শীতল হতে লাগল। আরে আরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এ দিকে এক বিপদ ঘটল। ছেলেটি ঘরান গভীর ঘুমে
অচেতন, তখন কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে
এল। ফণা বিছার করে সাপটি ছেলের দিকে এগিয়ে
আসতে লাগল। বোচকর কাছে আসতে সাপটি কর্পুরের
গাছ পেল। সাপ কর্পুরের গাছ বুঝি পছন্দ ? ওই
গাছে আঁকুট ছিল। তারপর বোচকর ভিতর থেকে কর্পুরের
কৌটো সাপটি ধরে ধরে ফেলল। তারপর কৌটোটা
মাটিতে ঠুকতে থাকল। তার ইচ্ছা কৌটো ঘুমে কর্পুর
থাকে। মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে এক সময় কৌটো ঘুমে গেল।
আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কাঁকড়া।
ছেলেটির মায়ের দেওয়া সেই কাঁকড়া। কাঁকড়াটি বেরিয়েই
তার মুঠো বড় মোটা লাগে নিয়ে সাপের গলা চেপে ধরল।
আর তার কোথায় ? সাপ আর নড়াচড়া করতে পারল না।
আরে আরে কেঁদে হতে বেচারী সাপ মরেই গেল।

এতদূর কাণ্ড ঘটতে গেল ছেলেটি কিছুই জানতে
পারল না। সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। কিছুক্ষণ
পর তার ঘুম ভেঙে গেল। তখন বিকেল বাড়িয়ে এসেছে।
তাই আবার রওনা হবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে লাগল।
বোচকটা ভুলতে গিয়ে সেখানে গেল, কর্পুরের কৌটোটা
খোলা। তার পাশে মরা সাপ আর কাঁকড়া।

তখন ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল। মনে মনে
কাঁকড়াকে সে ধন্যবাদ জানাল। আর মনে মনে ভাবল—
মা যদি এই কাঁকড়াটি না দিত, তাহলে আজ আমি এখানেই
শেষ হয়ে যেতাম।"

এর সঙ্গে গল্পটির যার মূখ্য ভাষার অনুদিত তার প্রসঙ্গ
করেকটি তথ্য আমরা জানতে চাই যার যে উত্তর এখানে তার
শ্রেণী বিভাগ, ভৌগোলিক বিবাস, সামাজিক পরিচরিত্তিক
বিব্রেকণে সহায়ক হয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের গবেষণা সহায়ক ও সম্ভাব্যময়
উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটিও এখানে পুরোটিই তুলে দেওয়া হল।
করা এই প্রথমে ক্রমান্বয়ে তারা উত্তর সংগ্রহ করেছেন।
প্রকার পরিচালকও এদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গেছেন।

Linguistic Survey by Nilish Biswas DIALECTS OF BENGALI LANGUAGE

নাম :

স্বাক্ষর : নিবেদন,

আমি বাংলা ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত উপভাষা/
কথ্যভাষা সংগ্রহ করছি। কাঁকড়া সর্দী নামে একটি মূল
গল্প এ চিঠির শেষে ছাপা হয়েছে। আপনাদের কাছে
অনুরোধ উক্ত গল্পটি বাংলা ভাষার কোনও উপভাষা বা

(সেখানে ৭১ পৃষ্ঠা)

জলপাইগুড়ি জেলার টোটোদের অ

দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনপ্রসার সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণাগারের পক্ষ থেকে এপ্রিল (২০০০) মাসে একটি দল জলপাইগুড়ি জেলার আদিম উপজাতি টোটো জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। মাদারিহাট ব্লকের তুটান সীমান্তের লাগোয়া একটি ছোট পাহাড়ি মৌজা টোটোপাড়া। টোটোপাড়ার লোকসংখ্যা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিকাজ, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও অগ্রগতি প্রসঙ্গে চিত্রা, ভাবনা, প্রত্যাশা ও কর্মসমোচনের আলোচনা এবং পর্যালোচনার সারাসংক্ষেপ এখনে রাখা হল :

ওক্ততে বলে রাখা ভাল যে সর্বত্র নতুন শতকের সূচনা হয়েছে। এখন আর কোনও পাড়া বা গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে পারবে না। সেজন্যও সকলে তৈরি হচ্ছেন। নতুন যুগের ওক্ততে সকলের আশা ও প্রত্যাশার সঙ্গে দাবাবিকভাবেই টোটোরাও তৎপর হচ্ছেন। এরা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল, নিজেদের কিছু জমি আছে। এরা জমি চাষ করে ধীরে ধীরে চাষান। ভূমি বা ধান চাষের মরসুম শেষ হলে কমলালেবু ভোলাপা জনমজুরের কাজ করেন। এদের সমাজে পুত্রত্বের ওয়ে নারীর পরিত্রা নেশ। অধিকাংশ

পরিবারের পুত্র ও নারীর যৌথ প্রচেষ্টায় পরিবারের সকলের অগ্রসংস্থান করাি এদের কাছে প্রধান কাজ। অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে দাবিস্রসীমার উপরে উঠে আসার প্রক্রিয়া ওক্ত হয়েছে।

টোটো জনগোষ্ঠী লোকসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম আদিম উপজাতি। ২০০০ সালের এপ্রিলে টোটোপাড়ার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫,২২৫ জন এর মধ্যে টোটো সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ১,১৫৭। পুত্র

৬১৬ এবং নারী ৫৪১ জন। এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২৩.৫০ শতাংশ। অস্বার্থেই এদের সাক্ষরতার হার ২৬.৪৫ শতাংশ। টোটো পুত্রবন্দের সাক্ষরতার হার ৩৪.০২ শতাংশ এবং নারীদের সাক্ষরতার হার ১৭.৭৪ শতাংশ। মাধ্যমিক পাশ করেছেন ১জন। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন ১জন এবং স্নাতকোত্তরও একজন। টোটো ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি যথ-যোগ্যি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সুযোগ-সুবিধানের ব্যবস্থা আছে। গত ১৯৯৭-৯৮ সালে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র বই কেনার জন্য যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তা হল পঞ্চম শ্রেণী ২০ টাকা, বই শ্রেণী ৫০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১৫০ টাকা, কেবল নবম শ্রেণীর জন্য ২০০ টাকা এবং দশম শ্রেণীর জন্য ১০০ টাকা। শিক্ষার যাবতীয় উপকরণের মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচপত্র অস্বার্থবিকভাবে বৃদ্ধি পাবার দরুন অনুদানের পরিমাণ সর্বদাই প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই আদিম জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকা কিছুটা সঞ্চল কেবল উন্নয়ন সরকারের দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে সঞ্চল ও অসঞ্চল—এই দুই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যবধান দেখা গিচ্ছে।



টোটোপাড়ার পুত্রাও ওয়া দ্বিতীয়ত পুত্রি সাজেদুল

গতি : একটি সমীক্ষা (২০০০ সাল)

খ ঢালী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টোটে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখপড়া শেখাবার প্রধান অন্তরায় ভাষার মাধ্যম। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজি প্রাথমিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল, সাধারণ ও বাস্তবিকভাবে পঠন-পঠন করানো এবং পরিপার্শ্বিকের সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো টোটে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়ে থাকে। 'সবদের জন্য শিক্ষা' এবং 'জাতীয় পুষ্টি নীতি' এর সূক্ষ্ম সম্মান হলেও টোটোপাড়ার মতো পার্বত্য গ্রামে ঘরে ঘরে পৌছানো টোটোদের জন্য আশ্রম হস্টেলের মাধ্যমে মাত্র ৩০ জন ছাত্রের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভবও এখনও এখানে ঝুলন্ত ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। এসের অধিকাংশই এখন বিভিন্ন জায়গায় টিকে শ্রমিক মজুরি ৫০ টাকার বিনিময়ে পাথরভাণ্ড খানানে



টোটোপাড়ায় নদ-ঘাটত পানীয় জল

কাজ করে। দুটান সীমারে কম মজুরিতে মাল পরিবহনের কাজে যায়। এই দুটান আর বেননার থেকে উত্তরণের পথের সহান চলেছে।

আশার তৃণ, নিরক্ষর টোটোদের সাক্ষর করে শিক্ষার আগ্রহ পৌছে

বেওয়ার জন্য টোটো যুগেযুগীর অত্যন্ত লপঙ্কন বেশ কিছুদিন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শিখদিনের কুপ্রথা বা কুসংস্কারতলিকে (মনাপান, ছুতা ইত্যাদি) নির্মূল করার জন্য এরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু বেশ কিছু টোটো পরিবারের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল থাকায় একদল বহিরাগত মুনাফাশেতী মানুষের লোভের ফলে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিপর্যস্ত হচ্ছে। মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা বলে কৃষিক সম্পদের দুষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করার করার প্রবন্ধ রূপায়িত হলে যেসকর টোটো যুবকদের কাজের অভাব হবে না।

এখন টোটো জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ নারী ও পুরুষের অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে সুস্থতার নানুতম ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিগতভাবে খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল ও ওষুধের পৌছে বেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে বিনামূল্যে পৌছে বেওয়া হয়েছে। পরিদ্রসীমার নিচের অত্যন্ত ১০টি পরিবারের জন্য পাকা



টোটোপাড়ার আশ্রম হোস্টেল

বসতবাড়ি তৈরি করে সেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ বাড়িতে স্যানিটরি পরাধীন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ষা গৃহপলিত পুকুর, গোরু, মোষ, হাঁস-মুরগির মলমূত্র ও কলার সমস্ত টোটেও বর্জ্যওলাই আগের মতো আর মুখিত হচ্ছে না।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে স্বাস্থ্য পরিবেশা পৌছে সেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতিদের জন্য ছাঁট শয্যার ব্যবস্থাসহ সর্বকণের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হয়েছে। ক্ষুধারি চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীকে মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হয়েছে। টোটেয়া এখন মদ্রতর, তুতাক, তাবিল-মাদুলি, ওকা-গুলি ও কাচমুক ইত্যাদির প্রভাবে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। টোটে সনাজের বর্তমান প্রভাবের মুখ-মুখতীয়া সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর প্রাণে উদ্যোগী হয়েছেন। পরিবার সীমিত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন।

টোটেদের কুসি ও তার উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনার আগে বরেন্দ্রটি কথা বলা দরকার। ১৮৮২-১৮৯৪ সালে পশ্চিম ভূটানের ভূরিপের সমর লাজার সাহেব টোটেপাড়া মৌচাক সেংকিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ০.১২ বর্গমাইল বা ১.৯২৬.৮ একর জমির পদ্মা টোটে জমগোষ্ঠীর প্রধানের নামে নিয়েছিলেন। তখন গুই নেওলের নামে সমস্ত জমিটাই টোটেদের বৌধ সম্পত্তি হিসেবে থাকবেও ৬০টি টোটে পরিবার এক বৌধ সমাজ ব্যবস্থার ভোগবান ও দখলদার এবং সবলের সমান অধিকার

১৮৮২-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কলবং ছিল। সেক্ষেপে পরিবারপিছু ২ টা কা করে (ক্যাপিটেশন ট্যাক্স) আদায় করে তহবিলদানের সেরেজার জমা নিভেন। তারপর ১৯৬৯ সাল থেকে সেরেজার ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। পরবর্তী ভূকাসন (সেটেলমেন্টে) কালে যে সকল পরিবার যতটুকু জমি চাষ বা দখল করতেন, ঠিক

একনজরে টোটেপাড়া (পরিকাঠামো—এক উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন)

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	মুঠ পয়সা ব্যয়: একটি পল্লভের ঐক্যে মো. ৮৮.৮।
২। মুরগি হাইস্কুল	—	মুঠ পয়সা: দুইয়ের অধিকই প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত।
৩। অগ্রিমচিকিৎসা শিবির (কো-অপারেশন প্রকল্পের অধীনে)	—	একটি পল্লভারি, কাসন হোস্টেল সহ।
৪। হাসপাতালিকি কেন্দ্র	—	১টি
৫। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	—	১টি: দুইয়ের নিচে উন্নয়ন প্রকল্পধীন।
৬। বসত শিবির	—	১টি
৭। স্বাস্থ্য পরিষেবা	—	১টি: টোটে কল্লভ মজির পরিচালনধীন।
৮। পল্লভিকেন্দ্র	—	১টি: দুই পল্লভিকিট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।
৯। অগ্রিমচিকিৎসা	—	১টি: উন্নয়ন মজির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।
১০। কল্লভ	—	১টি
১১। সনাজ পরিষি	—	১টি
১২। পল্লভ জল	—	২টি: পল্লভ জল—পল্লভিকেন্দ্রের সাহায্যে পল্লভিকিট করা হয়।
১৩। বিদ্যুৎ	—	প্রকল্পে সমস্ত গ্রাম, ভূটিকজার, মুল, ভূটপল্লভের প্রতিটি গ্রামের বিদ্যুৎ সেবা দেওয়া হয়েছে। পল্লভ ও সরকারের জমির পল্লভ আছে কল্লাই ইলেকট্রিক্যাল কোর্পোরেশন।
১৪। অগ্রিমচিকিৎসা কেন্দ্র	—	১টি: পল্লভিকিট সনাজের সেবার।
১৫। প্রাথমিক পল্লভিকিট	—	১টি
১৬। কল্লভ	—	১টি: পল্লভিকিট—টোটে কল্লভিকিট পরিচালনধীন।
১৭। বি বি ও হল	—	১টি: টোটেপাড়ার জলার সনাজ।
১৮। সিনেমা হাউস	—	১৬ বিবি কুই গ্রামিকিট এবং ২১ বিবি কুই অগ্রিমচিকিট।
১৯। অগ্রিমচিকিট	—	অগ্রিমচিকিট থেকে টোটেপাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রকার সিনেমা ও সিনেমা হাউসের করে।
২০। হাইস্কুল	—	টোটেপাড়ার প্রতি সনাজের সনাজ থেকে ছাট মস। ১৬ বিবি কুই সনাজিকার প্রতি কল্লভ ছাট মস। ২১ বিবি কুই অগ্রিমচিকিট প্রতি কল্লভ ছাট মস। ০২ বিবি কুই প্রতি কল্লভ উন্নয়ন ছাট মস।
২১। হোস্টেল	—	২টি
২২। ইকলন	—	২টি
২৩। অগ্রিমচিকিট সনাজ	—	১টি
২৪। পল্লভ সনাজ / সনাজের সেবা	—	১টি: বিদ্যুৎ পরিচালিত।
২৫। কল্লভিকিট	—	১টি
২৬। মুরগি	—	১টি
২৭। সিনেমা হাউস	—	১টি
২৮। কল্লভের সনাজ	—	১টি
২৯। মজির সনাজ	—	২টি
৩০। সনাজের সনাজ	—	১টি
৩১। সনাজের সনাজ	—	১টি

ততটুকু জমিই নবি (রেকর্ড) ছুভিকরণ হয়। তখনকার সমস্ত টোটেয়া একমাত্র আমন চাষের সময় বেশি ভূটীর বীজ, বেশি মাদ্রুয়ার বীজ, ধানের বীজ বপন করতেন, ভালো ফসল উল্লাতে পরতেন না। ভূটী বা গান বা মাদ্রুয়া চাষের মরসুম শেষে হলে ভূটানের কমলালেবু

ভেলার কাছের সঙ্গে যুক্ত হতেন যা ভূটান থেকে টোটেপাড়া কমলালেবু পরিবহণের কাছে সিন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এখন সেই পরিষিতির অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। এখন কৃষিজমিতে ধান

চাষের ব্যবস্থা করে জন সংরক্ষণের বা সেকের (Miner's association) ব্যবস্থা হয়েছে। উন্নত মানের ভুট্টা, বীজ, ধানের বীজ ও মাড়িয়ার বীজ এপনের জন্য গ্রামসেবকের কাছে প্রয়োজীয় উপলব্ধ নিচ্ছেন। ভালো ফসল ফলানোর জন্য কীটনাশক ও স্বেচ্ছাশ্রম ব্যবহার করছেন। এছাড়া টোটোপাড়ার মাটি উন্নত মানের সুপারি চাষের, কাঠাল চাষের এবং বাগ চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই সমস্ত অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষির উন্নয়নে উন্নত ভুট্টার বীজ ও রাসায়নিক সার প্রকৃতি সম্প্রদায়গণ আধিকারিকের মাধ্যমে টোটোপাড়ার আসছে এবং উচ্চ ফলনশীল বীজে চাষাবাসের প্রকল্প বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। কেবল ওখা ঘরসূয়ে সামান্য সেকের ছদের সংকুলান হলেই ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটবে।

এই উপলব্ধি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক পরিবর্তনে রাজা সরকার নিয়ত চেষ্টা করে চলেছেন। পরিব টোটো চাষীদের মহাজনের বন্ধত থেকে মুক্ত করার জন্য মধ্যমেসারি শর্তে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও প্রাণী যানবাহন এবং অন্যান্য খাতে



টোটোপাড়ার চাষের বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য

টাকা ধর দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য টোটোপাড়ার উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় প্রাণী ব্যাংক ব্যাপকভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। কল আদায়ের ক্ষেত্রেও ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

এতসঙ্গেও সামাজিক প্রগতিশীল চেতনার অভাবে বেশির ভাগই তা বেশিদিন ধরে রাখতে পারছেন না।

আবার সেই পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। টোটো উপজাতির জীবনে অনগ্রসরতা, পশুচাষপন্থা, কঠোর রক্তশীলতা ও অনমনীয় মনোবৃত্তির পরিহার করাতে হলে চাই শিক্ষা। শিক্ষা আনবে চেতনা। বিতাপমান চেতনাই ধরে রাখতে পারবে তাদের অগ্রগতির।

[২]

আদিবাসী উপপ্রকল্পে নিযুক্ত আদিবাসী পরিবারের আর্থিক অগ্রগতির মূল্যায়ন : জেলা জলপাইগুড়ি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তলসিলি আদিবাসী উপপ্রকল্প কর্মসূচিতে একাধিক প্রকল্পে আদিবাসীদের মাঝে ব্যাকে কল, অনুদান ও প্রান্তিক অঙ্গের সহাবে যে অর্থনৈতিক অগ্রসরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে, তার সাম্প্রতিক পরিবারভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত নাগরাকটা ব্লক ও

মাহারিহাট ব্লকে উপরোক্ত সমীক্ষায় তিনটি ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি আদিবাসী পরিবারের আর্থিক অগ্রগতির বিস্তৃত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

ইতি কুম্ভুর : জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকটা ব্লকে নাগরাকটা চান্দরলাইন বসবাস; সম্ভদায়গড়ভাবে গুয়াও পৌত্তীকৃত। পরিবারের দোকানখোয়া তিন। ঘাসী সমীকন কুম্ভুর, বরদা আঠাশ, পেশার ছাত্র পড়ানো। উচ্চ মাধ্যমিক

পাস করার পর উপদ্রুত কাজ না পাওয়ার ফলে ছাত্র পড়ানোর কাজে নিজেই নিয়োজিত রেখেছেন। ছেলে স্মৃতি কুম্ভুর নাসারিতে পাঠরত।

দ্বীমতী কুম্ভুর, বরদা ডেইশ, শিকাগত যোগাডা নবম শ্রেণী পর্যন্ত, পারিবারিক দায়বদ্ধতায় অনুপ্রাণিত হয়ে গুড়ো ফসলা তৈরির ব্যবসায়ে নিজেই নিযুক্ত করেছেন।

সরকারি আদালতী উপপ্রকল্প কর্মসূচিতে নিজেদের নথিভুক্ত করার ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে 'চট্টো মসলা তৈরি' প্রকল্পটি পাবার জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন।

আবেদনপত্র অনুমোদন ও বরাদ্দ অর্থ মোট এগারো হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা পেতে প্রায় ন'মাস সময় লেগেছে।

২০০০ সালের মার্চ মাস থেকে চট্টো মসলা তৈরির পরিকল্পনামের প্রীতি বিনিয়োগ উৎপাদনে নিজেদের এবং আরও দুজন কর্মচারি নিযুক্ত করেছেন। উৎপাদনের মাত্রা ও তার বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি বিনিয়োগে।

প্রকল্পের আওতার আসার আগে তাঁর বামীর কেন্দ্র চাকরি ছিল না, ছাত্র পড়িয়ে মাসিক ছয়শো টাকা রোজগার করতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে মাসে ন'শো টাকার মতো রোজগার হত।

বর্তমান প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদান ও কল পাবার ফলে মাসিক আয় ন'শো টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দু'হাজার পাঁচশো টাকা হয়েছে।

উল্লেখ্য এই যে, মাসিক একশো টাকা করে দুজন কর্মচারির জন্য দুশো টাকা, মসলা কেনা এবং মসলা তৈরির যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণে সর্বমোট মাসিক এক হাজার টাকা খরচ বান দিয়ে মাসিক আয় বৃদ্ধি ঘটলে এক হাজার পাঁচশো টাকা।

প্রসঙ্গত আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, যাবৎকাল কল পরিশোধের নিয়মানুসারে মাসিক দুশো টাকা হারে মোট ন'টি বিদ্যুতে এক হাজার আটশো টাকা দেওয়ার কথা, অর্থাৎ পরিশোধ হয়েছে মোট তিন হাজার পাঁচশো সত্তর টাকা।

সুদীপ্ত নারজিনারী : জলপাইগুড়ি জেলার নাগজাকটা ব্লকে নাগরাকটা বাজারে বসবাস। আদালতী সফলতার হিসাবে সে গোষ্ঠীভুক্ত। পরিবারের সোয়াক্ষণ্য পাঁচ। স্বামী রাজু নারজিনারী, বরস চরিত্র বছর, এলাকার বিভিন্ন

পরিবারিক অনুষ্ঠানে রাজার কাজ করেন। এক ছেলে শ্যাম চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে এবং বড় মেয়ে রাজলী বর্ত শ্রেণীতে পড়ে এবং ছোট মেয়ে সন্ধ্যা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

শ্রীমতী নারজিনারী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্যতা নিয়ে চারের সেকেন্দ্র দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৯৯২ সালের জুন মাসে সরকারি কর্তৃক অনুদান ও ব্যাংক কল পাওয়ার জন্য আদালতী উপপ্রকল্প কর্মসূচিতে আবেদনপত্র পেশ করেন।

আবেদনপত্র অনুমোদন ও আর্থিক সাহায্য পেতে প্রায় ন'মাস সময় লাগে।

২০০০ সালের মার্চ মাসে দু'হাজার টাকা অনুদান বাবদ ও কলসহ মোট প্রাপ্ত অর্থ হল বারো হাজার টাকা। প্রাপ্ত যাবৎ হাজার টাকা থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের আট হাজার টাকা নিয়ে নিজের চারের সেকেন্দ্র 'চা ও রেস্তুরা' সেকেন্দ্র পরিচালনা করেন। ছয়মাস পরে ব্যাংক থেকে আরও চার হাজার টাকা ঋণে 'চা ও রেস্তুরা' সেকেন্দ্রটির প্রীতি বিনিয়োগ হইল।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের আগে মাত্র একজন কর্মচারি নিয়ে চারের সেকেন্দ্র চালু ছিল। স্বামী রাজু রাজার কাজ না থাকলে তিনি এই সেকেন্দ্রেই কর্মচারি হিসাবে কাজ করেন। তিনি দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হারে এলাকার রাজার কাজ করে থাকেন। চারের সেকেন্দ্র থেকেও স্বামীর দৈনিক আয় থেকে মাসিক সর্বমোট আয় হত অনুমানিক এক হাজার তিনশো টাকা।

সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে কর্মচারির সংখ্যা তিনজন। প্রত্যেক কর্মচারিকে খাদ্য-খাদ্য বাসে মাসিক দুশো টাকা হারে বেতন দেওয়া হয়।

সেকেন্দ্রে দৈনিক আয় আটশো টাকার মতো, কর্মচারির বেতন বাবদ ব্যয়, সেকেন্দ্রের দৈনিক ব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বান নিলে দৈনিক নিট আয় আনুমানিক দেড়শো টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পের আওতার আসার পর মাসিক

নিট আয় চার হাজার পাঁচশো টাকা — এক হাজার তিনশো টাকা। তিন হাজার দুশো টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যাবৎকাল কল পরিশোধের পরিমাণ হল এক হাজার দুশো টাকা, কিন্তু সের কল পরিশোধের পরিমাণ হল পাঁচ হাজার একশো বাট টাকা।

সীমবলে টোটো : মানসিংহট ব্লকের টোটোপাড়া অঞ্চলে মিত্র গাঁওয়ে পরিবারটির বাসস্থান। টোটোপাড়া অঞ্চলের বিশেষত্ব হল, অঞ্চলটি সমতলভূমি থেকে একটি বেশি উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে খানচাষ ভাল হয় না, ভুট্টা ও যব চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্যীয় হল সুপারি চাষ এই অঞ্চলে অন্যতম উৎপাদিত বস্তু।

আদালতী উপপ্রকল্প কর্মসূচিতে নিজের নাম নথিভুক্ত করার পর সীমবলে টোটো ১৯৯৫ সালে সুপারি চাষের প্রকল্পটি গ্রহণ করেন।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রকল্পটি পাবার জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন, আবেদনপত্র মঞ্জুর ও বরাদ্দ অর্থ সাপ্তা হাজার আটশো টাকা পেতে সময় নিয়েছে প্রায় এগারো মাস।

প্রকল্পের আওতার আসার পূর্বেই মাত্র আশ বিয়া জমির উপর সুপারি চাষ হত, প্রকল্পের আওতার আসার পর সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ দিয়ে এক বিয়া জমির উর্বরতা বাড়িয়ে তিনশো পঞ্চাশটি সুপারি চারাগাছ লাগিয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনশো চারাগাছ বড় হয়ে ফল দিতে শুরু করেছে। সুপারি গাছগুলির বস্তু নেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ সীমবলে টোটো নিজেই করেন।

সময়সের পরিবারের সোয়াক্ষণ্য নয়। বরষা পূর্বব দুজন, বরষা মহিলা তিনজন, একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে।

পরিবারের এক বিয়া জমি বান দিলে আরও দুই বিয়া জমি থাকে, এই দুই বিয়া জমিতে সীমবলেতে বান দিলে একজন বরষা পূর্বব ও তিনজন বরষা মহিলা

ছুটি চাষ করেন। চাষের কাজের সঙ্গে সঙ্গে এরা গরু ও পুকর পালন করেন। অবসর সময়ে ভুটানে কমলালেবুর বাগানে কাজ করতে যান।

প্রকল্পের আওতার আঙ্গার পূর্বে সীমাবলে টোটো সুপারি চাষের সঙ্গে সঙ্গে ভুটানে কমলালেবুর বাগানে কাজ করতে যেতেন। বর্তমানে সুপারি চাষের কাজ

বৃদ্ধি পাওয়ার কমলালেবুর বাগানে আগের মতো কাজ করতে বেড়ে হয় না।

প্রকল্পের আওতার আঙ্গার পূর্বে বেখানে বছরে মাত্র তিন হাজার টাকার সুপারি বিক্রি হত, এখন বছরে প্রায় আট হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকার সুপারি বিক্রি হয়। গতবছর দশ হাজার টাকার সুপারি বিক্রি হয়েছে।

উদ্রোখযোগ্য বিষয় হল, এই প্রকল্পটি পরিবারের বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ উদ্রোখযোগ্য বিষয় হল, সরকারি সমস্ত কল চার হাজার আটশো টাকা খরাসময়ে পরিশোধে হওয়ায় প্রকল্পটির সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রতিবেশক : অমিত শেখসহ

[৩]

পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প : মূল্যায়নের কিছু তথ্য

সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শিথিল বাক্য আদিবাসী জন-গোষ্ঠীর উত্তরণের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পে অনুদান ও ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে তাঁদের উপার্জনের পথ সুগম করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা সরকার গ্রহণ করেছে। পুরুলিয়া একটি ঘন আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। সমগ্রটি উক্ত জেলার আদিবাসীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পের মূল্যায়নের উপর কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে কিছু প্রকল্পে উদ্রোখযোগ্য সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১। উক্ত জেলার পূর্বনভা এলাকার পলিনা সামওয়লে হেনগ্রাম নামের জনৈক আদিবাসী মহিলাকে 'শক্তি' প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়। উক্ত প্রকল্পটির মূল্য ছিল ২০,০০০ টাকা। এর মধ্যে সরকারের অনুদান ছিল ৬,০০০ টাকা এবং ১৪,০০০ টাকা ব্যাঙ্ক কল। ২-৭-৯৯ তারিখে পূর্বনভা মারফত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২৭-৭-৯৯ তারিখে ব্যাঙ্কের অনুমোদনের পর ৩-৯-৯৯ তারিখে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হয়। উপভোক্তার বাস্তব পরিমাণ প্রায় ২

৪ জন। তাঁর পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৪ জন। এই চারজনের মধ্যে ২ জন শিশু। উপভোক্তা নিজে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং তাঁর স্ত্রী মাধ্যমিক অন্তীর্ণ। তাঁর পুরো পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র এবং কন্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। প্রথমে তাঁদের একটি ছোট লড়ি ছিল। এই প্রকল্পের অর্থ পাওয়ার পর লড়ির কাজ অনেক বেড়ে যায়। দৈনিক ৩০ টাকার একজন মজুর রেখেছেন। প্রকল্পের অর্থ পাওয়ার পূর্বে তিনি বৎসরে প্রায় ১২,০০০ টাকা উপার্জন করতেন। এখন তিনি বাৎসরিক প্রায় ৩০,০০০ টাকা উপার্জন করছেন। ব্যাঙ্কের কল পরিশোধের অঙ্ক মাসিক ৩৫০ টাকা নির্ধারিত হলেও দ্রুত কল পরিশোধের লক্ষ্যে তিনি ডিসেম্বর, ২০০০-এর মধ্যে ৬০০১ টাকা পরিশোধ করেছেন। উদ্দেশ্য, দ্রুত ঋণ শোধ করে আরও কল নিয়ে প্রকল্পটির সম্ভাবনায় প্রতী হওয়া। বর্তমানে সূচুভাবে সাতা বছর প্রকল্পটি চালানোর জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর বাড়িতে একটি ইয়ালা আছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে জল কমে যাওয়ার দরুন একই কাজের অসুবিধা হচ্ছে। এই জলের সমস্যা সমাধানের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হলে আসোচ্য প্রকল্পটি আরও

সমৃদ্ধ হবে।

২। এই জেলার বাশোয়ান ব্রকের পাহাড়পুর গ্রামের ২৬ বছর বয়সের সীতেশাল যুবক হেমন্ত কিছু একটা মুনি সোকান প্রকল্পে অর্থ প্রদানের জন্য ২০-৩-৯৯ তারিখে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন ৩১-৩-৯৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ওই অনুমোদিত অর্থ ১৫,০০০ টাকা ৩০-৭-৯৯ তারিখে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। হেমন্ত কিছুর শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী। তাঁর পরিবারের মোট প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা ১১ এবং শিশুর সংখ্যা ৩। তাঁর জমির পরিমাণ প্রায় ১০ বিঘা ১০ কাঠা। তাঁর একটি ছোট মুনি সোকান ছিল। ওই প্রকল্পে অর্থ পাওয়ার পর সোকানের পণ্যসামগ্রী বাড়িয়েছেন। কলে সোকানের বিক্রি প্রচুর বেড়েছে। সেই সঙ্গে তিনি ওই সোকানের পাশে একটা চাষের সোকান ও ছোট একটা মিষ্টির সোকান করেছেন। ডাছাড়া তিনি বাবুইয়াস ক্রমবিক্রমেও ভাল লভ্যাংশ পাচ্ছেন। এই সমস্ত সোকানের কাজ সূচুভাবে করার জন্য দুজন সোকান-কর্মচারী রেখেছেন। প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য দৈনিক ২০ টাকা বেতন ছাড়াও কিনামুলো দুপুরের খাবার এবং টিফিনের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রকল্পে অর্থ

পাওয়ার আগে বছর তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩৫ হাজার টাকা। এখন চাষ জমির আয় ছাড়া তিনি বছরে প্রায় ৭০ হাজার টাকা উপার্জন করছেন। এই প্রকল্পের ১০০০ টাকা অর্থের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করেছেন। ল্যাম্প থেকে ১০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তাকে যথাসময়ে পরিশোধ করেছেন। তিনি আবার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যক্তিগতভাবে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এই ১৫,০০০ টাকা অর্থের মধ্যেও তিনি ৫০০ টাকা করে তিন কিস্তি এবং এককালীন ১,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। অর্থাৎ ওই ব্যক্তিগত অর্থের ২,৫০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। সে প্রকল্পটি আরও বাড়িয়ে এবং পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ

উপার্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।
৩। এই জেলায় বাণোদ্যান ব্লকের হারদা গ্রামের ৩৫ বছর বয়স্ক দুইক বাহাদুর মতি খেতমজুরি এবং বিনমজুরি করে তাঁর সংসার চালান। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুজন শিশু। মোট চারজনের পরিবার। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। শূন্য এবং কন্যা দুজনেই প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। তাঁর চাষজমি নেই। এই দুইকর বাবুইসিঁড়ি তৈরি প্রকল্পের জন্য ৩০-৩-৮ তারিখে আসেন পাঠান হা। সে আবেদনক্রমে ১৬-৪-৮ তারিখে প্রকল্পের মূল্য হিসাবে ৪,০৫০ টাকা অনুমোদন করা হয়। এই টাকার মধ্যে

২,১৭৫ টাকা অনুদান এবং ১,৮৭৫ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ। ২৭-৭-৮ তারিখে ব্যাঙ্ক মরফত তাঁকে ২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের টাকা পাওয়ার আগে তাঁর পরিবারের মোট বার্ষিক আয়, দৈনিক মজুরি বা খেতমজুরি ব্যবস প্রায় ২,০০০ টাকা ছিল। এখন প্রকল্পের টাকা পেয়ে কাইঁশাছ ত্রায় করে গড়ি পাকিয়ে ১২,৫০০ টাকা হয়েছে। তিনি ব্যাঙ্ক থেকে যে ২,০০০ টাকা পেয়েছেন তা তাকে ঋণ বলে সেওয়া হয়েছে। তিনি সে টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন। তিনি আর কোনও নতুন ঋণ না নিয়েও তাঁর ছোট প্রকল্পটির কাজ ভালভাবেই করে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছেন।

প্রতিবেদক : সঞ্জীৱকুমার দাস

বীরভূম জেলার একটি আদিবাসী গ্রাম : সহায়ক প্রকল্পের সম্পূর্ণ সফলতার একটি প্রতিবেদন

বীরভূম জেলার বাঁশবাঁনী একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত এই গ্রামটি চকুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন এবং কলারামপুর বৌজার অবস্থিত।

গ্রামের মোট আদিবাসী পরিবারের সংখ্যা ৩৫ এবং ১৬০ জন মরনাসী নিয়ে গঠিত। শিশুসুদর্শিনীশে পুরুষের সংখ্যা ৮৪ ও নারী ৭৬। এই ৩৫টি পরিবারের মধ্যে ২৬টি পরিবারই ব্যয়ম্রস্ট সরকারের হনির্ভর প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এদের মধ্যে ২৪টি পরিবার ধান জমার কাজে (ধান থেকে চাল তৈরি) শিশু রয়েছে। একটি পরিবারের মুনি সোফান এবং অবশিষ্ট পরিবারটি মুড়ি তৈরি ও শালপাতা সেলাইয়ের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

পরিকল্পনা: এই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামটিতে একটিমাত্র শিশুশিক্ষা কেন্দ্র আছে এবং ৪ কিলোমিটার দূরে একটি ৮, ১২ শ্রাণের অবস্থিত। এ

কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জনবাহ্য কেন্দ্রটি গ্রামটির অধিবাসীদের বাহ্য পরিবেশের দায়িত্ব পালন করছে। গ্রামবাসীদের আর্থিক সেনসেনের কাজ চলার গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া শাখা কার্যালয়। গ্রামের বেজাকেনার কাজ হয় ৫ কিলোমিটার দূরের বাজারে। ৫ কিলোমিটার মোরাম-সড়ক গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ ছাড়া গ্রামে ২ কিলোমিটার পাকা রাস্তাও রয়েছে। কিন্তু বাকি সব রাস্তাই কাঁচা। গ্রামের কাছাকাছি ফেনও জাকঘর নেই। তবে কিছুটা দূরে বাটমুন্ডপুুরের জাকঘর এই গ্রামের মানুষের যোগাযোগ পরিবেশের কেন্দ্র। পানীর জলের প্রয়োজন মেটাতে গ্রামে একটি মার নলকূপই ডরল। সেখান জলের চাহিদাও রয়েছে। দুটি পাতকুয়া আছে। কিন্তু গ্রায়ই সে দুটি অক্ষোজা থাকে।

উপরোক্ত ২৬টি পরিবারের সকলোই এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। যে

২৪টি পরিবার ধান জমার কাজে নিযুক্ত আছে, তাদের প্রত্যেকের প্রকল্প ব্যয় ১২ হাজার টাকা হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছে। বাকি মুড়ি তৈরিকারী পরিবারটির প্রকল্প ব্যয়ও ১২ হাজার টাকা। অপর যে পরিবারটি মুনির সোফান চলার তার প্রকল্প ব্যয় ১৪ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পরিবারের আয় মাসিক ৮০০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ টাকা হয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি পরিবারই ব্যাকের ঋণ নিশ্চিত সময়ে পরিশোধ করছে। এ ব্যাপারে সশ্রদ্ধি গ্রামসেবকদের অবদানও স্বীকৃতির যোগ্য। সামগ্রিক বিচারে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে, আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁশবাঁনী গ্রামটির হনির্ভর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি নিজ নিজ উদ্যোগ ও ক্রমের সুবাদে সার্বিক সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রতিবেদক : প্রীতকুমার সত্য ও নন্দন বসু

আকস্মিক ভাষায় অনুবাদ করিয়ে দিল। এ জনো যে ব্যক্তির ব্যবহৃত ভাষা সঙ্গ্রহ করবেন—তার উচ্চাৰিত ভাষার ব্যবহৃত রূপ (অমলাস কাগজ) লিখতে হবে। এছাড়া ওই লেখাটি ঘর বা বাগের ব্যবহৃত ভাষা তাঁদের কাউকে দিয়ে ওটি পড়াতে হবে এবং সম্ভব হলে তা রেকর্ড করেও দিতে হবে। এছাড়া নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক ওখা সঙ্গ্রহ করে দেবার বিনীত অনুরোধ করি।

১। যার মুখের ভাষা নেওড়া হল তাঁর পূর্ণ নাম ও বর্তমান ঠিকানা।

কতদিন তিনি এখানে আছেন তার বিবরণ।

২। তাঁর জন্মস্থান, জন্ম তারিখ ও বয়স।

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জীবিকা।

৪। সম্ভব হলে ধর্ম, ক্রী, সম্ভ্রমের ও মাতৃভাষার উল্লেখ করুন।

৫। সঙ্গ্রাহক/পবেষক হিসেবে আপনার নাম ঠিকানা ও পরিচয় সমীক্ষার উত্তরপত্রের নিচে লিখে দিন।

৬। এ ব্যাপারে যারা সাহায্য করলেন তাঁদের নাম ও অন্য কোনও জ্ঞাতব্য থাকলে তাও জানান।

সত্য আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

নমস্কার

বিনীত

শ্রীশ্রী বিশ্বাস

সম্পাদক, ঐকতান

তবে এই আলোচনার সঙ্গে যে সব নমুনা নেওয়া হল তার দুটি বামে সবই রাজবন্দী এলাকা থেকে রাজবন্দী সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে সংগৃহীত।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক টীকা আছে। আমাদের সংগৃহীত উদ্ধৃতির সঙ্গে উত্তরদাতারা তাঁদের কথা বলেছেন। সে মন্তব্য, নমুনগুলির পেবে, আমরা শুধার সঙ্গে উদ্ধার করলাম অন্য কোনও জ্ঞাতব্য উপস্থাপনানো।

নমুনা-১

“কীকড়া দোঙ্গার: একটা পরিবার। মাও আর যাটা থাকে। একদিন যাটা মাক্ কহে—মুই কহেন বিশেষ বাহিম। মা কইল—খুব ভাল কথা। যাটা বিশেষত আছে। মাওর খুব জ্ঞানশ। মা যাটাক ডাকে কর—মুই আশীর্বাদ কর। তোর মনসা মেউক। কইখান মেউক। কিন্তু একটা কথা কও বরপাই। বিশেষত এক্সোর এক্সোর বাবা নাই। তর তানে এই কীকড়াটা ধরিল। আনিল। ইয়াক্ তোর নগল ধরি যা।

ছাওর কথা শুনিয়া যাটির খুব আনন্দ্য নাগিল। উয়ার মাক্ জিজ্ঞাসা করিল—এই কীকড়াটাক্ নগল নিয়া কি হবে? তাহাড়া ইয়াক্ মুই বুইয় বা কুন্টে?

মাও কইল—একটা কহা কর যাটা। তোর উপকার ভিতরত একটা কর্পুরের বটুয়া আছে। ওইটাক্ করি তুই এই কীকড়াটাক্ নগল ধরিয়া যা।

যাটটা মার কথামতন কহা করিল। পরের দিন বেলা উঠিবার নগে নগে মাক্ ভক্তি করিয়া বিশেষত রওনা হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে উয়ার বস্তুর গেলিল। মুই পহরে কোলার খাচ বাড়িবা নাগিল। যোসোত পথ হাঁটিতে হাঁটিতে চ্যাঙেটা খুব নাকাল হয়। পড়িল।

পথের ভারত ছিল সারি সারি গাছ। তর মধ্যত উয়ার একটা বড় গাছের ছায়াত্ বসিয়া পড়িল। আদার নিবা নাগিল। গাছের ছায়াত্ ঠাণ্ডা বাতাস আসিবা নাগিল। উয়ার শরীরটা ঠাণ্ডা হক। বসিল। আন্তে আন্তে উয়ার ঘুমিয়া পড়িল।

এই পাথে একটা বিপদ ঘটিল। চ্যাঙেটা বালা খুব ঘুমাইলো। সেলা কুন্টে ঘাকা একটা বিড়টা সাপ বাইর হয়। আসিল। ফনা বড় করিয়া সাপটা চ্যাঙেটার পাথে আগে আসিবার ধরিল।

টপলার গোরোত্ ইসতে সাপটা কর্পুরের গজ পাইল। সাপ কর্পুরের গজ খুই পছন্দ করে। উয়ার ঐ গজে মল্লি গেলিল। তারপর টপলার ভিতর থাকিয়া কর্পুরের বটুয়াটা বাইর করিয়া ফেলালেক্। তারপর বটুয়াটাক্, মাটিতে আছাড় দিবা ধরিল। উয়ার ইয়া বটুয়া খুলিয়া কর্পুর কাখে। মাটিত্ আছাড়াইতে আছাড়াইতে বটুয়াটা খুলি গেলিল। আর তার ভিতর থেকে বাইর হয়। আসিল একটা কীকড়া। চ্যাঙেটার মায়ের নেওড়া ওই কীকড়াটা। কীকড়াটা বাইর হয়। উয়ার মুইটা বড় মোটা ডাবু নিয়া সাপের গাঙ্গাটা চিপিল। বসিল। আর যার কুন্টে? সাপটা আর নড়াচড়া করির পারিল নাই। আন্তে আন্তে বেইশ হয় সাপটা মরি গেলিল।

এতকিলা ঘটনা ঘটি গেলিল, চ্যাঙেটা কিছুই জানির পারিল নাই। উয়ার তখন গভীর ঘুমত্ পড়ি ছিল। কিছুক্ষণ বাবে উয়ার ঘুম ভাঙ্গি গেলিল। সেলা কেনা ভাটি হয়। আসিছে। তাতে আর রওনা হবার তানে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাড়াইল। টপলার তুলিবা যারা দেখা পাইল, কর্পুরের বটুয়াটা খোলা। তার গোড়াত্ মরা সাপ আর কীকড়া।

বালা আপারটা উয়ার ঘুমির পারিল। মনে মনে কীকড়াটাক্ উয়ার ঘনাবাদ জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল—মা বনি এই কীকড়াটাক্ না বিশেষ হয়, তাহলে আভি মুই এইটে দ্যাব হয়। গেনু হর”।

উত্তরদাতা: উত্তমসুয়ার রায়। কোতরাঙ্গী, জলপাইগুড়ি।

সঙ্গ্রাহক: সুব্রত দত্ত (দ্রাঘপারিক)।

নমুনা-২

“কীকড়া মনে: একটা সৎসার। মাও ও বোটা থাকে। একদিন বোটা মাক্ কহিল। মুই একনা বিশেষ বাবা। মাও

সেবিলক সাপারটা বুঝা পাশে। মনে মনে ঈশ্বরভট্টক ধন্যবাদ দিলে। আর মনে ভাবিল—যদি যদি এই ঈশ্বরভট্টক না নিল হয় তাহিলে মুই আইছা মারা গেনুই”।

উত্তরদাতা : পোবিল প্রাথমিক, বামজা, কালিগাঙ্গল, সারগঙ্গ,
উঃ বিনাক্তপুর। সংগ্রাহক : অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দেবগুপ্ত।

নমুনা-৪

“কঁকড়া সান্নী : একেনা পরিবার। পরিবারত্ মাও আর যাটা থাকে। একদিন চারোটা উয়ার মাক্ কইল—মুই আপনা বিদ্যাল্ বাইল। মাও কইল যাছে। মাওর মনত্ পূব আনন্দ। মাও কালক্ ডাকেনা কইল—মুই আশীর্বাদ কহেছ। তোর মনল য়েক্। কইল্যান য়েক্। কিন্তু একেনা কথা কও বাছ। বিদ্যাল্ একেলার একেলার যাইতে নাই তার তানে এই কঁকড়াটা বরিয়া আইনল। হিটাক্ তোর নগত্ নিয়া যাইল।

মাওর কথা শুনিয়া চারোটা পূব চমকিয়া গেছল। উয়ার উয়ার মাক্ গুড় করিল—এই কঁকড়াটাক্ নগত্ নিয়া তি হবে ? ভাছাড়া হিটাক্ মুই রাখিয়ে বা কুটেকেনা ?

মাও কইল—একেনা কহ কর বাটা। তোর বোঁচকার মগাৎ একেলার কপুতের কৌটা আছে। ঐটেকেলার তুই এই কঁকড়াটার নগত্ নিয়া বা।

চারোটা মাওর কথাডন সহ করিল। পরেরদিন বেলাটা ওঠিবার নগতে নগতেই মাক্ পোনমটা সারি কিল্য বাবার ধিল। হুইটতে হুইটতে উয়ার মেলা দূর পেল। দুপুরত্ বেলাটার তাপ বাড়িবার ধিল। রোনত্ যাটাখান হুইটতে হুইটতে চারোটা পূব হাঁপনিয়া গেল। যাটার কার ছিল লাইন লাইন করি গাহ। উয়ার মগাৎ উয়ার একেনা কড় পাছে হেঁরাং গসি পিল। দম নিবার ধিল। উয়ার যেহাটা শীতল হবার ধিল। আন্তে আন্তে উয়ার নিশিয়া পড়িল।

এপাক্ একেনা বিপদ খটি চারোটার ফেনা গভীর নিশিৎ আর চেমনা নাই সেলা কুইনটে থাকি একেনা বিরাট সাপ ব্যারে আসিল। কেনা ধরিয়া সাপটা চারোটার পাক্ আগোয়া আসির ধিল। বোঁচকার কাছত্ আসতে কেনাও সাপটা কপুতের বাসনা পাইল। সাপ কপুতের বাসনা বুঝি পছন্দ করে। উয়ার হেনং বাসনার নালচিয়া হইল। তারপর বোঁচকার ভিতর থাকি কপুতের কৌটা সাপটা বাঁড় করি কেবলি। তারপর কৌটাটা মাটিত্ টোকোবার ধিল। উয়ার আনা কৌটা বুনে কপুত ধাবে। মাটিত্ টোকোতে টোকোতে একেনা সর কৌটা বুনে গেল। আর ভিতর থাকি বেরাইল একেনা কঁকড়া। চারোটার মাওর দেওরা হিট কঁকড়া। কঁকড়া বেরাতেই উয়ার হুইটা বড় যেটা জবুয়া নিয়া সাপের টুটি চিপি ধিল। আর কুইনটে থার। সাপটা আর নড়িবার চড়িবার পাইল না। আন্তে আন্তে বোঁহ হরা যেচারা সাপ সরিহাই গেল।

এতলা কইত খটি গেল, চারোটা কুইট জীবিত্যার পাইল। উয়ার সেলা গভীর নিশিত্ ফেনা ছিল আতখান। পরেই উয়ার নিন্ ডালিয়া গেল। সেলা দেলাভটি হইয়া আইসে। সেইতনে আরও রওনা হয়ার তানে জড়াক্তি করে পাড়াইল। বোঁচকার তুলতে গিয়া দেখতে পাইল, কপুতের কৌটা খোলা। উয়ার কাছৎ মরা সাপ আর কঁকড়া।

সেলা ঘটনাটা উয়ার বুঝিবার পাইল। মনে মনে কঁকড়াকে উয়ার ধন্যবাদ জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল—মাও যদি এই কঁকড়াটা না দিত, তাহলে অতি মুই এটেকেনাস শাব হরা গেনু হার।”

উত্তরদাতা : বসেন্দর বর্মণ, বাগডিকাড়ি, হুগলিবাড়ি,
মোলিগঙ্গ, কোচবিহার। সংগ্রাহক : অশেষ দাস (সংবাদিক-
গবেষক)।

নমুনা-৫

“কাকড়া সান্নী : এ্যাকটা সংসার। মাওরে বাটাং থাকে। এ্যাকদিন বাটাটা মাওক্ কইল—মুই কবনক বিদ্যাল্ বাইল। মাও কইল—পূপে ভাল কথা। বাটা বিদ্যাল্ যাছে। মাওরের পূপে আনন্দ। মাও বাটাট ডাকেনা কইল—মুই আওকদি কহেছ। তমার মইছল হইক। কইল্যান হইক। কিন্তু একটা কথা কও বাপদি। বিদ্যাল্ এ্যাকেলার এ্যাকেলার যাইতে নাই। তারে বাসে এই কাকড়াটা ধরিয়া আনিল। ইয়াক্ তমার নগত্ নিয়া যাও।

মাওরের কথা শুনি বাটাটার পূপ আচড়িত নাগিল। উয়ার মাওরক্ পুছিল—এই কাকড়াটাক্ নগত্ নিয়া তি য়েবে ? ভাছাড়া ইয়াক্ মুই রাখিয়ে বা সেরে ?

মাও কইল—এ্যাকটা কাম কর বাপো। তমার বঁচকার কিতোর এ্যাকটা কপুতের ডিবিয়া আছে। এইটাত্ করি তুই এই কাকড়া সাবিক্ নিয়া যাও।

বাটা মাওরের কথা মডন কাজ করিল। পরেরদিন বেলা উঠে নগতে নগতে মাওক্ ডাক্তি করে বিদ্যাল্ রহনা হইল। হাটিতে হাটিতে উয়ার বন্ধুর পেল। দুহুয়া সেয়ের তাপ বাড়িবার নাগিল। রোনত্ যাটা হাটিতে-হাটিতে চারোটা বডত হাঁপশী নাগিল।

যাটার ধরিত্ ছিল সারি সারি গহ। উয়ার মাঝো উয়ার এ্যাকটা বড় গহের ছাওগাত্ বসি পড়িল। জিরিবার ধরলেক। গহের ছাওগাত্ হিমাল বাডাস অসিবার নাগিল। উয়ার যেহাটা হিমাল হবার নাগিল। আন্তে-আন্তে উয়ার নিশোত পড়িল।

হিগাংহ ঘটিল এ্যাক বিপদ। চারোটা বেলা গাঁড় নিশোত আন্তেডন, সেলা লেবে হাতে এ্যাকটা পরকণ্ড সাপ থিরিয়া আসিল। কানো ধরিয়া সাপটা চারোটার পাছে আগোয়া আসির নাগিল। ঈকটটার বগলত্ আসিতে সাপটা কপুতের বাসনা পাইল। সাপ কপুতের পূপে পছন্দ করে। উয়ার ঐ বাসেনাত্

আকৃষ্ট হইল। সেলা ঘটকর ভিত্তরে হাতে সাপটা কর্পুরের ডিবিয়াটাক্ নিকিলি ফেলাইল। সেলা মাটিত আঘাত মারিত ধরিল। উয়ার ইচ্ছা ডিবিয়া খসেয়া কর্পুর ধাবে। মাটিত আছড়াইতে-আছড়াইতে এ্যাক্ সমাই ডিবিয়াটাক্ ধসি গেল। আর তারে ভিত্তরে হাতে বিড়হিল এ্যাক্টা কঁকেড়া। কঁকেড়াটা বিরিয়ায় উয়ার দুইটা মোটা ডাবু দিয়া সাপের উটরা চিলি ধরিল। আর যায় কোঠে ? সাপ আর নড়া-চড়া করির পারলেক না। আত্রে-আত্রে বেশ হুয়া বেচারী সাপ মরিয়ায় গেল।

এতলা কাও খটি গেলিল, চ্যাড়োটা কেইই জানিবার পারলেক না। উয়ার সেলা খাচ নিশোত হিলো। কেতুকপ বাদে উয়ার নিশ ভালি গেলিল। সেলা বেলাটা জাতিত পড়িয়া আইসেছে। আরো রহনা হবার তানে তাড়া-তাড়ি উঠি মড়হিল। ঘটকটা অবোবার হায়া দেখিল, কর্পুরের ডিবিয়াটাক্ খুলা। তা বগলত্ মরা সাপ আর কঁকেড়া।

সেলা ব্যাকরটা উয়ার বুঝিবার পারিলেক। মনে মনে কঁকেড়াটাক্ উয়ার ধইনাবান জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল—মাও যদি এ্যাই কঁকেড়াটাক্ না দিলেক হর তাহলে আমি দুই এইটেটার শ্যাব হুয়া গেনু হার”।

উত্তরদাতা : হরগোবিন্দ রায়, মরনাওড়ি, জলপাইগুড়ি।
সংগ্রহক : প্রিয়কুমার চক্রবর্তী (সাব্যাসিক-লেখক)।

নতুন-৬

কঁকেড় সঙ্গী : ছোট্ সসোর। মাও বেটার গুজরান। একদিন বেটা উয়ার আইওক্ কহে। আই দুই কনেখ বিদ্যাল আইম্। উয়ার আই কহিল, বুব ভালো কথা। বেটা বিদ্যাল হাবে, মাওয়ের মনত্ আনদের সীয়া নাই। মাও উয়ার বেটাক্ ডাকে কহে। বাউ দুই আউর্দার কহেহ বগো তোর সন্মার মঙ্গল হৌক্। কিন্তু বাউ দুই একেটা কথা কহে। বিদ্যাল হাবে, একোয়ার বিদ্যাল হাওয়া না যার। তার মনে দুই একেটা কঁকেড়া ধরি আনিম্। তুই এই কঁকেড়াটাক্ নপং ধরিয়া যার। আইওর কথা শুনি চেসেরাটা আচম্ পাইল। উয়ার কহে। আই এই কঁকেড়াটা নপং নিদিয়া কি ছোবে ? আর দুই হিটাক্ কুঠে থুং ?

মা কহিল একেটা কাম কন্। তোর টপলার ভিত্তরেয়ত্ একটা ককুরের ডিবিয়া আছে। এঁটাং ডুরিরা তুই কঁকেড়াটাক্ নপং ধরি যার।

চেসেরাটা উয়ার মার কল্যামতন কাম করিল। পরের দিন কলসাহিত্তে বেলা উটার আগোত্ উয়ার মাক তাকি করিয়া বিদ্যাল রওরানা হৌল। হাঁটিতে হাঁটিতে উয়ার ককুর চলি গেল। দুকুরে বেলা বত বাড়ছে অদের তাপও তত বাড়ছে। এসোত্ পথ হাঁটিতে হাঁটিতে চেসেরাটা বড় নায়েকল হুয়া গরিল।

রাটার ধমিনাত্ আহিলো সারি সারি গছ। তার মইগো একটা বড় গছ দেখিয়া ছোয়াৎ বসি জিরিবার ধরিল। গয়ের ছেয়ার ঠাণ্ডা বাতাস আইসেছে, আতে উয়ার সেহা জুবাছিল, আত্রে আত্রে উয়ার নিশাত্ পাইল।

হিদি কি বিপন্। চেসেরাটা বেলা থবসন্ নিশোৎ পরিসে সেই সমাই একটা বিরাট সাপ কোঠে থাকি ভেনো আসিল। ভালা ধরিয়া সাপটা চেসেরাটার পাখে আইসেছে। টপলার গোয়েত্ আসিতে কালে সাপটা ককুরের গছ পাইল।

(বেটা উয়ার মাক ডেকার “আই” করিয়া আর মা উয়ার বেটাক্ ডেকার “বাউ” করিল)।

সাপ ককুরের গছ খুব ভালো পার। সাপটা ঐ গছের গোড়ে পাইল। তারপর টপলার ভিত্তরে থাকি ককুরের ডিবিয়াটা নিকিলি ফেলাইল। ডিবিয়াটা মাটিৎ ঠক্ঠকের ধরিল। মনে করিল ডিবিয়া খুলি গেলে ককুর ধাবে। ঐ নাহাতি ঠক্ঠকহিতে ঠক্ঠকহিতে ডিবিয়াটা বসি খুলিল তে ডিবিয়ার ভিত্তিরা থাকি নিকিলি গেল। চেসেরাটার আইওর সেওয়া ঐ কঁকেড়াটা। কঁকেড়াটা ডিবিয়ার উয়ার মোটা ডাবু দুইটা দিয়া সাপের গামোৎ চিহুটি ধরিল। আর যায় কুঠে ? সাপটা ধরপরা ধরপরিত করিবার পায়েক্ না। আত্রে আত্রে বেইল হুয়া বেছেরা সাপটা মরিয়ায় গেলিল।

এতলা কাও খটি গেলিল, চেসেরাটা কিছুই জানে না। উয়ার তো দারুন নিশোৎ পরিসিলো। অনেকল পর উয়ার বেলা নিন্ থাকি চেডেনা পাইল, সেলা ভাটিবেলা হুয়া গৈসে। তারেবামে উয়ার তারাভারি আরো হাবার তানে বেছেরা টপলটা ওঠেবার গেলিল তে বেছেহে ককুরের ডিবিয়াটা খুলা। তার গোয়েতে মরা সাপটা আর কঁকেড়াটা।

সেবার বেপারটা বুঝিবার সাপকো, আর মনে মনে কঁকেড়াটাকে ধইনাবান জানাইল। আরো মনে মনে ভাবিল, আইও যদি মোক্ কঁকেড়াটা না দিলেক হর, তাহোলে মোর বিদ্যাল হাওয়া বুয়েত্ খাউক্, দুই আমি এঁঠেকের মরি গেনু হইল হর”।

উত্তরদাতা : কামেশ্বর রায় (৩৫), সিঙ্গিয়ারী, মরনাওড়ি, জলপাইগুড়ি।
সংগ্রহক : অনেক দাস (সাব্যাসিক ও দরবক)।

নতুন-৭

কঁকড়া সোমর (ললত) : এমোডা সসোর। মা বেটার রহে। একদিন বেটোয়া মাক কহিল—দুই কনেখ বিশেলিত্ হাম্। মা কহিল বুব ভাল কথা। বেটা বিশেলত্ রহে। মার বুব খুলি। মা বেটাক্ কহিল—দুই বুভা দেখ্। তোর ভাল ছোয়। কিন্তু একটা কথা কহুৎ বেটা। বিশেলত্ একোয়ার, একোয়ার বাবা নাই। তাতে এই কাকড়াটা ধরে আইনম্। এইভা তোর লপত্ ধরে মা।

মার কৃপা তনে বেঁটা অকাল হয়ে গেল। অর মাক পুছিল—এই কাকড়াটা লগত লিগার কি হবে? আর এই ডাক মুই রানিধ কুঠে?

মা করিল—একটা কাজ করেক বাউ। ডোর টপলাডার ভিতরত একটা ককুরের ডিবা আছে। ঐ ডাক করে তুই ঐ কাকড়া ডাক সেনার করে ঘরে যা।

বেঁটা অর মার কাথামত কাজ কলে। দমরানিন বেলা উঠার সঙ্গে সঙ্গে মাক ছালাম করে বিসেশের মুখে রওনা হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে অর কলত পূর গেল। সোমোত রাত্তা বেড়াইতে বেড়াইতে ছুয়াডা খুব লটে গেল।

রাত্তার বগলত ছিল সারি সারি গছ। তার বিচত অর একটা বড় গাছের ছিয়াত বসে পইল। ভিরাবা থলে। গছের ছিয়া খানত ঠাণ্ডা বাতাস অসিবা বলে। অর শরীল ঠাণ্ডা হবা বলে। আত্রে আত্রে অর নিশায় গেল।

এইতি একটা বিপদ ঘট্ট গেল। ছুয়াডা যখন খুব নিশত পইছে, তখন কুঠেতে একটা বড় সাপ নিগিলে অসিল। জান নিগিলার সাপটা ছুয়াডার লগত অসিবা থলে। টপলাডার লগত অসে সাপটা ককুরের গন্ধ পাইল। সাপ ককুরের গন্ধ খুব পসন করে। টপলাডার তলত ডেকা সাপটা ককুরের ডিবাডা নিগিলার কেলাইল। পরে ডিবাডা মাটিত আছরাবা থলে। অর মন ডিকা খুসে ককুর বাবে। মাটিত আছড়াইতে আছড়াইতে একবার ডিবাডা খুসে গেল। এইবার অর ভিতর ডেকা নিগিলে অসিল একটা কাকড়া। ছুয়াডার মার সেওরা ঐ কাকড়া। কাকড়াটা নিগিলে অর মুঁটা বড় মটা ডেবু সেহেনে সাশের গালা ডিপে থলে। আর যাবে কেত? সাপ আর লড়া-চড়া করিবা পাইয়েনি। আত্রে আত্রে বেকল হর হেনে চেড়াতি সাপটা হঠাৎই গেল।

এতলা কইও ঘট্ট গেল, ছুয়াডা কিছুই জানিবা পাইয়েনি অর সেলা খুব নিশত পইছিল। এক ঘুড়ি পর অর মিন্ ডাসে গেল। সেলা কেলোচটি হইছে। অর আরহ রনা হবার তানে ডাড়াডাডি উঠে ধার হইল। টপলাডা অঠবা যার হেনে সেখেরে ককুরের ডিবাডা থলা। অর গোরত মরা সাপ আর কাকড়া।

সেলা খাপারটা অর বুকা পাইল। মনে মনে ককড়া ডাক অর দুহা বিলে। আরহ মনে মনে করিল—মা যদি এই কাকড়া না দিলে তাহিলে মুই আছি এইটে শেষ হয় সেনু হর।

উত্তরদাতা : তৈরবটকিন আমেন (৪৭), গ্রাম—ডোলাপাড়,
ডাকঘর—সাহেবপাড়, থানা—কাকড়া, জলপাইগুড়ি।
সংগ্রহক : ধীরেন দাস, মহিষল ইন্সটিটিউট ও সুলাইমান
(শিক্ষক), সুখানী ডোলাপাড় হাই ময়দা।

নব্বা-৮

“কাকড়া সোসের : একটা সসোসেত। মাও আর কৌ রর। একদিন চেড়াটা উয়ার মাক কইল মুই কনেক বিশেল

হইম। মাও কইল বিশেল ভাল কথা। বেটা বিশেল যাকে, মার বিশেল জলদ। মাও বেকেরে ডেকেরা কইল। মুই জাসুরবাদ কন ডোর জর যোক। ডায়েলা সোক কিত্ত একটা কাথা কও বাপ। বিশেল একেলার মাওয়া নাজর। তারে যাবে ঐ কাকড়াটা ধরিয়া অনিন্দু। ইয়াক তুই নগদ নিখালে।

মাওয়ের কাথা শুনিয়া চেড়াটা বিশেল হইপোত পইল। উয়ার মাক পুছিলেক—হিটা কাকড়া ক নগদ নিখা কি যোবে। তা বাসে ইয়াক মুই ধুইলেক না কোঠে? মাও কইল একটা কাকড়া কন বাপ। ডোর গারিতির ভিতোর ককুরের ডিবিয়া আছে। এটাতে করিবা তুই এই কাকড়া সোসের ঢাক নিগ।

চেড়াটা মার কাথামত কাজ করিল। পরেদানিন কেল উঠিবার গোরে গোরে মাক ভক্তি বিধা বিশেল যাত্রা করিল। হাটিতে হাটিতে উয়ার অনেসর গেল। দুপুরে সোমোত মাছ বারিবার ধরিল। ওমোড পথ হাটিতে হাটিতে চেড়াটা বিশেল হাবুড়ি গেইসে। শবেধ ঘরিত আছিলো নাইন নাইন গছ। উয়ার ভিতোর একটা বড় গাছের ছেওরাত বসি পইল। ভিবিবার ধরিল। গাছের ছেওরাত হিয়াল বাতাস অসিবার ধরিল। উয়ার সেবা বাগোতি চরিল : ধিরে ধিরে উয়ার নিশেত পইল। বিশাখে একটা অঠোন বসিল। চেড়া বেলা বিশেল নিশের ঘোরাবৎ সোমোত সেটে হাটে একটা ডাকের সাপ বিরিয়া অসিল। যান ধরিয়া সাপটা চেড়াটার পাখ আগেরা অসিবার ধরিল। গারিতির গোরাড অসিয়া সাপটা ককুরের কসেনা পইল। সাপ ককুরের কসেনা বিশেল ভাল পায়। উয়ার ঐটা কসেনাড কাতয়াল হইল। তার পাছোত গারিতির ভিতোর হাটে ককুরের ডিবিয়া সাপটা নিকিলি কেলাইল। তার পাছোত ডিবিয়াটা মাটিত আছেরে বার ধরিল। উয়ার কসেনা ডিবিয়া খুসিয়া ককুর বাবে। মাটিত আছেরাইতে আছেরাইতে এক সমাই ডিবিয়াটা খুলি গেল। আর উয়ার হইখা হাটে বিরিয়া অসিল একটা কাকড়া। চেড়াটার মাওয়ের সেওরা ঐ কাকড়াটা। কাকড়াটা বিরিয়ার উয়ার মুঁটা মোটা ডাবু মিল্ল সাশের টেরা চিনিয়া ধরিল। আর যার কুঠে? সাপ আর ধরপড়া ধরপরি করিবার পাইয়েনি। ধিরে ধিরে শিলা হারেরা বেচেরা ধরিয়া গেল।

এতলা কাও ঘটটি গেল চেড়াটা কেনুই জানিবার পারিল না। উয়ার সেলা নিশের ঘোরাবৎ মাতিয়া আছিলো। কনেক পরে উয়ার মিন্ থেলা ভক্তিয়া গেল। সেলা বেটা ডাটিং পরিছে। তা বাসে আরো বাবার নাগিবে। তারাতারি উঠিয়া থারা হইল। গারিটিটা অঠেবার যাত্রা সেধির পাইল ককুরের ডিবিয়াটা থলা। উয়ার গোত্রোত মরা সাপ আর কাকড়া। সেলা ঘনিয়াটা উয়ার মুক্তি পাইল। মনে মনে কাকড়াটাক উয়ার আসুরবাদ জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল মাও যদি এই কাকড়াটাক না দিল হর তাহিলে আছি মুই এটোটা শেষ হয় সেনু হর।

উত্তরদাশ : চৈতন্যসেব রায়, গ্রাম-পেটকাটি, ডাকঘর-
মহনাওড়ি, জিলা-জলপাইগুড়ি। সংগ্রহক : শ্রীরত্নসুন্দর
চক্রবর্তী (লেখক ও সাংবাদিক)।

নমুনা-৯

“কাকড়া সঙ্গী : একটা সন্সার। মা ও ছেলে থাকে।
একদিন চ্যারেটা হাফ কইল মূই কনেক বিশেষ মাইম। হাও
কইল—খুব ভাল কথা। ছাওরাটা বিশেষ বাবে। মার খুই
আম। হাও ছাওরাটাক ডাক কইল মূই আশীর্বাদ করিনু। তোর
মঙ্গল হইক্। কল্যাণ হইক্। কিন্তু একটা কথা কহো বাপেই।
বিশেষত এ্যাকলা এ্যাকলা বাবার নানাখে। তার কইনো এই
কাকড়াটা বরি অনিনু।

মাওরের কথা শুনিয়া চ্যারেটা অবাক হইল, উজোর হাফ
পুছিল—এই কাকড়াটাক নগল নিয়া কি হবে ? আর মূই এইটা
খুইমবা কেটে ?

মা কইল একটা কাম কর বাপেই। তার বোচকর ভিতর
একটা কর্পুরের কৌটা আছে। এটার মধ্যেই তুই কাকড়াটা
সাখিচতে নিয়া যা।

চ্যারেটা মার কথাযতন কাম করিল। পরেরদিন বেলা
উঠিতে উঠিতে মাক্ তত্তি করিয়া বিশেষ রঙনা হইল। হাঁটিতে
হাঁটিতে উজোর অনেক দূর গেলিল। মধ্য বেলায় সুঘেরে তাপ
বাড়ছে। বৌসেত আত্মা হাঁটিতে হাঁটিতে চ্যারেটা খুব ক্লান্ত
হইয়া পড়িল।

আত্মার ধারত ছিল সারি সারি গছ। তার মাক্ত উজোর
একটা বড় গাছের ছাওরায়া বসিল। বিশ্রাম নিবার লাগিল।
গাছের ছাওরায়া ঠাণ্ডা বাতাস আসির লাগিল। উজোর সেবা হিম
হবার নাগিল। ধীরে ধীরে উজোর নিন পেলেক।

এদি একটা বিশপ খটিল। চ্যারেটা যখন খুব নিমত
বেল, সেলা কেটে থাকি একটা বিরাট সাপ বিরি আসিল।
মনা বরিয়া সাপটা চ্যারেটার লিকত আনি আসির লাগিল।
বৌসেতর বগলত আসিরা সাপটা কর্পুরের গছ পাইল। সাপ
কর্পুরের গছ খুই পছন্দ করে।

দি এ গছত খুব আকৃষ্ট হইল। সেলা বৌসেতর ভিতর
থাকি কর্পুরের কৌটা বাহির করিল। তারপর কৌটাটা মাটিত
আছড়াবার লাগিল। উজোর ইচ্ছা কৌটা খুলিয়া কর্পুর বাবে।
মাটিত আছড়াইতে আছড়াইতে কৌটাটা খুলিয়া গেলিল। আর
তার ভিতর থাকি একটা কাকড়া বিরিয়া আসিল। চ্যারেটার
মাওরের সেবায় সেই কাকড়াটা বিরিয়াই নিজেব দুইটা বড়
মোটা ঢানু নিয়া সাপের গালা চাপি ধরিল। সেলা বাবে কেটে।
সাপ আর নাকড়াটাক করিল পাড়িল না। আত্মে আত্মে কেবল হস্ত
কোন্না সাপ মরি গেলিল।

এতলা কাও ঘটি গেলিল, চ্যারেটা কিছুই জানির পাড়িল
না। উজোর তখন লক্ষল নিমত আছিল। কনেশাপ উজোর নিন
ভাকি গেলিল। সেলা বেলা পড়ি গেলিলে। তারকইনো ফির যাবার
বাসে বরগর করি উঠি দাঁড়াইল। বৌসেতর আত্মেবার মারা
হেলিল, কর্পুরের কৌটাটা খুলা, তার শাপত মরা সাপ আর
কাকড়া।

সেলা বাপারটা উজোর মূনির পাড়িল। মনে মনে উজোর
কাকড়াটাক বনাবাদ জানাইল। আর মনে মনে ভাবিল মাও বনি
এই কাকড়াটা না দিলেক হর, তাহলে আকি মূই এই টেকেনায়
শেব হনু হর।”

উত্তরদাশ : রামকৃষ্ণ রায়, ২৫, পাইলারপাড়া, কালিরহাট,
শুশওড়ি, জলপাইগুড়ি।

নমুনা-১০

“সোসর কাকড় : একটা সন্সার। মারা আর বৌরা
বহচে। একদিন বৌরা মারাক কোহল মূই বিশেষ আম। মারা
কোহল খুব ভাল কথা। বৌরা বিশেষ আসে। মারার খুবে
অনেশ। মারা বৌরাক ডাকর কোহল মূই আশীর্বাদ করহু।
তোর মঙ্গল হোক। খুব ভাল হোক। কিন্তু একটা কথা কহহু
বৌটা। বিশেষত একলার একলার জাবা নাই। তাতে এইরা
কাকড় বরিয়া অনিচ। এইরাক তোর সঙ্গে লিরা লেগা।

মারার কথা শুনিয়া বৌরার খুবে আশ্চর্য লাগিল। অর
মারাক পুছিল—এইরা কাকড়ক সঙ্গে লেগার কি য়েবে ? আর
অক মূই শ্রমিম কে বা কেনঠে ?
মারা কোহল—একটা কাম কর বৌটা। তোর কলসায়ত
একটা কেকুরের ডাফা হে। ওই রাতে তোর কাকড় সোসর টাক
লিরা লেগা।

বৌরা মারার কথাযতন কাম করিল। পরের দিন সূর্য
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মারাক ভক্তি লিরা বিশেষ রঙনা দিলে।
বৌরাহিতে বৌরাহিতে অর অনেশুর গেল।

মূই পহরত রাউসের তাপও বারিযা লাগিল। রাউসত
বৌরাহিতে বৌরাহিতে অর খুব ক্লান্ত হর গেল।

মারার বগলত ছিল সারি সারি গছ। অরে মধ্যে অর
একটা বড় গাছের ছায়াত বসিয়া পড়িল। খিরিয়া লাগিল।
গাছের ছায়াত ঠাণ্ডা বাতাস আসিবা লাগিল। অর মেহুরা ঠাণ্ডা
হবা বরিয়া। অরে আত্মে অর নিশার গেল।

আর ইতি একটা বিশপ হেল। অর য়েইবেলা পুরা নিশাযা
ধইচে, সেলা কেনঠে তক একটা বিরাট সাপ নিকিলিয়া
আসিল। কণা ঊঠার সাপটা অর তি আশায়া আসিবা ধরিল।
বচলরার লগত আশিতে সাপটা কেকুরের গছ পাল। আর
সাপ কেকুরের গছ খুব ভাল বাসেচে। অর এ গছত আকৃষ্ট
হেল। তারপরে বচলরার ভিতর তক সাপটা কেকুরের

ডাবারা নিকিয়ায় কিলার। তারপরে ডাবারা মাটিও ঠুকিবা গরিল। অর ইচ্ছা ডাবারা খলার কেন্দুর খাবে। মাটি খানত ঠুকিতে ঠুকিতে এক সময় ডাবারা খুলিয়া গেল। আর অর ভিতরভর নিকিলিয়া আসিল একটা ককড়। চেংরারার মারা নিসিলো এইরা ককড়। ককড়টা নিকিলিয়ার ওর বড় মটা টেলো দিয়া সাপের গালায়া তিলিয়া গরিল। আর হাবে কেনটে ? সাপটা আর লরিবার পালনি। আরে আরে ফেল হবা বেচার সাপটা মরিয়ায় গেল।

এতেলা ঘটনা ঘটি গেল, চেংরারার কিছুই বুঝিবা পালনি। সেলা অর পুরা নিশিবা ধইচিলো। অনেক পাছত অর নিন ডাসি গেল। সেলা প্রার সান হবা ধইচে। তাহেনে আরও খাবার ডানে তারাতারি উঠিল। বোচকরা অরবার সময় দেখিল, কেন্দুরের ডাবারা খলা। অর বলত মরা সাপটা আর ককড়টা।

সেলা অর ব্যাপারটা বুঝিবা পাল। আর মনে মনে ককড়টাক বনাবাদ নিল। আর মনে মনে ভিনা করিল মারা যদি এইরা ককড় মি ভিল হয়, তাহলে আজি মুই এইটে শেষ হর গেলু হর”।

উত্তরশাভা : শ্রীমতী চুমনি রায়, বীরসিংহ জ্যোত, ডাক্তর-হাতিবীরা, দাখিলিং। সঙ্গীতক : শ্রীঅসিত রায়, হাতিবীরা, দাখিলিং।

সৌন্দর্য : তুষার বাগদি, নিলিওডি।

নমুনা-১১

“ককড়া সঙ্গী : একটা পরিবার আছিলো। মাও আর ছাগলা থাকে। অ্যাকনি ছাগলাডা হায়েক ক’ল—মুই অ্যানা বিলাশেৎ যাদু। ব্যাঝার ভাঙ্গো কথা রে বাপু। ছাগলা বিলাশেৎ বাহে। মায়ের খুব আনন্দ। মাও ছাগলাসোক ডাকে ক’ল—মুই আশীর্বাদ করছি। তোর ভাল হোক। কল্যাণ হোক। কিন্তু বাবা। অ্যাকটা কথা কহি। বিলাশেৎ একটা একটা বাওয়া ঠিক নয়। তাই এই ককড়টা ধরে আনিচ্ছি এতাক তোর সঙ্গে নিয়ে যা।

মায়ের কথা শুনে ছাগলাডার খুব অবাক নাগল। এই মায়ের পুঙ্ল এই ককড়টা সাথে নিয়ে কি হবে ? তাহাড়া মুই অ্যাক সাগরু কুঠে

মা ক’ল—অ্যাৎ কাম কর বাবা। তোর বোচকর মনো অ্যাকটা ককড়ের কোটা আছে। তার হবো এই ককড়টা সাথে করে নাও। ছাগলাডা মায়ের কবামত কাম করল। পরের দিন সূর্য উঠা সাথে সাথেই মায়ের পাহার করে বিলাশেৎ রওনা হল। ঈর্ষতে হাঁটতে অই অনেকদূর গেল। হুপুরে সূর্যের তাপ বাত ২৭ নাগল। রোদের মধ্যে রাজা হাঁটতে হাঁটতে ছাগলাডা ক’ এলাকায় হর গেল।

রাজার বগোত আছিল সাথে সাথে পাহা। তার মধ্যে অই অ্যাকটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পড়ল। বিক্রাম নিবার নাগল। গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাস আসবার নাগলো। অর শরীরটা ঠাণ্ডা হবার নাগলো। আরে আরে অই খুশিতে পল।

এদিক একটা বিশদ ঘটল। ছাগলাডা যখন খুব খুশিতে পড়িছে তখন কুঠে থাকে একটা বড়কা সাপ বাড়ারে আসল। মনো খুশিতে সাপটা ছাগলাডার দিকে আগারে আসবার নাগলো। বোচকর ক’হে আসতেই সাপটা ককড়ের গল পাগলো। সাপ ককড়ের গল খুইই ভালবাসে। অই ঐ গলে অকুট হল। তারপরে বোচকর ভিতর থাকে ককড়ের কোটা সাপ বর করে ফেলল। তারপর কোটা মাটিও ঠুকবার নাগল। অর ইচ্ছা কোটা খুলে ককড় খাবে। মাটিও ঠুকতে ঠুকতে অ্যাক সঙ্গে কোটা খুলে গেল। আর তার মধ্যে থাকে বাড়ারে আসল অ্যাকটা ককড়। ছাগলাডার মাও নিলে ঐ ককড়টা। ককড়টা বাড়ারেই অর খুশা বড় মেটা দাঁড়া দিবে সাপের গলা চাপে ধরল। আর মার কুঠে। সাপটা আর নড়বার চড়বার পারল না। আরে আরে ঐল হায়াবে বেচার সাপটা মরেই গেল।

এত বি ব্যাপার ঘটে গেল, ছাগলাডা কিছু টেরই পালো না। সে তখন ব্যাঝার খুশে চুবে আছিল। বানিকশ পর অর খুশ ভাবে গেল। তখন কেনা গড়রে গেছে। সেজনো আবার রওনা নেওয়ার জন্য তাড়াতড়ি উঠে দাঁড়াল। বোচকরা তুলবার নাগে দেখবার প্যলো, ককড়ের কোটা খেলা। ওজার পালে মরা সাপ আর ককড়া।

তখন অই ব্যাপারটা বুঝবার প্যলো। মনে মনে ককড়াডাক অই বনাবাদ নিল। আর মনে মনে ভাববার নাগল—মা যদি এই ককড়াটা না লিত, তাহলে আজ মুই এটিই খ্যাস হয়ে গেলু যিনি”।

উত্তরশাভা : ডঃ নাথান্যেলি যোব, সন্তোষ : রাজবংশী, এলাকা : খুমপুর, ধানা : হরিবপুত্র, জেলা : মালদহ। সঙ্গীতক : ডঃ পুণ্ডিক রায়।

নমুনা-১২

“ককড়া সাহস : একটা সঙ্গের। মার ব্যাটার কাকে। একনি ব্যাটা মাওক কইল—মুইএ খানেক বিলাশ হাইম। মাও কইল—খটর ভাল কথা। যদি বিলাশ খাবার নইগতে। মাও খটর আনন্দ। মাও ছাগলাডা ডাকে কইল—মুইএ আওরবাদ দাও। তোর মন হউক। রইলাল হউক। কিন্তু এ্যাকনো কথা কও বাও। বিলাশেৎ এ্যাকলার খাওয়া ঠিক না হর। সেইমো এই ককড়া কেনাক বরি আনচুও। ইলাকু তোর সূনার নিয়া বা।

যার কথা শুনি চাওরাকেনা টাস্ক খাইল। উজ্জয় মাওক পুঁহি—এই কঁকড়াকেনাক সাথোং নিলে কি ইহবে ? তা বাসে ইরাক দুইএ খোঙ-এ বা কেনটে ?

মাত কয়—এক কামাই কর বাও। তোর টোপোশোর ভিত্তিয়া এটা কল্পুরের টেমি আছে। উত্তরে করি তুই এই কঁকড়া সাধুয়াক নিয়া যা। ছাওরাকেনা যা'র কথা মতে কামাই করিল। পাছানি ব্যালা উঠার সঙ্গে সঙ্গে মা'কে ভক্তি বিয়া বৈশাল বুলি রওনা গিল। হাইইতে হাইইতে উজ্জয় ভাল পুর গেলিল। দুপুরা ব্যালার স্নায় চড়ি যাবার বলিল। রউসোং খাটা হাইটতে হাইটতে চেতরাকেনা খউব ব্যালঙে পড়িল।

খাটার বংলোং'আলু সায়ে সায়ে গহ। তারে ভিত্তিয়া একটা বড় পছের ছেঁচাং বসি পইল। জিরি নিবার বলিল। পরের ছেঁচাং সাতা হাওরা অঙ্গুরি বলিল। উজ্জয় গাও ছাঙ-ছাঙ হবার বলিল। আন্তে আন্তে উজ্জয় নিশোং পইল।

ইনি এক বিপদ বাসিল। চেতরাকেনা ব্যালা বোর নিশোং অচেতন, স্যারা কেনটে থাকি ভাসার একটা সাপ বিরি আসিল। ক্যাবেছান বরি (ক্যাজন) সাপটা ছাওরাকের ভিত্তি আগবায়ের বলিল। টোপোশোর গারকেনা আইসা ময় সাপটা কল্পুরের নোখো পাইলেক। সাপ কল্পুরের গোদো খউব ভাল পায়। উজ্জয় ঐ গোদোতে ভোর হরয়া গেলিল। তার পাছোং টোপোশোর ভিত্তিয়া থাকি কল্পুরের টেমিটার সাপটা বিয় করি ফালসিল। কিন্তু টেমিটার মাটিং খেবু পোরার ধরিলেক। উজ্জয় হালিাম, টেমিটার খসো কল্পুর বাইবে। মাটিং খেবগাইতে খেবগাইতে একসমে টেমিটা বসি গেলিল। আর টেমির ভিত্তিয়া থাকি বিরি আসিল একটা কঁকড়া। চেতরাকের মাও'র সেওয়া ঐ কঁকড়া। কঁকড়াটা বিয় হওরা ময় উজ্জয় দুইটা দীঘল ঠাকলাইপাড়া ডেমু বিয়া সাপের গালা চ্যাপ্টে বলিল। আর ব্যা কেনটে ? সাপ আর নড়ানড়ি করির পায়রে না। আন্তে অময় ম্যাতো পড়ি বেওয়া সাপ মরি গেলিল।

একুলা কত খটি গেলিল, চেতরাকি কিন্তু কিছুই জানির না পইল। উজ্জয় স্যারা ময়র নাকুন করি বোর নিশোং পড়ি আইল। কনেক বায়োং উজ্জয় সিন ভাসি গেলিল। স্যারা কো ভাটি পইলেক। সেইবাসে আরও রওনা মিবার মনে খড়খড় উঠি খাড়া হইল। টোপোশো তলভিয়ার সঙ্গে খেলি কল্পুরের টেমিটা বস। ওটার বংলোং ময় সাপ আর কঁকড়া।

স্যারা উজ্জয় ব্যাপারটা বুঝিবার পাইলেক। মনে মনে কঁকড়াটার উজ্জয় সাযসি মিলেক। আর মনে মনে ভাবিল—মাও বসি এই কঁকড়াটাক না মিলেক হর, দুইএ আছি এটিকেনার শ্যাব হু হু”।

অনুবাকক : মিনোংবিদ্যারী বর্ম, পূর্ব বিবেকানন্দ পট্টী, শিল্পী : প্রোফঃ অশোব দাস (সাময়িক-দেবক)।

*পূর্বে উল্লেখিত জনৈক অনুবাদকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে সংযোজিত হল :—

অন্য কোন জাতব্য—পুরাণ ও ইতিহাস-খ্যাত প্রাচীন কামরূপ/কামতা রাজ্যে কামতাপূর্ববাসীদের উন্নত সাংস্কৃতি ও ভাষা ছিল। আন্তঃরাজ্যের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যেরবারে কামতাবাষার গুরুত্ব ছিল খুবোই। উত্তরবঙ্গ সমিহিত নেপাল রাজ্যেরবারে প্রাপ্ত অনুমিত দশম-দ্বাদশ শতকে রচিত চর্যাপতির ভাষা ও পটভূমি এ অঞ্চলের ভাষা ও পরিবেশের প্রতিচ্ছবি। বৈক্য ও ভক্তিযুগে সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মশ্রিতির ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অসম, পৌড়, মণ্ড, মিথিলা, কোশল ইত্যাদির শীতি-কবিরাজ যে লোকভাষার ভাসের মত লিখিবদ্ধ করে দেখেন তার সাথে কামতা ভাষার নিকট সাধুবা সহজোই বোকা যায়। খ্রিস্টীয় ১৫৫৫ সালে অশোমসমাজ হু কাম-জ-কে লেখা বেহার অবিগতি নরনারায়ণের পরমর্শনিকে বাংলাভাষার লিখিত প্রথম দল-সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বরা হয়। খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের সুবাদে কলকাতা ও সমিহিত অঞ্চল রাজনীতি ও শাসননীতির সীতস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা তথা বাংলাভাষার নবজাগরণের সূচনা হয় এবং কালক্রমে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠিত ভাষার মর্যাদা লাভ করে। প্রকরণময় কামতাবাষা নির-অসমের পরম, কামরূপ, গোয়ালপাড়া, অধুনা পশ্চিমবঙ্গের ছটি জেলা (উত্তরবঙ্গ), বাংলাসেতের রঙপুর, মিনাজপুর, নেপালের বীপা, মোরম এবং পশ্চিমবঙ্গ সমিহিত বিহারের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের লোকভাষা হিসেবে সীতিত হয়ে পড়ে। ভাঙও পরে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের কলে কামতাবাষা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সেখানকার আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। প্রিয়রসন সাহেব এই ভাষার বৃত্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একে রাজবন্দী উপভাষা নাম দেন। ডঃ সুশীতিবুদায় চট্টোপাধ্যায় বলেন, এটি বাংলার প্রাচীন কামরূপী উপভাষা। কিন্তু অসমীয়া ভাষার আধিপত্যও কামরূপ-কামতায় ভাষার মধ্যে মিহিত। শব্দ-বৈচিত্র্য, ভাবপ্রকাশের সারলীলতা, আলাকোরিক সন্ধিতে পূর্ণ এই ভাষার গবেষণার অনেক সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

—বিনোদবিহারী বর্ম

এখানে সন্তোঃ ক্ষেত্র সমীক্ষা-সঙ্ঘ উপমাগুলি থেকে পাঠক সহজোই দেখতে পাবেন যে এই গল্পটির যে অনুবাদগুলি এখানে উপস্থাপিত হল তা বৃত্তে বাজলি পাঠকদের ভেতন অনুভবিতা হয় না। এর চেয়ে কঠোর হত যদি আমি এখানে কল্পবাক্যের বা পুঙ্খলিয়ার দুটি প্রাকলিক ভাষার অনুমিত নমুনা সন্তোঃ কর্তৃত্বম ত্য বৃত্তে।

বিত্তিরত, এখানে যে রাজবন্দী সম্মেলনের সোফের সুখের কথা তুলে আনা হয়েছে তাও স্থানভেদে ও উচ্চারণভেদে

অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন। এটাই স্বাভাবিক। এবং আঞ্চলিক ভাষা সমীক্ষায় পৃথিবীতে সর্বত্রই এমন ধরনের উদ্ভব পাওয়া যায়।

কৃত্রিমত, এখানে উদ্ভবের সঙ্গে একটি চিহ্নি জনক হত্যের উদ্ভবগত হয়েছেন। এ জনক ভাষে বন্যের জ্ঞানই। তিনি পরিভার করে তার মত বলেছেন।

তার মতের পাশে আমি বিনয়ের সঙ্গে আমার মত উপস্থাপন করি। কারণ সুস্থভাবে আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-বুদ্ধি, ভাষাব্যবহার ও শ্রীতির সম্পর্কে পাঠে দলিত পরিগ্রহ মানুষের মধ্যে মিলনের রাস্তা পরাতে। যাতে বাধা দেয় জ্ঞানার্হ, মালিক আর বিশেষী প্রভৃতি। দলিত-পরিগ্রহের আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, দাঙ্গা আর অশ্রীতির প্রসার তা নিবৃত্ত জননীকে আর জেগায় না।

শ্রীবিদ্যোদয়বিহারী বর্মা বলেছেন—কমতাপুরী, ভাষা বাংলাভাষার আদিরূপ চর্চাপথে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুপণ্ডিত অক্ষকুমার শিকদার লিখেছেন, "কমতাপুরী আঞ্চলিকের কেন্দ্রেও রয়েছে ভাষা। কলা হচ্ছে, এই ভাষা বাংলার চেয়ে পুরনো, চর্চাপন কমতাপুরী ভাষায় লেখা, কেন্দ্রবিহার রাজা নরনারায়ণের চিত্রটি বাংলার নয়, কমতাপুরীতে লেখা। কমতাপুরী বাংলার কেন উপভাষা বা বিভাষা নয়, একেবারেই স্বতন্ত্র ভাষা।

প্রথমত, চর্চাপন যখন লেখা হচ্ছিল, তখন পূর্ব ভারতের ভাষাগুলি একেবারে স্বতন্ত্র চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন তাদের সাথে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাষার লক্ষণ ছড়ানো ছিল। তাই সুবীড়িকুমারের মতো ব্যক্তি পণ্ডিতেরা চর্চাপনকে বাংলার আদিরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন, রাঙ্গাল সাংস্কৃতিকার হিমির আদিরূপ, ওড়িরা পণ্ডিতেরা ওড়িয়ার, অসমীয়া পণ্ডিতেরা অসমিয়ার আদিরূপ বলে দাবি করেছেন। কমতাপুরীকেও দাবি যোগে হওয়ার নতুন কিছু নেই। —যাকে মান্য গ্রাম্যিক বাংলা বলি, যাতে বইপত্র, খবরের কাগজ লেখা হয়, বেতার, টিভিতে কথা কলা হয়, সেই বাংলার শতকরা দশভাগ ব্যঙলিও কথা বলে কিনা সন্দেহ। ব্যক্তি ব্যক্তির পক্ষে এই মান্যবাংলা বিতরণ ভাষা, শিখে নেওয়া ভাষা। যে রাজবংশী মানুষ ব্যক্তিই কমতাপুরী, কমরূপীতে কথা বলেন, তিনিও রেডিওতে মান্যবাংলা সোনেন, বইতে, খবরের কাগজে পড়েন। বাকুলা, পুন্ডলিয়া মালদার ব্যক্তির সঙ্গে রাজবংশী ব্যক্তির পরিচিতির এই ব্যবসে কেন পার্থক্য নেই।"

আজ তাই মীরভানে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভাষার প্রশ্ন সামনে এনে রাজবংশী সম্বোধকেরা যে আত্মস্বাধীন পথে যাচ্ছেন তাতে কার লাভ হবে। প্রথমত, বিহারের মতো আবৃত পৃথিবী। উন্নত ভাষাগুলিই তার স্বাভাবিক স্রাবতে পারছে না। এত

ভারতীয় ভাষাকে মারসমুদ্রে গিলে ফেলেও হিমি ডাক হিংসারী নামক এক জগদ্বিদ্ভি ভাষার রূপ নিচ্ছে। হিমি সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ হচ্ছে না। কোটি কোটি রূপায়ার বিনিময়েও নয়।

বাংলা বাংলাদেশের সৌভাগ্যে আজ আন্তর্জাতিক ভাষা। তবুও তাতে দিতে থাকতে হচ্ছে বিদ্যালয় পাঠ্যে আর সাহিত্যের পাঠ্যে। বিজ্ঞানে-অনিজ্ঞা-প্রযুক্তিতে স্থান করে নিতে পারছে না। সেখানে কমতাপুরী অতল সিদ্ধ থেকে উঠে এসে সভ্যতার ধ্বংস উড়ায়ে—এ স্বপ্ন, দিবা স্বপ্নও নয়।

আর উত্তরবঙ্গে কেলে রাজবংশী নয়, এখনও বালোচরাই শতকরা ৯০ ভাগ। তার ৩০ ভাগ বাক গেলোও যে ৬০ ভাগ থাকে তাদের কঠোর একত্রিত হলে সমুদ্র বিপদে পড়বে কমতাপুরীরা। দ্বিতীয়ত, সুস্থতা যারা চান এমন রাজবংশীরা তো এই বিশিষ্টভাষা সান্ন্যাস্ত্র আর সান্ন্যাস্ত্রবংশী মানবের চক্রান্তে পা দেবে না। মানুষকে কথা বলতে শুদ্ধ করলে অক্ষকরের যে চুক্তি তা কিন্তু কলপ্রসূ হবে না।

অন্য প্রসঙ্গ

এখানে আর যে বিবরণগুলি আসছে তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের উত্তরবঙ্গের প্রশ্ন আছে। এখানে আমি বৃত্ত করতে চাই উত্তরবঙ্গের দলিত মানুষের উত্তরবঙ্গের প্রশ্ন। যার মধ্যে পড়ে ডাকসিলি (রাজবংশী, নম্রুত সহ অন্যান্য সম্ভার) জাতি, উপজাতি (সাঁওতাল, ওরাও, বুড়া, বোড়া, লেপচা, রাভা ভুটিয়া, বুণ্ডি, শবর, কোরা, চোটা, ভুবিজ, ভোগবি ইত্যাদি), দলিত মুসলিম, খ্রিস্টান সহ অন্যান্য অনগ্রসর সম্ভার।

তাদের অনুভূত অবস্থার কথা বিবেচনা করে ঢাকুরি ও শিখার অবিকারার সরেকল দেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।

আমার জানা একটি তথ্য আছে তার উল্লেখ এখানে আমি করতে চাই—সে হল ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকসিলি জাতি-উপজাতি উন্নয়ন কমিশনের পক্ষ থেকে শীতকালে একটি টিম উত্তরবঙ্গে সত্তাবহুদে পরিভ্রমণ করেন। যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত ডায়েরেক্টর বি কে বিশ্বাস, আই এ এস : সারা ভারত জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান ডেভন জামি, লাধাফের সদস্য লামা লামা জা, জাতীয় পরিষদ এম এ চৌধুরী, আই জি শ্রীমিহ সহ অন্যান্য উচ্চপদাধিকারীরা।

তাঁরা সুশাশন করেছিলেন উত্তরবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জন্য অবিক (কেহেতু জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এস সি/এস টি)

সংখ্যক সরঞ্জাম। এস সি সি/এল টি সি সহ অন্যান্য প্রকল্পে
অনিক সক্রিয়তা ইত্যাদি।

এ তো তাঁদের সুপারিশের প্রশ্ন মাত্র নয়, কারণ যদি
ভারতে কংগ্রেস যে ক্রিস বছর শাসন করেছে তার মধ্যে
উত্তরবঙ্গে একমাত্র একজন কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। না
হলে পরিবারের উন্নয়নে তেমন কিছুই করা হয়নি।

এ কথা ঠিক যে তখন অকণা জোদ্ধারায় পরিব কৃষককে
অভ্যাস্যার করার জন্য খান-পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগে সাহায্য-
সহযোগিতা পেতেন। তাই তারা কেনও আন্দোলনও করেননি,
এমন কি কংগ্রেস আমলে কেনও কামতাপুরী, উত্তরখণ্ডী বা
বোম্বো আন্দোলন দাবা বাঁধেনি।

কিন্তু ভেড়াপার রক্ত-ডেজা উত্তরবঙ্গে যখন বামফ্রন্ট
সরকার এল (গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শক্তিরূপে) তখন পরিব
মানুষ পলায়েত সহ নানাভাবে মাথা তুলতে চাইল। ফুল-
কলোলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকার ভৈরি
হল। কিন্তু কাদের ক্ষেত্র কোথায়? শিক্ষিত বেকাররা হতশার
নিকার হতে থাকল। আর এতদিনের সুখী-শোখক জোদ্ধার
শ্রমী তার জমির সিলিং বাড়ার ব্যতীতে জমি হারিয়ে বেগা
কুহুরের মতো হয়ে উঠল। তারা জাতপাত থেকে বত ধরনের
সঙ্গী প্রোগ্রাম পারের সামনে নিতে এলো।

অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারও বতটা দরদ নিয়ে প্রাণী
উন্নয়নে উত্তরবঙ্গকে সামনে আনতে পারত তা আনেনি। যদিও
বা করেছে কংগ্রেসের তুলনায় তা অনেক বেশি। কিন্তু চাহিদার
তুলনায় বেশি নয়। ফলে গ্যাপ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে সারা
কলারের বাবুদের হাতে সংরক্ষণ প্রকল্প কাঁকি, তরুত্বা ফিল্মই
এবং এখনও আছে—যা তরুত্বাগুলির শিক্ষিত অংশকে বিকৃত
করে তোলে।

সব জড়িয়ে জট পাকিয়ে যায়। ফলে আজ আন্দোলন হয়ে
পড়েছে বস্ত্র আর বালুসের, যা সবচেয়ে কঠি করবে দলিত
মানুষের।

টি টি—এই প্রবন্ধের মধ্যে 'ফুল পল' বলে মনোভাষার ঈকত্ব সঙ্গী নিয়োনাবে গজটির স্থানীয় কথাভাষার অনুবাদ যে কোন
শিক্ষিত নর-নারী পাঠাতে পারেন। উত্তরবঙ্গের কল্যাকসি চেষ্টা সহ বামো (মন্ডা) থেকে বামোরাই কোন অঞ্চলের কথাভাষার
জ করতে হবে। যদি এমন অনুবাদ কেউ করেন যে সে অনুবাদ সরাসরি সঙ্গী পরিচালকের নিজ টিকনায় পাঠাতে পারেন।
—বিশ্বীত লেখক।

টিকন্য—৩২. কথাস। ঈকতান পদ্যক্যাপত্র। ডি. এল-২২৪ ডি। সন্টলেক। কলকাতা-৭০০ ০১১। ৩৫২-৩৫৩৪

উপলব্ধি: আরি তাত্তিক নই, সং ভাষোবাস আর
সত্য-পুষ্টি ছাড়া আমার কেনও মূলধন নেই। তা নিয়ে
পরিভারভাবে একথা বলতে চাই যে এক, যারা শাসক দল,—
তাদেরকে এই আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়।
হুমকির বশে হুমকি দিয়ে নয়। পুষ্টিয়ে, ব্যাপক জনসমাবেশ
করে—বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে, ঘরে ঘরে তাদের কাছে
পৌঁছে যেতে হবে।

দুই, যারা কামতাপুরী আন্দোলনে আসেগে জড়িয়ে
পড়েছেন—তাদেরকে এর সব দিক বুঝে দেখতে হবে। নিজের
ঘরের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও ভাবতে হবে।

তিন, যারা বেখানে আসেন সেখানেই তাঁরা বলিতদের
দরিত্রের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলুন। নেতৃত্বকে বাধা কখন
পঠিক পদক্ষেপ নিতে।

মস্তিষ্কের প্রজ্ঞাও বেগাও করে একদিন দাবি আদায় করতে
পারেন—কিন্তু তা কেনও ছাড়া শাস্তির পথ নয়। উন্নয়নের
রাঙা নয়।

চার, চা-বাগান সহ প্রমের কাজকে ফুগ করে নয়, প্রতিটি
কর্মক্ষেত্রে (সরকারি ও বেসরকারি) জেলা জনসংখ্যাপাণ্ডে
সংরক্ষণ দাবি করতে হবে এক সবধিধানের নিরনের মধ্যে তা
অর্জন করতে হবে। তার জন্য গণ-আন্দোলন করতে হবে।
ভূমিপূর প্রশ্ন তুলে নয়। দলিত ও দরিত্রের ঈকত্ব পথে।

আমার আশা উত্তরবঙ্গে সজি যারা উন্নয়ন চান—তারা
শাস্তির পথে সে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অর্জন করবেন। সন্ত্রাসের পথে
দরিত্র-দলিতের খবরের রাঙা ধরবেন না।

শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, মানবিক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-
হস্ত-যুব সমাজকে আজ সুস্থতার পথে অগ্রগমন করতে হবে—
যা বাঁচাবে উত্তরবঙ্গকে, পশ্চিমবঙ্গকে, সারা দেশের শান্তিপ্রিয়
মানুষকে। অন্যপথ অন্ধকারের। আসুন আমরা সে পথ ত্যাগ
করি।

উত্তর সাময়িকী

নব পর্ব ☐ প্রথম বর্ষ ☐ প্রথম সংখ্যা ☐ আষাঢ় ১৪০৮ ☐ জুন-২০০১



অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ

উপেন কিস্কু

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অনগ্রসর সম্ভ্রম কল্যাণ বিভাগ

কতিপয় মানুষ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছেন, উপেন কিস্কু তাঁদের পুরোধা পুরুষ।

১৯৫২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি বাঁকুড়ার এক গরিব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই খেত-খামারে কৃষকদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের সাক্ষী উপেন কিস্কু তাঁর পিতার কৃষক ও অনুদাত মানুষদের উন্নয়ন-মনকতায় প্রগতি হয়ে বড় হয়ে ওঠেন। শিক্ষাদানে পিতার প্রবল আগ্রহের দরুন খুব অল্প বয়সেই তাঁকে তাঁর গ্রাম চাতরীর জুনিয়র বেসিক (মিঃ কুমারি) স্কুলে ভর্তি হতে হয়। এখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গ্রাম থেকে আট কিলোমিটার দূরে হলুদকানালি এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যারা গ্রাম থেকে দূরের ওই স্কুলে যাতায়াত করত, তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ উপেনকে বড়দের সঙ্গে স্কুলে যাবার পথটা প্রায় ছুটতে ছুটতে যেতে হত। এভাবে কষ্ট স্বীকার করে পড়াশুনার তাঁর আগ্রহ ও অধ্যবসায় লক্ষ করে স্কুলের প্রধানশিক্ষক রামসেবক পতি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি ওই সময় শিক্ষক মহাশয়ের জীবনযাপন ও আচরণের মধ্যে গরিব কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাঁদের দুঃখবোধে দূর করার কাজের মধ্যে তাঁর কমিউনিস্ট চিন্তাধারার আলাস লাভ করেন।

ওই সময়কালে উপেন কিস্কু বাঁকুড়ার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। বিশেষ করে দক্ষিণ বাঁকুড়ার কংসাবতী জলাধার তৈরিতে উদ্যম কৃষকদের আন্দোলনের প্রবাহপ্রতিম নেতা মতিলাল মাহাতোর আন্দোলনে উপেন কিস্কু



প্রভাবিত হতেন। তখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গরিব মানুষদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনে যেসব নেতা সামনের সারিতে ছিলেন তাঁদের মধ্যে জলেশ্বর হাঁসদা ১৯৬২ সালে রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

সে সময় কৃষকরা প্রচণ্ড অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে। বছরে ন-দশ মাস খেতের ধানে কোনও রকমে চলত। বাকি মাসগুলিতে পরিবার-পরিজনদের অন্ন মেটাতে জমিদারদের খেত-খামারে অভাবি কৃষকদের গোটা পরিবারকে বেগার খাটতে হত। চৈত্র ধান খান ধার করলে অর্ধেক মজুরিতে ধান-স্বর্ণ শোধ দেওয়া পর্যন্ত স্বাধারাত খেতে কাজ করতে হত এবং কখনও কখনও পুরোপুরি বেগার খেটে ধানের স্বর্ণ শোধ করতে হত।

এ ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সংগঠিত আন্দোলন উপেন কিস্কুর জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৬৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে বাদ্যশাসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির দিনে চালের দর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সেই সময় পাঁচ টাকা কিলো দরে

চাল কেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঁকুড়ায় গেলে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, তাঁরা স্বল্প মূল্যে চাল দাবি করতে থাকেন। তাঁদের প্রতিবাদ-আন্দোলন দুর্বীর হয়ে ওঠে। পুলিশ আন্দোলনের নেতা প্রস্থান পড়িয়েছে হত্যা করে।

উপেন কিস্কু তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। খালা আন্দোলনের ডেউ ছাত্রসমাজকেও আন্দোলিত করে। কিস্কুও এই আন্দোলনে शामिल হন। ১৯৬৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনের সময় তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বহু প্রচারপত্র সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করেন।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি হলগি জেলার বেঙ্গাইয়ে কে পি সি কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি ছাত্র-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মরূপে জেলার বিভিন্ন ছাত্র ও যুব আন্দোলনে शामिल হন।

তখন থেকেই তিনি দেশের লুণ্ঠপ্রায় সাংস্কৃতিক মোতখারা জনজীবনে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে আদিবাসী ও লোক-সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হন। তিনি জানতেন যে, জনজীবনে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সাফল্যের প্রাক্ক-শর্ত ভূমিসংস্কার। তাই সে সময় গোখাট থানার বিভিন্ন গ্রামে যখন কৃষক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে উপেন কিস্কু ছাত্রাবস্থায়ই সেসব আন্দোলনের সঙ্গে নিজেই शामिल করেন। এ সময়কার ছাত্র ও কৃষক আন্দোলনের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির নিষ্ঠা সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিঃতাপি কোড়ার, রতন (শেখাশ-ভূতীয় প্রহসে)

উত্তরণ

সাময়িকী

অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র

নবপরিচয় □ প্রথম বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ আষাঢ় ১৪০৮ □ জুন ২০০১ □ মাম—দুটাকা

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

উপেন কিশোর

আরও প্রঃ মন্ত্রী, অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বিভাগ

সহ-সভাপতি

বিলাসীবালা মহিষ

হাটহাটী, অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বিভাগ

ডঃ সুবিনয়স বর্মা

প্রথম সচিব, অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বিভাগ

উপসভাপতি

ধীরেন্দ্র দত্ত

সম্পাদ

মণ্ডল

মণ্ডল

মণ্ডল

মণ্ডল

ডঃ মানসকমল গৌড়ী

সহ-সম্পাদক

ডঃ প্রদেবজিৎ বর্মা

সুপারিশ দেব

সম্পাদক

মিহায়েল মুখার্জি

দুর্গা দুর্গা

৪৫ সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

আজগোষ্ঠাচল

● নারীর কর্মত্যাগ ও আদিবাসী মহিলা

২

সংস্কারকর্ম

● বিশ্বের এক বিরল নজির—বাই বায়ফ্রন্ট সরকার

৩

আবেদনকারী

● সুশীলবাসে আবেদনকারীর ১১১তম জন্মজয়ন্তী

৪

নির্বাচন প্রবেশ

● ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী তফসিলি জাতি প্রার্থীদের

নাম ও দলের নাম

৫

● ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী তফসিলি উপজাতি (আদিবাসী)

প্রার্থীদের নাম ও দলের নাম

৬

নিবন্ধ

● নারায়ণগঞ্জ ব্লাকের কান্দীপুর শকারেডের সোনা প্রদেব

নির্বাচনী ইতিহাস—অনিশ্চিততার ২০শ

১০

বিশেষ প্রতিবেদন

● অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বায়ফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ

১১

প্রতিবেদন

● উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় আদিবাসী ছাত্রদের জন্য অপ্রমদ ছাত্রাবাস উদ্বোধন ২০

প্রঃ : (উপঃ) বাই বায়ফ্রন্ট সরকারের দলবহু প্রণেতা পর প্রণেতার দলবহু পদ-সংস্কার
অনুষ্ঠানে জল নিগম দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে জড়িত। (নিঃ) দলবহু প্রণেতা অনুষ্ঠানের পর
সংস্কারকর্মের দৃষ্টিতে। বাই বাই দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে ৩০। দৃষ্টি : অসিদ্ধি অনুষ্ঠানে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যায়ের সংগ্রামের কল্যাণ বিভাগের পক্ষে ডঃ মানসকমল গৌড়ী কর্তৃক সাংস্কৃতিক পত্রিকা সংগ্রহ,
পি ১/৪, সি আই টি ডিম, ৭এম, ডি আই সি হোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৪ থেকে প্রকাশিত এবং
কলকাতা কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিশিষ্টবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদক—ডঃ মানসকমল গৌড়ী

নারীর ক্ষমতায়ন ও আদিবাসী মহিলা

(একটি আলোচনাচক্র)

৬৬

...ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঘনবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত চিনিসপত্র সম্পর্কে নৃত্যের পাঠ চলছিল প্রবাণ্ড পঠন-পাঠন ও গবেষণা ধারায় ঝাঁপিয়ে। পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এক সাঁওতাল মহিলা ইঠাং বলেন যে, খাদ্য সংগ্রহকারী আদিবাসীদের ব্যবহৃত তান্তের খড়ার (digging stick) মতো একটি খড়্য তাঁরও প্রয়োজন কারণ তা নিয়ে তিনি তাঁর হাতুড়িতা সংগে জমিটিতে ফসল ফসাতে সম্ভবপর হবেন।...— আদিবাসী নারীর উপস্থিতি ও সচেতনতার তথ্য এভাবে উপস্থাপিত করছিলেন কিনাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের অধ্যাপক অতিথিত ৩২ মেনিনীশ্বর দল্লোর অঙ্কগ্রামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় নৃত্যাদিক সমিতির ৩৪তম বার্ষিক আলোচনাচক্রে। আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১-২২ এপ্রিল, ২০০১-এ। সিংবানাম ছিল ‘নারীর ক্ষমতায়ন: উদ্ভূত বিব্রাবণী’। ভারতীয় নৃত্যাদিক সমিতি, সেন্টার ফর উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ও উইমেন ফর নোবল আদর্শন-এর উদ্যোগে কান্ডগ্রাম পৌরসভার ‘বনাদী’ প্রতিষ্ঠানসহ দু’দিনের এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপিকা বীণা মহম্মদার আলোচনাচক্রের মূল ভাষণে উল্লেখ করেন যে তরুণী জাতি ও তফসিলি উপজাতি আয়োগের একসা ফোরামান প্রবাস্ত নৃত্যবিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর রিপোর্টের মন্তব্যগুলো স্বাক্ষরিত হলে সমাজের বক্তিত ও দুর্বল মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতো। শূন্যক্রমে তা হয়নি এবং আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে সড়া না দেওয়ার মহিলাদের সম্মানার্থিকার বিষয়টি উপস্থিত

হয়েছে। ভারতবর্ষের মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন যে, নারী স্বাধীনতা বা সমানার্থিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু তা কিতাবে ও কার সাহায্যে হবে সমাজবিজ্ঞানীদের অবশ্যই সেতুলি বিবেচনা করতে হবে।

ভারতীয় নৃত্যাদিক সমিতির সভাপতি হিসেবে পরবর্তী বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় মানববিজ্ঞান সমীক্ষার প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ অজিতকুমার দত্ত মনে করিয়ে দেন যে, আড়াই দশক আগে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে এই সমিতি ভারতের আদিবাসী নারী সম্পর্কিত তথ্য-চিত্রা ওর করেছিল যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীর মহিলাদের সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধগুলি সম্পাদনা করে একটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নৃত্যাদিকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং বর্তমানে এই ধরনের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি কারণে তা হলো—দীর্ঘ-অনুপাতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের আয়-বৃদ্ধি ও বিগত ৭০০ বছর ধরে নারীর সামাজিক অবস্থা / মর্যাদা প্রায় অপরিবর্তিত। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় মানববিজ্ঞান সমীক্ষার ডঃ ভরদ্বাজ সরকার ও ডঃ সত্যজিত চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থার ডঃ প্রসেনজিৎ সেববর্ণ প্রমুখ।

আলোচনা সভাটির একটি বিশেষ অধিবেশন ছিল—‘মহিলাদের মুখোমুখি’। আদিবাসী অধ্যাপিত অঙ্কগ্রাম একাধার মহিলারা এসেছিলেন এই অধিবেশনের আলোচক হিসেবে। উপস্থিত আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন মালতী মাতি,

কাণ্ডশনি সোরেন, পূর্ণিমা হেমব্রম, মিনতি মাতি, বারী সোরেন ও সরলা সরদার। নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজে (গোলা আনা) মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ের বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন। তাঁদের লড়াই এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পরিবারের জমি বিক্রির পুরো চাকার হিসাব না পাওয়া পর্যন্ত দলিলে স্বাক্ষর করতে তাঁদের বারীসের বাধ্য দেন। জমির উপর মেয়েদেরও মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেরা জমিতে চাষ করছেন। ঘরের ছাউনি, বেড়া বাঁধার কাজ, বাবুই খাস থেকে দড়ি বানানো ইত্যাদি কোন কাজেই তাঁরা আর পুরুষের মুখোমুখী হয়ে থাকছেন না। পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ শুধু নয়, নিজেদের মতো করে তা পরিচালনাও করছেন এইসব মহিলারা। পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েরা যাতে অসুবিধের সম্মুখীন না হর সেজন্য এই আদিবাসী মহিলারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য ভেঁদর করতে নারাজ।

আলোচনাকারীদের অনেকেই আদিবাসী ওবা সমগ্র মানবসমাজে স্ত্রী-শক্তির উল্লেখ করেন। এই স্ত্রী-শক্তি বিকাশের জন্য যেহেতু ক্ষমতায়নের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন স্ত্রী শক্তির অংশগ্রহণে বাধ্যদের জন্য স্বার্থ আন্দোলন। অন্তর্ভাষা ‘বিদ্যায়নের’ বাস্তবরণে নারীরা আরও বেশি করে ভোগ্যপণ্য হয়ে উঠবেন বা সুখ সমাজের কাম্য হতে পারে না।

সকলের সহযোগিতায় আলোচনা সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহম্মদ প্রসাদ বসু।

বিশ্বের এক বিরল নজির—ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার

বিপুল জনসমর্থনবশত বামফ্রন্ট ষষ্ঠবার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে আসীন হল। বিশ্বের প্রশাসনের ইতিহাসে এ ঘটনা এক বিরল নজির সৃষ্টি করল।

একটানা ২৪ বছর প্রশাসন-শীর্ষে অবস্থান করে জ্যোতি বসু বিভিন্ন বামশহী দল নিয়ে যে সহৈত সরকারের কল্যাণ-রথের যাত্রা শুরু করেছিলেন ১৯৭৭ সালের ২১ জুন, শপথ-সংগ্রামে জনকল্যাণের সে রথ দিনের পর দিন সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেই অশ্রুগর্ভনের গারায় ২০০১ সালের ১৩ মে পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করল।

গত ২৪ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার জনকল্যাণের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তার নব অধ্যায় রচনার ইস্তিত সুপুষ্টি হয়ে উঠেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কর্মসূচির মধ্যে। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার দায়বদ্ধতা ও অঙ্গাবদ্ধতারে বিভিন্ন দিক সুপুষ্টিরূপে চিহ্নিত করেছেন। জ্যোতি বসু জনকল্যাণরথের যে যাত্রাপথ নির্ধারণ করেছিলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বামফ্রন্টের সেই সুচিহ্নিত সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নবজীবন রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের চামিঙ্গা মেটানোর ব্যতী ২৪ বছরের সুশাসনের বার বজায় রাখার প্রয়োজনে বামফ্রন্টকে পুনরায় কর্মতাসীন করেছেন।

অন্যান্য ব্যয়ের মতোই জনগণ বিপুল ভোটখিলে, এবার দুই-তৃতীয়াংশ আসনে, বামফ্রন্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন। নিরলস প্রাণে জনকল্যাণ কর্মসূচি রূপায়ণ করেই বামফ্রন্ট জনগণের এতেনে আস্থা অর্জন করেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডকসিলি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট সংরক্ষিত আসনের পাঁচ ভাগের চার ভাগেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিক সফল কর্মসূচি রূপায়ণেই এতাদ সমর্থন লাভ সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাব সত্ত্বেও খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ভোগ যোকবিলার বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিক, রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে স্বাধাব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়া চক্রের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে শক্তির পরিবেশ বজায় রাখার প্রকল প্রয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিত অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেও পূর্ববঙ্গের ঊচ্ছন্ন সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উদ্যোগের সাক্ষ্য, উচ্চশ্রেণীর মানুষদের নিপীড়নে জর্জরিত সমাজের শিহিরেপড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-প্রয়াসের সহায়ক সরকারের কর্মসূচি প্রভৃতিই বারবার বামফ্রন্টকে জনগণের জরমল্য লাভের পাথে পরিণত করেছে।

ভূমিসংস্কারের সফল রূপায়ণের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গরিব ভূমিহীন কৃষকদের তথা অবিভাগ্য ডকসিলি ও আদিবাসী মানুষদের হাতে জমি তুলে দেওয়া, সেচ-স্বত্বহার উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার সেসব জমিতে অভ্যুত্থর্ষ ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা, বিস্তার পকারেভের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা বিকসীকরণ, বনিসুষ্টি প্রকল্পের সাফল্য প্রমের গরিব জনগোষ্ঠীর স্বরভেরতা সম্পাদন এবং বেকার মুক-সুখভীনের কর্মসংস্থান প্রকৃতির উত্তরাকিকার বহন করে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বামফ্রন্টেরই সেইসব নীতির ধারাবাহিকতাকে নতুন উদ্যমে, দৃঢ়তার পদক্ষেপে দ্রুত রূপায়ণে

এগিরে নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জনকল্যাণের এইসব উদ্যোগ এবং কর্মসূচি রূপায়নের দৃঢ় অঙ্গীকারই বামফ্রন্ট সরকারের বিজয়বৃত্তের দৃঢ় ভিত রচনা করেছে। সে অঙ্গীকার ফ্রন্টের নির্বাচনী ইজাহারেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

০৮ নংকর সে ইজাহারে পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যের গারিভাসীমার নিত্যর মানুষ শতকরা ১০ জনে নামিয়ে আনা, সমবার পদ্ধতিতে রাজ্যের কলস ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা, শতকরা ৭৫ ভাগ কৃষিক্ষমিতে সমবার চাষব্যবস্থা, শিল্পায়নের ব্যাপক প্রয়াস, দুগ্ধশিল্প ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সুরক্ষা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার নিত্যরতাবিধান, বাছা পরিবেশের বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সর্বোপরি, কর্মসংকুচিতর আয়ুল উন্নয়ন বক্ষ্যমাণ।

সেই অঙ্গীকার ফ্রন্ট পালনের কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার কাজে এগিরে চলেছে বর্ষ বামফ্রন্ট সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সরকারের নীতি অনুসরণে সর্বপ্রত্যয়ে উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কাজে প্রতিটি মন্ত্রর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেননা, বুদ্ধদেববাবুর নেতৃত্বে গঠিত বর্ষ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা জানে যে, গত ২৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গোটা ভারতের গরিব মেহনতি মানুষের কাছে যে উজ্জ্বল আশার প্রতীকরূপে প্রতিভাত, সে উজ্জ্বল দীপকে উজ্জ্বলতর প্রভাৱ প্রদীপ্ত করতে হবে এবং দক্ষতর প্রশাসনের দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনেই সে কাজের সাক্ষ্য নির্ভর করে।

বর্ষ বামফ্রন্ট সরকারের সবেমদনশীল প্রশাসনের দীর্ঘ নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নতুন গারা সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি অতীতের পঁচাত্তি ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কর্মসূচিরই বর্ধিত রূপ ভূলে ধরেছে। বামফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে অতীতে এই রাজ্যের জনগণ বিশ্বের ধনিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অসুবিধা সংকেতে পৃথীত কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি—খিদায়ন, অবাধ বাণিজ্য এবং বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন, বর্ষ বামফ্রন্ট সরকারও তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে সংগ্রামে দৃঢ়তর হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নতুন ও পুরনো মন্ত্রীরা গত ২৪ বছরের মন্ত্রীদের কর্মকর্তিত্বের অনুসারী, তাঁদের বামপন্থী মতাদর্শের শরিক। মুখ্যমন্ত্রী ভট্টাচার্য তাঁদের পুরোহা পূরব। নেতৃত্বে ব্যক্তিবিশেষের কর্মকৃৎসলতা কর্মসূচি রূপায়নে নতুন মাত্রা যোগ করলেও, নীতি রূপায়ণে সামগ্রিক ভূমিকার ওজুত্বই দীক্ষার্য। মুখ্যমন্ত্রী সে ওজুত্বই প্রাবান্য দিয়েছেন এবং যৌথ গারিভসভেলতার প্রয়োজনীয়তার উপর ওজুত্ব আরোপ করেছেন। যে তত্ত্বের উপর বামফ্রন্ট গড়ে উঠেছে সে তত্ত্ব ব্যক্তি অপেক্ষা ক্রৌী ও তার সংগঠন এবং চেডনার উপরই অধিকতর ওজুত্ব আরোপ করে। তাই জনগণের উন্নয়ন ও বিকাশকেন্দ্রিক কর্মসূচিকে ঐকান্তিক প্রবৃত্তে রূপায়ণে দায়বদ্ধ থেকেও বামফ্রন্ট সরকার, বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে, শীমিত ক্ষমতার বৃত্তে অবস্থানে বাধ্য হয়ে সমাজবৈপ্লবিক রূপান্তরের অব্যাতব প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না।

ব্যাপক ভূমিস্বায়ত্তরসামনে বামফ্রন্ট সরকার যে সাক্ষ্য অর্জন করেছে তাকে উন্নততর ভাবে এগিরে নেবার প্রচেষ্টার প্যাপাশি বামফ্রন্ট শিল্পায়নের নবনির্গত রচনার প্রতিশ্রুতি পালনে প্রয়াসী। বর্ষ বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাত্ত্বিক প্রাজ্ঞতা এবং, সর্বোপরি, জনপ্রিয়তার ঔর্ধ্ব বর্ষ বামফ্রন্ট সরকারকে জনকল্যাণের সমার্থকে পরিণত করেছে। তাঁর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার নবীন আশার বড়ল হয়ে নিয়ে সমস্ত অপচেষ্টা, অপপ্রচার ও অকল্যাণের জীর্ণ অবশেষ কঠোর আঘাতে দীর্ণ করে পশ্চিমবঙ্গকে নবতর জীবনের পথে এগিরে নিয়ে যাচ্ছে—পশ্চিমবঙ্গবাসী জনমানবের সে আশা অচিরেই পূর্ণ হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরে বাবাসাহেব আশ্বেদকরের ১১১তম জন্মজয়ন্তী পালন

গত ৩০ এপ্রিল (২০০১) মুর্শিদাবাদ

প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের (মুর্শিদাবাদ) দপ্তর গৃহে ভাণগাতীর পরিবেশে একটি অনুষ্ঠানে বাবাসাহেব ডঃ বি আর আশ্বেদকরের ১১১তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

সভার শুরুতে বাবাসাহেব আশ্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্চন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা গুরুপদ বায়েন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মহাকুমা শাসক আলিস কুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়া জেলা প্রকর আধিকারিক অমলকুমার সেনগুপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বরচিত কবিতা পাঠ করেন দপ্তরের কর্মী রাশেন্দ্রকুমার বিশ্বাস। মহাকুমাশাসক আলিসকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাবাসাহেব ডঃ আশ্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন সিক নিয়ে আলোচনা করেন। জেলার অতিরিক্ত সমাহর্তা গুরুপদ বায়েন দীর্ঘ আলোচনার



বাবাসাহেব ডঃ আশ্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যলন করছেন জেলার অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা গুরুপদ বায়েন

বাবাসাহেবের কর্মপ্রবণা ও জ্ঞতপাতের ভূপ্রস্থার বিষয়ে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। ভাষণপর্বে তিনি এক সুন্দর প্রস্তোতর পাঠে অংশ নেন। মর্মতব্ব্ব্ব্বের কবিতায় প্রভেদ সাবদীল উত্তরে বলেন

মহাশয় মর্মত ইন্দর ভগ্ন করেন। প্রকর আধিকারিক সেনগুপ্ত উপোদনী ভাষণে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে দপ্তর কর্মী ইপক সত্য তাঁর ভাষণে বাবাসাহেবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের



বাবাসাহেবের উদ্দেশে প্রদান দিবেন করেন মহাকুমাশাসক আলিস মুখোপাধ্যায়। (গয়ে) সবচেয়ে মর্মকণ্ঠী



শ্রীমতী সত্যজিৎ আশ্রমের ১১১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মুন্সিঙ্গায় অনুষ্ঠিত জনসভায় ডা. সত্যজিৎ আশ্রমের সভাপতিত্ব করেন।

প্রতি আলোচনা করেন। সনৎ মণ্ডল একটি দুহলাকার অনুষ্ঠান করার কথা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্বালন করেন। প্রকট আধিকারিক সেনগুপ্ত মহাশয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন। দুই শীর্ষই একটি দিন সিক করে যোগা করেন।



অসম ছাত্রসন হাউসের যে কোনও উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে জনসভার সমর্থকদের জনসংগঠন করে বিপুল উৎসাহ-উদ্বীগন দেখা দেয়। মুন্সিঙ্গায় জেলার জিলাপত্র প্রকাশিত ছাত্রসন হাউসের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে অধিকারী সত্যজিৎ আশ্রমের প্রাক্কট

প্রতিবেদন—শ্রীমতী সত্যজিৎ আশ্রম

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ত্রয়োদশ নির্বাচনের (২০০১ সাল) ২৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে তফসিলি ও তফসিলি উপজাতি (আদিবাসী)দের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৭৬। এই ৭৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৬৬টি, কংগ্রেস ৮টি এবং অন্যান্যরা ২টি কেন্দ্রে জয়ী হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট জিতেছিল ৭৪টি কেন্দ্রে। কংগ্রেস সেবার একটি কেন্দ্রেও জয়ী হতে পারেনি। অন্যান্যরা লাভ করে মাত্র ২টি আসন। নিচে ত্রয়োদশ বিধানসভার উক্ত বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা দেওয়া হল

ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী তফসিলি জাতি প্রার্থীদের নাম ও দলের নাম

বিধানসভা কেন্দ্রের নাম	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	দল
১। মেঘালগঞ্জ	লক্ষ্যেশ্বর হরিচন্দ্র	সর্বোচ্চ ভারতীয় দল
২। পীতলকুড়ি	সুধীর প্রমোদ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৩। মাথাভাড়া	বৈদ্যেশ্বর তপসু	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৪। তুফানগঞ্জ	পুষ্পেন্দ্র দাস	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
১৩। ফালগুটি	সোমেশ্বর বর্মণ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
১৪। ধূপচিতি	লক্ষীকান্ত বসু	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
১৭। মহানগতি	বজ্রমোহন বসু	বিজ্ঞানী সমাজতান্ত্রিক দল
২১। কাঙালগঞ্জ	মহীশূর বসু	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৩১। বাঘগঞ্জ	চিত্তব্রজ বসু	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৩২। কালিয়াগঞ্জ	প্রমথনাথ বসু	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৩৩। ধূপচিতি	নরেন্দ্র বসু	বিজ্ঞানী সমাজতান্ত্রিক দল
৪৩। মালদহ	গজেন্দ্র চৌধুরী	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৪৫। সাগরসীমি	লক্ষ্যনাথ দাস	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৬৬। খরগ্রাম	বিজয়নাথ মল্লিক	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৭৪। কুষ্টিগঞ্জ	সুদীপ বিশ্বাস	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৭৫। গ্রামখালি	নরেন্দ্র সরকার	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৮০। রানাবাট পূর্ব	মঈন কান	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৮৪। বাগদ	কমলাকান্ত বিশ্বাস (পিতা: কৃষ্ণবিশ্ব)	সর্বোচ্চ ভারতীয় দল
৯১। মাকারহাট	তরুণ মল্লিক	সর্বোচ্চ ভারতীয় দল
৯৭। ধারোয়া	জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৯৮। সন্দেশখালি	কপিল বিশ্বাস	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
৯৯। বিহলগঞ্জ	নৃপেন্দ্র গাঙ্গুল	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ)
১০০। গোমারাবা	গজেন্দ্র মল্লিক	বিজ্ঞানী সমাজতান্ত্রিক দল
১০১। বাসন্তী	সুভাষ নন্দন	বিজ্ঞানী সমাজতান্ত্রিক দল
১০২। কুলতলি	প্রবোধ পূর্বকায়স্থ	জিএস
১০৩। ক্যানিং পশ্চিম	গোবিন্দচন্দ্র নন্দন	সর্বোচ্চ ভারতীয় দল

বিধানসভা কেন্দ্রের নাম	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	মূল
১০৯। সেনারপুর	নির্মলচন্দ্র মণ্ডল	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস
১১০। বিষ্ণুপুর পূর্ব	তিলীপ মণ্ডল	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস
১২১। মগরাহাট পূর্ব	বংশীমোহন কাঞ্চি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
১২২। মন্দিরবাড়ার	ক্রীষ্ণী মোহন জট্টা	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস
১২৪। কুলশি	জগদ্বন হালদার	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস
১৪৪। ডালডালা	দেবেন দাস	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
১৬৯। সাকরাইল	শ্রীতলকুমার সর্গার	সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস
১৭০। উলুবেড়িয়া উত্তর	মোহন মণ্ডল	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
১৮৮। বলাগড়	নিরাকান্ত রাউথ	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
১২১। বন্দিয়াখালি	কৃপাসিদ্ধ সাহা	সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক
১৯০। খনাকুল	বাণীধর মৈত্র	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
১২৪। গোঘাট	শিবপ্রসাদ মলিক	সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক
১২৭। খাটাল	রতন পাথিরা	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২০৪। সুভাছাটা	নিজ্যামশেখ বেড়া	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২০৯। খেজুরি	সুনির্মল গাইক	পশ্চিমবঙ্গ সোশ্যালিস্ট পার্টি
২১৯। কেশপুর	নন্দরানী মল	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২২৩। গড়বেড়া পশ্চিম	কুমুদপ্রসাদ মুন্সে	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪০। গড়া	বিনয়ীবালা সহিদ	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪১। রঘুনাথপুর	উমারানী খাউড়ি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৭। ইসপুর	বাগনি কিশীট	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
২৪৯। গমাকলখাট	রামচরণ খাউড়ি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৪। ইখাস	নন্দকুলাল দাতি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৬। সোনাডুখী	সুশেখু খা	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৬০। উখরা	কন খাউড়ি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৬৬। কঁকসা	অম্বুর সত্রেণ	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৬৭। আউসগ্রাম	কর্তিকচন্দ্র বাগ	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৭২। বড়ঘোষ	জ্যোত্স্না সিং	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৭৪। আমালপুর	সমর হাজরা	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৮২। ফেড়গ্রাম	তমালচন্দ্র দাতি	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৮৩। নানুর	অনন্দকোশাল দাস	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৮৭। গ্রামনগর	বিজয় খাণ্ডি	সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক
২৯০। বড়শেখর	বিক্রম সেন	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৯২। হাসান	অসিতকুমার মাল	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

**অমোদশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী তফসিলি উপজাতি
(আদিবাসী) প্রার্থীদের নাম ও দলের নাম**

বিধানসভা কেন্দ্রের নাম	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	দল
কুমারগুহ	সমরথ ত্রিবেদ	বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক দল
কলকিচি	শ্রীমন্তনন্দ লাল	ভাষাতত্ত্ব কলকাতা
১৪ মঙ্গলদেবী	কুমারী কুমার	বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক দল
নংকোত	জিতেন কুমার	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
	সেখর লাল	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৬ ষাঁড়দেবী	প্রদীপ মিত্র	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
	খাতা সোহন	বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক দল
হরিনন্দন	বদ্র হেমচন্দ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
৪০ গাংকো	সবু চন্দ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২২৬ তেঁকদেবী	নাহেশ্বর মুখা	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২২৭ নন্দগ্রাম	কুমার সোহন	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৩৩ বিনন্দ	লক্ষ্মীনাথ মতি	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৩৬ বাগদান	উপেন্দ্রনাথ হোসেন	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৩৭ বঙ্গবান্দন	কুমার মতি	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৩ কলকাতা	রঞ্জিতনাথ হেমচন্দ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৭ কলকাতা	উপেন্দ্রনাথ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
২৪৮ কলকাতা	মহেশ্বর চন্দ	ভাষাতত্ত্ব কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

আগামী সংখ্যা ৩৮ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি বিজয়ী প্রার্থী ও পরাজিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা প্রকাশিত হবে

—সংসদ

নারায়ণগড় ব্লকের কাশীপুর পঞ্চায়েতের লোখা গ্রামের নাতিদীর্ঘ ইতিকথা

অনিলকুমার হওল

মেদীনীপুর তেলার নারায়ণগড় একটি ব্লক, যার দুটি থানা বধ্যক্রমে নারায়ণগড় ও বেলসা। মোকসাব্দে ১৩৭,৭৭২ : প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২০টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি কলেজ ১টি, বি টি কলেজ ২টি, পলিটেকনিক কলেজ ১টি, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১০টি, সমতাব্য বাস ৫টি, অন্যান্য বাস ১৭টি, সৈনিক বাসার ৫টি, হাট ৩টি, নলকূপ ৬৮৭, কূপ ৬৪৩টি, বনাজল ১৫,৩২০ হেক্টর সেচসেবিত জমি ৬,৪৪৩ হেক্টর, অসেচ জমির পরিমাণ ১৪,২১৭ হেক্টর, পাকা রাস্তা ৭২ কিঃ মিঃ, কাঁচা রাস্তা ৭২২ কিঃ মিঃ, ডাকঘর ৪৮টি, ৮০৫ মৌজার বিদ্যুৎ পৌছে গেছে।

এই ব্লকে ১৬টি অঞ্চল অর্থাৎ ১৬টি পঞ্চায়েত আছে। যেগুলির মাধ্যমেই উপরেক্ত এলাকার উন্নয়নের কাজ হয়ে থাকে, সমস্ত উন্নয়নই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হতে থাকে। এই ১৬টি পঞ্চায়েতের মধ্যে কাশীপুর অধিবাসী-প্রধান পঞ্চায়েত। এটি বেলসা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিঃ দূরে অবস্থিত। এই পঞ্চায়েত এলাকার সব রাস্তাই মেসারদের রাস্তা। গাড়ি চলাচলে কোন অসুবিধা হয় না। কাশীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান একজন মহিলা, যাঁর নড়ির যোগ আছে এলাকার প্রতিটি নরনারীর সঙ্গে। এই কাশীপুর পঞ্চায়েতের ‘মা মনসা’ গ্রামে প্রকমত লোখার বাস করেন। লোখা পরিবারের সংখ্যা ১৫ বা ২০টি। প্রত্যেকের গড়িতে বৈশ্বাস্তিক আলো আছে।

সরকারি উদ্যোগে একটি প্রথমিক বিদ্যালয় ও একটি নলকূপ ছাড়াও সারা বছরে জলের অভাব পূরণের জন্য সরকারি উদ্যোগে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে। এই পুকুরটি গ্রন্থাবাসীদের রান্নাটি ছাড়াও কৃষিজমিতে জলসেচের সহায়ক সরঞ্জাম। প্রত্যেককেই সরকারি খাস জমি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জমিতে বছরে দু’বার চাষ হয়। আমন ধান কৃষকের সারা বছরের খাদ্য জোগায় এবং বোতারা চাষের ফসল বিক্রি করে সংসারের অন্যান্য ব্যয় চালিয়ে থাকেন। এছাড়া অনেকে চাষের ব্যবসাও করেন। ঘান থেকে চাল তৈরি করে সরকারি টুলিভানে করে বেলসা বাজারে বিক্রয় করে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই এলাকার উপকৃত মানুষেরা বলছেন যে, এলাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য তাঁরা যেমন খাসজমি পেয়েছেন, তেমনি এলাকা থেকে যে বড় বড় জোতদার জমিদার ছিলেন তাঁরাও উৎখাত হয়ে গেছেন। সরকার তাঁদের সমস্ত উৎপন্ন জমি নিয়ে গরিব চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। এছাড়া নানা প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত

গ্রন্থাবাসীদের সাহায্য করেছে। ডকমিলি জাতি ও আদিবাসী অর্থ নিগম নানা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য টাকা দিয়ে থাকে। মা মনসা গ্রামের লোখারা দুটি প্রকল্পের জন্য পাম্পসেট ও চাষের ব্যবসার জন্য প্রত্যেককে ৬,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পাম্পসেট পেয়েছেন তাঁরা কেবল ওই পাম্পসেটের সাহায্যে নিজ নিজ জমি চাষ করেও উৎপন্ন জল অন্যান্য চাষীদের বিক্রি করে থাকেন।

সেই টাকার তাঁরা জমির জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ কেনেন। কিন্তু ডিক্লেয়ার লাম খুব বেশি বেড়ে বাণিজ্যের বর্তমান বছরে আগের মতো আয় হচ্ছে না।

চাষীদের মনে একটা মেঘ ফসীভূত হচ্ছে। তা যে জোতদার-জমিদারের অভ্যাসেরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিরাট আবেগলন করে জমিদারদের হাটের সরকারি সেওয়া জমি নিয়ে ২৪ বৎসর ধরে চাষ করে ফসল কলিয়ে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। সেই উন্নতির পথ রোধ করার অপচেষ্টা দেখা দিতে পারে। প্রকল্প রূপায়ণে সরকারি সাহায্যে আর্থিক উন্নয়নের ফলে আয় বাড়ছে। আবেগকার বার্ষিক আয় ১ হাজার থেকে বেড়ে এখন বার্ষিক আয় ২৪/২৫ হাজারে পৌছেছে। ফসল মেয়ের বিয়ে, বাড়িঘর মেয়ামতি, জমি কেনা প্রকৃতি বৈষয়িক কাজ সুদৃঢ়ভাবেই সম্পন্ন হতে পারছে। কিন্তু বর্তমানে অবাধ চাল আমদানির ফলে চাষীরা উৎপন্ন ফসলের দাম পাচ্ছেন না। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এবং অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য তাঁরা সমাজের প্রতিনিধিত্বাঙ্গীল পত্রিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি হচ্ছেন। বর্তমান সরকার এবং পঞ্চায়েতের সহায়তায় তাঁরা জীবনের যে বাস পেয়েছেন তাকে তাঁরা হারিয়ে ফেলতে রাজি নন।

তাই দেখা যাবে লোখা গ্রামে যে লোখারা থাকেন তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক উন্নত। আশ্র তাঁদের গাভারের জন্য চিন্তা করতে হয় না। তাঁরা কর্মঠ কৃষিজীবী। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সবচেয়ে সচেতন।

সেই সঙ্গে নিজের অর্থনৈতিক দিকটাও তাঁরা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা ভ্রমে করেন, এই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলুক, তাহলে তাঁদের জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না, জয় তাঁদের হয়েই। তাঁদের যে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এবং যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে ধরে রাখার জন্য তাঁরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ (একটি প্রতিবেদন)

১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তৎক্ষণি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জীবন, আত্মসম্মান, জীবিকার সমস্যার চিন্তানা পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরোধীকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আজ এই মানুষরাই নিজের সরকার নিজেই চালাচ্ছেন, পালাপালি প্রত্যয়ে অসাধারণ অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়নের কাজ। সরকারের প্রতিটি দপ্তরই অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া এই মানুষের নিজস্বতা, চেতনা, বিশ্বাস, শিক্ষা সর্বোপরি জীবনের বোধকে নতুন করে গড়ে তুলে সমাজের মূলমোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করছে। কাজ করে চলেছে।

রাজ্য সরকারের পদ্ধতিতে, কৃষি, শিল্প, মৎস্য, পরিবহণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে এগিয়ে চলেছে এদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার কাজ। কং বিতর্ক, কং বাধা আছে। আছে রাজ্য সরকারের আর্থিক শীমাবদ্ধতা। কিন্তু ১৯৭৭ সালের পর গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইনের সংশোধন (খাদ্য আইন) মঞ্জুরি বৃদ্ধি, কৃষক পেনসন এবং সর্বপ্রাণ 'অপারেশন বর্গার' সুফল আজ আর 'দুন আনতে পাড়া ফুরানোর' কথা কহছে না। তবে এই পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যেই এখনও গোটা দেশের মতো এ রাজ্যেও আছে গরিব। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে আজ এ রাজ্যে ওই সমস্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

রাজ্য সরকারের 'অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ' দপ্তর তৎক্ষণি জাতি, আদিবাসী এবং অনগ্রসর তথা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এই দপ্তরে ৪০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নিশ্চিতভাবে রূপায়নের কাজ করে চলেছে। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যেমন আছে (আদিবাসী এলাকা উপ-যোগ্যতায়) সাধারণ শিক্ষা, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মৎস্যজীব্য, বোম্ব উন্নয়ন, স্ববায়ু, শিল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ জন্ম মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় আদিবাসী তৎক্ষণি জাতি, উপজাতির মধ্যে গত বছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও দু'বার ২৬টি অনগ্রসর কেন্দ্রীক স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯২-২০০০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে আরও চারটি কেন্দ্রীক অনগ্রসর কেন্দ্রীভূত করেছে।

রাজ্য সরকার এ যাবৎ ৬০টি অনগ্রসর কেন্দ্রীক স্বীকৃতি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনগ্রসর কেন্দ্রীক ব্যয়খণ্ডভাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে অবশিষ্ট এই বিরাট জনগোষ্ঠীর মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত সংকটলিপিক সরেক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর ফলেই এ রাজ্যে অস্বাভাবিক অনগ্রসর শ্রেণীর স্বীকৃতিদানের উদ্দেশ্যটি বহুলাংশেই অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে।

এ রাজ্যে যে ৯০টি অনগ্রসর কেন্দ্রীক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে :

কাপাসি	কেওরি / তৈরি	সাসপাও
কোশা কাপাসি	বাড়ু	বাক্সগোম্বাড
কুর্নি	নগর	খামি
সুখর	করনি	খোয়া
কর্মকর	সরক	খীলাল
কুস্তকার	কোমটা	গ্রাওরি
কর্মকার	তাম্বলি / তামালি	ভর
তেলি	রোনিয়ার	কর্নিও
নাগিত	(খ্রিস্টান খোচে থারা তৎক্ষণি	গংগোটি
খোয়া-নাখ	কেন্দ্রীক এসেছেন)	ভুরহা
গোয়লা-খোপ	লাকখিরি / লাক্ষিগ্র	খুনিয়া
ময়রা-মোমক (হালই)	ফকির / সইন	পরিধর
বাম্বজীবী	কায়র	গুর্সী
সংজাবী	তাম্বাড	হালা / হালিয়া
		কৈবর্তী
মালাকার	বোটকর	বর্সী / বর্ধ
কোলা-আনসারি-মোমিন	ভিত্তকর	নাসা / শেখ
কনসারি	ভুত্বেল	পাখিরা / মুসলিম
তীতী (তন্তুবাথ)	নোয়ার	খান / Khen
বানুক	মানভার / (খোপা, রানা)	সুতলি
লভাহাকর	নামবাঙ	সুন্সার, বরভুজ

এ রাজ্যে তৎক্ষণি জাতি ও উপজাতি সংস্পর্গ প্রক্রিয়ার কাজকে আরও দ্রুত করতে আবেদনপত্রগুলির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি সরল পদ্ধতি চালু হয়েছে। (এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিষয়টি ও হাজার টাকের নীচে বেতনক্রমের সমস্ত পদই প্রযোজ্য ছিল। তেমন সংশোধনের ফলে ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই উৎসর্গীমা ১৮ হাজার ৩০০ টাকা হয়েছে।

এ রাজ্যে প্রাক-মাধ্যমিক তৎক্ষণি জাতি ও তৎক্ষণি আদিবাসীভুক্ত আবাসিক ছাত্রদের আবাসিক ব্যয় মেটানোর কর্মপ্রচল চালু হয়েছে। বর্তমানে প্রাক-মাধ্যমিক ছাত্র প্রায় ৩২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তৎক্ষণি জাতি ও প্রায় ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তৎক্ষণি আদিবাসী হস্টেলে থাকার ব্যয় পাচ্ছেন।

তৎক্ষণি জাতি ও তৎক্ষণি আদিবাসীভুক্ত 'ভেস্তলারের' ভরখণ্ডাশাখের ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করছে। বর্তমানে এ রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তৎক্ষণি জাতির ও ৮০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তৎক্ষণি আদিবাসী ভে-ভলার এই সুযোগ পাচ্ছেন। এ রাজ্যেই প্রথম প্রাক-মাধ্যমিক ছাত্রের তৎক্ষণি আদিবাসী ছাত্রদের আবাসিক ব্যয় মঞ্জুরির জন্য রাজ্য সরকার

একটি অতিরিক্ত অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এ রাজ্যেই প্রাক-মধ্যমিক স্তরে এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের বই ও পরীক্ষার ফি-বাক্স অনুদান হিসেবে অর্থ প্রদানের একটি প্রকল্প চালু আছে।

১৯৯২-২০০০ সালে ১০ লক্ষ তফসিলি ছাত্র-ছাত্রী ও ২ লক্ষ তফসিলি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছেন। এই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে পৃথক মেধা বৃত্তি। চলতি বছরে তাগো ফল করার জন্য ২,৪০০ জন এই মেধাবৃত্তি পেয়েছেন।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে মাধ্যমিকোত্তর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন, এর জন্য মাধ্যমিকোত্তর ছাত্র বৃত্তি প্রদান কর্ম প্রকল্প চালু হয়েছে। বর্তমান বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজার তফসিলি জাতি এবং ১১ হাজার তফসিলি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রকল্পের অওতায়ে আনা হয়েছে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগের ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ৪০টি ছাত্রাবাস চালু করা হয়েছে। আরও ৯টি ছাত্রাবাস তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজ্যে ২০৬টি আশ্রমাবাস রয়েছে। রাজ্যভূমিতে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ৭ হাজার ২০০ জন এই আশ্রমাবাসে রয়েছেন। ১ হাজার ১৯৭টি বিদ্যালয় সলেগ ছাত্রাবাস রাজ্যে আছে, এর মধ্যে ১ হাজার ৪৪টি ছাত্রদের জন্য ১৪৬টি ছাত্রীদের জন্য। এই ছাত্রাবাসগুলির ব্যবস্থার স্নাক সরকারই বহন করে। এর পাশাপাশি বাঁকড়া, পুন্সিয়া, মেনিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও মলমল জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে পাঁচটি আবাসিক বিদ্যালয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের জন্য পরীক্ষা প্রকৃতির জন্য রাজ্যে প্রাক-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও বর্ধমান জেলায় আরও দুটি প্রাক-পরীক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি আদিবাসী উন্নয়ন ও অর্থ নিগমের মূল কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বায়স্কট সরকার পরিচালনার নীচে থাকা এই সব সম্পদসমৃদ্ধ পরিবারগুলির জন্য পরিবার অতিমুখী প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ২০ হাজার ৬০০ তফসিলি জাতিভুক্ত পরিবার ৭ হাজার ৫২২টি তফসিলি আদিবাসীভুক্ত পরিবারকে ভরতুকি হিসাবে ১৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা এবং গ্রামিক অর্থ হিসাবে ৪৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যাংক কল হিসাবে ১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মপ্রকল্প অনুযায়ী শিঙ্ঘিয়ে পড়া সম্পদারগুলি কৃষি, বাঁস-মুগুণি পালন, গবাদিপালন ও পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে গেছেন।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে পারিবারিক আর্থসেবা কর্ম আদ্য এমন ব্যক্তিদের জন্য নিগম কৃষি, পরিবহন, মুদ্রাশিল্প, মৎস্য চাষ প্রকল্প সংযোজিত করেছে। এরা জন্য চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৯১৫ জন উপকারভোগীকে ১ কোটি টাকার বেশি ভরতুকি, প্রায় ৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকার ব্যাংক কল মঞ্জুর করা

হয়েছে। নিগমের তত্ত্বাবধানে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য ছাত্রী আয় উৎপাদনশীল গৃহ সোদাফল কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের জন্য মহিলাদের প্রাথমিক সমন্বয় সমিতি গঠিত হয়েছে। এর সঙ্গেই মৃৎ প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের জন্য দৈনিক ১০ হাজার লিটার কার্প ক্ষতাসম্পন্ন চিলিচি রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও সাফল্যের সঙ্গে সমন্বয় তিরিহিত মৃদু ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ১ হাজার ২০০টি ক্ষুদ্রশেচ কর্মপ্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। নিগম চলতি বছরে যে কপদান কর্মসূচি চালু করেছে তার জন্য ১৪৫টি ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করে রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমন্বয় নিগম অধীন ১২০টি বড় বহুমুখী সমন্বয় সমিতি (ল্যাম্পস) এবং দুটি মহিলা সমন্বয় গঠিত হয়েছে। ১৯৯২-২০০০ সালে বড় বহুমুখী সমন্বয় সমিতিগুলি সাধারণ বৌদ বনজ সম্পদ সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিল এবং এই সব আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আদিবাসী জনসমষ্টির ৪২৬,৯০০ মেট্রিক টন কেন্দ্রপাতা সংগ্রহের মাধ্যমে ৬৮ হাজার ৬২৭টি প্রম নিবস এবং ২৬৪,৬৮০ মেট্রিক টন শালবীজ সংগ্রহের মাধ্যমে ১০ হাজার ২০৪টি প্রমনিবস সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান আর্থিক বছরে এই সব মানবদ্রা তায়ের সংগ্রহের জন্য যাতে বর্ধিত মূল্য পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে শালবীজের সংগ্রহ মূল্য মেট্রিক টন প্রতি ১,৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করেছে রাজ্য সরকার।

১৯৯১-২০০০ সালে এই সমন্বয় সমিতিগুলি ২২০ হেক্টর জমিতে বনের গাছ কটাের কাজ হাতে নিয়ে তা সফল করেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে জেলা কল্যাণ কমিটির সুপারিশে সড়ক নির্মাণ, সেতু, কলভাট, পানীয় জল সরবরাহের মতো পরিকল্পনামে উন্নয়নের কাজ ব্যাপকভাবে হয়েছে। চলতি বছরেই তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে পরিকল্পনামোগত উন্নয়নের জন্য তফসিলি জাতিদের জন্য ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ও তফসিলি আদিবাসীদের জন্য ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার কাজ হাতে নিয়েছে সরকার।

রাজ্য সরকার একদিকে যেমন তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এর পাশাপাশি জাতীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গুরুত্ব পোচ্ছে এ রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের অধীনে পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে (মধ্যমেয়াদি) গত ৪ বছরের কাজের হিসাবে অগ্রগতির বর্তমান সূচিত হয়েছে। ১৯৮৬-৯৭ সাল থেকে ১৯৯২-২০০০ সাল পর্যন্ত এই নিগমের যে হিসাব পাওয়া যায় তা (সারণি-ক) থেকে বোকা যায়।

জাতীয় তফসিলি জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গত চার বছরে এ রাজ্যে কীভাবে হয়েছে তা (সারণি-খ) থেকে বোকা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সাফাই কর্মজাতী পুনর্বাসন প্রকল্প গত চার বছরে কী হয়েছে তা (সারণি-গ) থেকে লক্ষ করা যায়।

(সারণিক)

পশ্চিমবঙ্গ ভূকমিসি জাতি, আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
স্বাধীন মোদি পরিচালিতিক উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্নে বিল্ড প্রটি কলোরে
(১৯৯৭-৯৭ হইতে ১৯৯৯-২০০০)
অনুলিপি প্রতিমান

আর্থিক বছর	প্রকল্পের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	উপকৃত প্রাপক	প্রতিষ্ঠান (টি)	সরকারি অনুদান (টি)	হ্যাণ্ড কপ (টি)	সর্বমোট (টি)
১৯৯৬-৯৭	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
১৯৯৭-৯৮	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
১৯৯৮-৯৯	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
১৯৯৯-২০০০	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫
	শ্রী শ্রী শ্রী	০০০'০৫	৪৪৪'৮৭	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫	৪০০'০৫

(সারণি-খ)

জাতীয় তকসিলি জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে
বিস্ত ৪টি বৎসরের (১৯৯৬-৯৭ হইতে ১৯৯৯-২০০০) অগ্রগতির খতিয়ান

আর্থিক বৎসর	উপকৃত প্রাপক	সরকারি অনুদান (টঃ)	প্রান্তিক কণ (টঃ)	জাঃ তঃ জাঃ আঃ বিঃ ও উঃ নিগমের যের কণ (টঃ)	সর্বমোট (টঃ)
১৯৯৬-৯৭	১৮৮	১৬,৮০,০০০	২১,৭০,০০০	১,৪৮,৭০,০০০	১,৮৭,২০,০০০
১৯৯৭-৯৮	৬৭৫*	৭০,৪৪,০০০	২৫,১২,৭০০	১,৬০,০০,০০০	২,৫৮,৫৬,৭০০
১৯৯৮-৯৯	১০৭	৬,৪২,০০০	১০,৪৬,০০০	৭৪,০৪,৫০৪	৯০,৯২,৫০৪
১৯৯৯-২০০০	২০৭**	২৭,২০,০০০	৩৬,৭৬,০০০	৩,৯০,২২,০০০	৫,২৪,১৭,০০০
২০০০-২০০১ লক্ষ্যমাত্রা	১৫,০০০	৪,৪৭,৪৪,৯৯২	২,০৮,৫০,০০০	১৭,০০,০০,০০০	২২,০৬,২২,২৯২

* (ক) উপকৃত পরিবারের সংখ্যা = ৬৭৫

(খ) উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা = ৪৮২১

** (ক) উপকৃত পরিবারের সংখ্যা = ২০৭

(খ) উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা = ৬৯১৯

(সারণি-খ)

জাতীয় সাক্ষর কর্মচারী পুনর্বাসন প্রকল্পে বিস্ত ৪টি বৎসরের
(১৯৯৬-৯৭ হইতে ১৯৯৯-২০০০) অগ্রগতির খতিয়ান

আর্থিক বৎসর	উপকৃত প্রাপক	সরকারি অনুদান (টঃ)	প্রান্তিক কণ (টঃ)	বিশেষ কণ (টঃ)	সর্বমোট (টঃ)
১৯৯৬-৯৭	৪০০	২৮,৪৬,০০০	৯,৪৪,৪৬৪	১২,১২,০০৬	৫০,০২,৫৬০
১৯৯৭-৯৮	১২৭	৫,২৭,০৭৪	১,৫৮,২০০	৪,২৭,৬৫৯	১১,১৩,২০৬
১৯৯৮-৯৯	৪০৪	২৬,৪০,৯২০	৮,৫২,৪১৫	৫,৫৯,২৪৯	৪০,৫২,৫৮৪
১৯৯৯-২০০০	২৫৯	১৭,৫০,০০২	৫,০১,৫০০	৮,৪৮,৮৪৭	৩১,০০,৭১২
২০০০-২০০১ লক্ষ্যমাত্রা	১,৬০০*				

* প্রশিক্ষণ = ৬০০

পুনর্বাসন = ১০০০

সর্বমোট = ১৬০০



পশ্চিমবঙ্গ জেলার কোলারের মন্ডিকনখের গ্রামে হারবাগ

পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জাতি আদিবাসী উন্নয়ন ও বিস্তারিত মধ্যমেসাদি পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে জেলাভিত্তিক তথ্য বহিষ্ঠান (সারণি-ঘ) লক্ষ্য করলে কিছুটা অনুমান করা যায়। তফসিলি উপজাতি পরিবার-ভিত্তিক উন্নয়ন জেলাভিত্তিক (সারণি-‘খ’ এবং সারণি-‘ঙ’) লক্ষ্য করা যায়।

কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বত :

কাড়গ্রাম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির অন্যতম। এই কারণে গঠিত হয়েছে কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বত। এই মহকুমার জনসংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। এর মধ্যে ৩১ শতাংশ আদিবাসী এবং ১৮ শতাংশ তফসিলি জাতিভুক্ত। বিশেষভাবে এই অঞ্চল পশ্চাৎপদ ও অবগ্রস্ত। এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র, নিম্ন বিকাশ, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার।

কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বতকে ঘিরে যে উন্নয়নের কাজ চলাছে তার ধারা অব্যাহত রাখতে ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে বিরাট কর্মসূচি নিয়েছে আদিবাসী অঞ্চল উন্নয়ন ও কাড়গ্রাম বিষয়ক উন্নয়ন দপ্তর।

কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বতের অর্থনৈতিক ৮টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৪৪টি জল উত্তোলন প্রকল্প সেতুর জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১০টি মাকারি নদী জল উত্তোলন প্রকল্পে ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার দ্রুততার সঙ্গে ৮টি ব্লকে বিদ্যুতায়নের জন্য

১২ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যয় নিয়ে কাজ শুরু করেছে। কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বত এখনও পর্যন্ত ১৩৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেছে। ২০০০-২০০১ সালের মধ্যে রাস্তা ও কলভার্টের কাজ শেষ করার জন্য ৯টি প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। শিক্ষা প্রসারে পর্বত ৮টি ব্লকে প্রাথমিক, জুনিয়র হাই এবং হাইস্কুলের উন্নয়নের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। বনস্বত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই অঞ্চলের জন্য বনবিভাগ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিল। আরও অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ সালে কাড়গ্রামের ৬টি পঞ্চায়েত সমিতি (বিনপুর-১ / বিনপুর-২ ছাড়া) বিদ্যুতায়নের জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। এই বিদ্যুতায়নের কাজ দ্রুত শেষ হবে। এছাড়া ৮টি ব্লকে বিদ্যুতায়নের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে অনুরোধ জেলা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীর ক্ষেত্রে কাড়গ্রাম মেলা / যুব উৎসব ও জল উৎসবের জন্য বৎসরমে ১ লক্ষ, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। লোনা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য আই আই টি খড়গপুরকে ৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কাড়গ্রামে নাগরিক পরিবেশের কাজ আরও উন্নয়নের জন্য কাড়গ্রাম পৌরসভাকে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

কাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্বতের উন্নয়নের তালিকায় রাস্তা কলভার্টের সঙ্গে দ্রুত হয়েছে কাড়গ্রামের ৪টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে রোহিণীতে জলুং নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কাজ। এই কাজ চলছে।

উত্তর মিহালপুরে জল উৎসব



পশ্চিমবঙ্গ তরুণি জাতি আদিনিমী উদ্যান ও বিস্তৃ নিদানের মধ্যমেয়মি পরিবারভিত্তিক উদ্যান প্রকল্পে
জৈবভিত্তিক ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বৎসরে সাফল্যের খতিয়ান

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	উৎপত্ত প্রাপক	প্রাপ্তিক জন (টঃ)	সরকারি অর্থদান (টঃ)	মাত্র জন (টঃ)	সর্বমোট (টঃ)	
						সর্বমোট (টঃ)	অর্থদান (টঃ)
১	মালদা	১,৭৫৬	১,১৫০২২	৮৬,২০,৫৫০	১,০৭,০৪,৭৩৭	১,১৪,৪০,৬৪২	১,১৪,৪০,৬৪২
২	টা শিলাকপুর	১,৬০৪	১,০৬,০১০	৮২,৪০,৪০০	৭০,৪২,৬৭০	১,৭৬,৭৪,১২০	১,৭৬,৭৪,১২০
৩	দা শিলাকপুর	২,১৮৬	১,৪২,৫০২	২০,০৫,২১০	১,০৫,৪০,০১৭	১,০০,০৫,০৩২	১,০০,০৫,০৩২
৪	বর্ধমান	৬,৬০৮	৫,৫০,৭৪৪	৩,০০,৪৭,৫৬৮	৩,৪৮,০৭,১৮২	৬,৫৭,০৫,৫২৪	৬,৫৭,০৫,৫২৪
৫	বাঁকুড়া	১,৭৮৬	১,১৮,৮৫০	৭১,১২,২০২	৮১,৭২,১৮০	১,৫৪,১০,৬৪০	১,৫৪,১০,৬৪০
৬	দা ২৪ পরগনা	৫,৬৭১	৩,৭২,৫০০	২,৫০,০৬,০২১	২,২৬,৭৮,৪৭০	৫,৫১,০৫,৮৬২	৫,৫১,০৫,৮৬২
৭	টা ২৪ পরগনা	১,০০২	৪০০,৪০০	৩৫,০৪,৪২৭	৭১,২০,০০০	১,০২,৮০,০০০	১,০২,৮০,০০০
৮	মেদিনীপুর	১,০০০	৫১০,৪০০	২,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
৯	মুর্শিদাবাদ	১,২৪৪	২,৫০,০০০	২,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১০	বীরভূম	১,২৪৪	২,৫০,০০০	২,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১১	হাওড়া	৩,২০২	২,৫০,০০০	২,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১২	দুর্গা	২,৭০২	২,৫০,০০০	২,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৩	নদিয়া	৩,৪৮২	৩,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৪	কোচবিহার	৩,৫১২	৩,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৫	জলপাইগুড়ি	২,৪৪২	২,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৬	দাক্ষিণ	৩,৪৮২	৩,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৭	পূর্বদ্বীপ	৩,৪৮২	৩,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৮	শিলিগুড়ি	৩,৪৮২	৩,৫০,০০০	৩,৮৪,৪২,৮০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০০
১৯	মোট	৫,২০,১৫৫	৫,২০,১৫৫	৫,২০,১৫৫	৫,২০,১৫৫	৫,২০,১৫৫	৫,২০,১৫৫

পশ্চিমবঙ্গ তরুণিণি জাতি, আশ্বিনী উন্নয়ন ও বিষ্ণু লিঙ্গের যথার্থ্যে পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন
 প্রকল্পে জেলাভিত্তিক ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে সাংকেতিক খতিয়ান

(তরুণিণি আশ্বিনী)

ক্রমিক সংখ্যা	কোষার নাম	উপস্থিত প্রাপক	প্রতিষ্ঠিত জন (টা)	সরকারি অনুদান (টা)	যাচ কণ (টা)	সর্বমোট (টা)
১	মালদা	৫৩৭	৬২,৫৮২	২৪,০১,০৯৯	২৬,৭২,২৭২	৫১,৫৬,৭০০
২	টা শিবাজপুর	৪১৪	৬০,১০৬	১৯,০০,৫৮৭	২১,৬৯,০১৭	৪১,৬৯,৮১০
৩	দা শিবাজপুর	১,৮১৫	২,৬৭,১৮৬	৭০,০২,১১৬	৭৮,৬৯,৬৭৮	১,৫১,৬৮,৯৮০
৪	বর্ধমান	১,৬৭০	১,৬২,৮৯২	৭০,৬৮,১০১	৮১,৭১,০৭২	১,৫৪,০০,০৯৫
৫	বিক্রান্ত	৮২৪	১,০৬,৭৮১	৩৫,২০,৪৫১	৪০,৮০,৪৬৪	৭৭,৪০,৬৯৬
৬	দা ২৫ শিবাজপুর	১০৫	৬১,৪২৫	৫,৭৭,০০৫	৬,২৮,১০৫	১২,৬২,২২৪
৭	টা ২৫ শিবাজপুর	৪২	১৮,১১৬	১,৬০,০৫১	২,০৮,২৭৪	৪,২৬,১৫১
৮	মৌলভীবাজার	৩,৬০৬	৬,০১,৬১৭	১,২৯,৭৮,২৫৮	১,৪১,৬৯,০৮৪	২,৭৭,৮০,২৫৮
৯	মুন্সিগঞ্জ	১৬৫	৩৮,৬০৪	৬,২২,১০৭	৭,৪৭,১২৭	১৪,০৮,৮৩৮
১০	বীরভূম	১,০২৬	২,৭০,১০৭	৪৫,৬০,৮৪৮	৫১,৭০,৭০০	১,০০,০১,৭৮৭
১১	গাজীপুর	২৮	৪,৫৮২	২৪,১০০	১,০৮,০৪৪	২,০০,৪৪৮
১২	দশা	৩৭৮	১,১৪,০৮৮	২০,০১,১৮৬	২৪,৪০,০০৪	৪২,৬৭,৬১৪
১৩	নদিয়া	২৮৪	৪৪৮	১০,২১,১২৬	১০,০২,১২২	২০,৬৯,২৮৮
১৪	কোচবিহার	৮	১৭,৭৮৮	২,২০,২০০	২,৩৮,২২৭	৪৮,৬৮,২৪৮
১৫	জলপাইগুড়ি	৫৬৪	১,১৪,৭৮৮	২২,৭৮,৬৫২	২৮,৫৬,৭৮৮	৫০,৪৬,২০০
১৬	দাক্ষিণ	৬৮১	৭৫০,০৮৭	২৬,১৭,৮৮৮	২৮,৭৮,০৮৮	৫৬,৮১,৮০৮
১৭	শুশুনিয়া	১,০০৮	২,১১,০১২	৪০,৬২,০৬১	৪৮,৭৬,০৭৮	১,১১,৪৮,০৬১
১৮	শিলিগুড়ি	২৮৮	৪০৪	১২,৭৮,০৮৮	১৫,৪৮,০০৮	২৮,৭১,০০৮
১৯	মোট	১৪,১২৪	২,০১,০৮২	৫,৬১,২০,৪০৪	৬,৬৮,৪০,৭৮৬	১২,২০,১১,০৮২

পশ্চিমবঙ্গ তত্ত্বাবধি সচিব, আনিসাবী উন্নয়ন ও বিত্ত নিশামের মধ্যমেদাসি পরিবারভিত্তিক
উন্নয়ন প্রকল্পে জেলাভিত্তিক ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরে সাক্ষরতার বৃত্তিয়ান

ক্রমিক সংখ্যা	কোণার নাম	উপকৃত শ্রাবক	প্রতিষ্ঠান (টাক)	সংরক্ষিত অর্থায়ন (টাক)	ব্যাংক অল (টাক)	সর্বমোট (টাক)	(অনুলিপি প্রাপ্তি)
১	মালদা	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
২	উ. শিলালক্ষপুর	১৫০৮	৩০০০০০	১৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৩	দা. শিলালক্ষপুর	১৫০৮	৩০০০০০	১৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৪	বর্ধমান	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৫	বাকুল	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৬	দা. ২৪ পরগণা	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৭	উ. ২৪ পরগণা	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৮	মেদিনীপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
৯	বুর্ধিমাল	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১০	বীরাঙ্গন	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১১	ফরাসী	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১২	বালি	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৩	নদিয়া	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৪	কোচবিহার	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৫	জলপাইগুড়ি	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৬	দা. শিলালক্ষপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৭	শিলালক্ষপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৮	শিলালক্ষপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
১৯	শিলালক্ষপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০
২০	শিলালক্ষপুর	৫৫০৮	৩০০০০০	৫৫০৮	৩০০০০০	১১০১৬০০	১১০১৬০০

(সারণি-৬)

পশ্চিমবঙ্গ তৃকসিপি জাতি, আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মাধ্যমেয়াদি পরিবারভিত্তিক
উন্নয়ন প্রকল্পে জেলাভিত্তিক ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বৎসরে সাফল্যের পরিমাণ

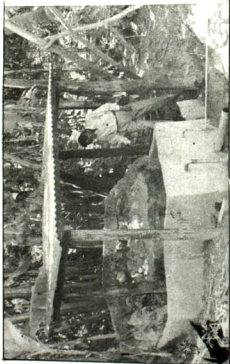
(তৃকসিপি আদিবাসী)

ক্রমিক সংখ্যা	কোমার নাম	উপকৃত গ্রাপক	প্রাথমিক ক্রম (টিস)	সরকারি অনুদান (টিস)	ব্যাংক ক্রম (টিস)	সর্বমোট (টিস)
১	মালসা	৫৫১	৬১,৭১২	২৬,১৪,৪৭৫	২৬,০৪,৮৮২	৫৩,১১,০৮৭
২	উঃ দিনাজপুর	৪০০	৪৮,১৬০	২০,৪০,৩৫০	২০,৪৬,২৬০	৪১,৪৬,৭৭০
৩	দা দিনাজপুর	১,৮০১	২,০৭,০০২	৮৬,৮৮,০২৫	৮৭,৫৫,৮৪২	১,৭৬,৪৪,০০২
৪	বর্ধমান	১,৬৬৭	১,০৬,৭৭২	৮০,০০,০০০	৮০,০০,০০০	১,৬২,৫১,৭৭২
৫	বাঁকড়া	২২৮	১,০৬,০০০	৪৪,০০,০০০	৪৪,০০,০০০	৮৬,০৬,০০০
৬	দা ২৪ পরগনা	১৫০	১,০৬,১৭১	৭,২৫,২৮৭	৭,২৫,২৮৭	১৫,০৬,৭৬৭
৭	উঃ ২৪ পরগনা	৫১	২,৬১৭	২,৫১,৭১৭	২,৫১,৭১৭	৫,১৫,৭১৭
৮	মেদিনীপুর	৩,৬৬২	৪০,৭৫০	১,৭০,৬১৭	১,৭০,৬১৭	৩,৫১,৭১৭
৯	মুর্শিদাবাদ	১৮২	৪০,০০০	৮,০০,০০০	৮,০০,০০০	৮,৪০,০০০
১০	খুলনা	১,০০০	১,০০,০০০	৪৮,১৪,৪৭৫	৪৮,১৪,৪৭৫	৪৯,১৪,৪৭৫
১১	হুগলী	৪১	২,৬১৭	২,৬১,৭১৭	২,৬১,৭১৭	৫,১৫,৭১৭
১২	খুলনা	৬৪৪	৪২,৬১৭	৩২,৬১,৭১৭	৩২,৬১,৭১৭	৬৭,৮৫,৭১৭
১৩	নদিয়া	২৫৫	৭,৫১৭	১,০৬,০০০	১,০৬,০০০	১,১৫,৫১৭
১৪	পেচবিহার	৮২	৭,৫১৭	১,০৬,০০০	১,০৬,০০০	১,১৫,৫১৭
১৫	জলপাইগুড়ি	৪৮০	৭,৫১৭	১,০৬,০০০	১,০৬,০০০	১,১৫,৫১৭
১৬	দার্জিলিং	৫৭৭	৪,৫১৭	১,০৬,০০০	১,০৬,০০০	১,১৫,৫১৭
১৭	পূর্ববঙ্গ	১,৪০৬	১,০৬,০০০	৪৪,০০,০০০	৪৪,০০,০০০	৮৬,০৬,০০০
১৮	শিলিগুড়ি	২৫৭	৭,৫১৭	১,০৬,০০০	১,০৬,০০০	১,১৫,৫১৭
মোট		১৪,২৫৭	১,০৬,০০০	৪৮,১৪,৪৭৫	৪৮,১৪,৪৭৫	৯৬,০৬,০০০

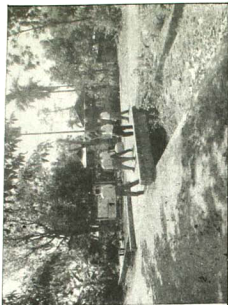
জাতীয় সাক্ষর কর্মসূচীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিরিয়ার ১৯৯৯-২০০০

আর্থিক ব্যয়ের অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	উপর্যুক্ত প্রাপক	জাঃ সাঃ হঃ বিঃ ও উঃ নিয়মের দ্বারা (টাকা)	প্রাপ্তিকৃত অর্থ (টাকা)	সরকারি অনুদান (টাকা)
১	জাঃ-অপঃ বৈদ্যিক ও বিদ্যুৎ	৪	২,০৪,০০০	১২,০০০	২৪,০০০
২	অটো ডেলিভারি ডাল	১	৪২,২৭৫	৩,২২০	৪,০০০



জলস্রোতের তরুণা বস্তুর পানীয় জল প্রকল্প



জলস্রোতের জেলায় জলস্রোতের পানীয় জল প্রকল্প

(সহস্রিক)

পশ্চিমবঙ্গ তৎসিসি জাতি, অসিবাঙ্গী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের মধ্যমেয়াদি পরিবারভিত্তিক
উন্নয়ন প্রকল্পে জেলাভিত্তিক ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসরে সাফল্যের পরিসর

(তৎসিসি জাতি)

ক্রমিক সংখ্যা	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদিত প্রাপক	প্রাপ্তিক জন (টাক)	সরকারি অনুদান (টাক)	ব্যাংক জন (টাক)	সর্বমোট (টাক)
১	মালদা	২০৮	১৪৩০০০	১০৪৪৪১৭	৩৬১২৪০০	১৬১৭৭১৪১
২	উঃ দিনাজপুর	১০১১	২১৪৩৬১২	১২০২২১৭২	১০১৭৩৪৪৪	২৪৪১১০৩৫
৩	দা দিনাজপুর	২৩৭	১০১১০০০	৭৩৩২৭০	৩২১৩৭২৭	১৫২০৭৭০০
৪	বর্ধমান	২০২৭	৪৪৩০০০	২৪৪২৪৪৪	২০২৪৪০০৪	৪০২০৭৭৫৪
৫	বাঁকড়া	২৭২	২০১১০০	২০১২২৭	৩৬৩২২০০৭	১৬০০০৭৭২
৬	দঃ ২৪ পরগনা	৩৬৭	৪৪০০০০	২৪৪২২২	১০২৪৪০০০	৪১০০০০০০
৭	উঃ ২৪ পরগনা	১৪৭৭	৩০০০০০	১৫১৩০০০	১০০০০০০০	৩০০০০০০০
৮	মেদিনীপুর	১১০১২	৪০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
৯	মুর্শিদাবাদ	৩০৭	১০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১০	বীরভূম	৩০৮	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১১	হাওড়া	৩০৮	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১২	হুগলি	৩০৮	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৩	নদিয়া	১৪৮	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৪	কোচবিহার	১০১	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৫	জলপাইগুড়ি	১০১	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৬	দক্ষিণ	১০১	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৭	পূর্বদ্বীপ	১০১	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৮	শিলিগুড়ি	১০১	১০০০০০	১০০০০০	২০০০০০০০	৩০০০০০০০
১৯	মোট	১৭৪৭	৪০০০০০	২৫০০০০০	২০০০০০০	৪০০০০০০

উত্তর ২৪-পরগনা জেলায় আদিবাসী ছাত্রদের জন্য আশ্রমছাত্রাবাস উদ্বোধন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ উত্তর

২৪-পরগনা জেলায় প্রাক-মাধ্যমিক আদিবাসী ছাত্রদের জন্য দুটি আশ্রম ছাত্রাবাস যথাক্রমে বারাসাত ২নং ব্লকের বারপুল এফ পি স্কুলে এবং হাডোলা ব্লকে অগ্নাধপূর অরবিন্দপট্টী ভারতী হাইস্কুলে উদ্বোধন করা হল। আশ্রম ছাত্রাবাস দুটির উদ্বোধন করলেন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহাী বিশাল জাকৃত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতিশ্রী শ্রী অমিত্যরী। সংশ্লিষ্ট ব্লক দুটির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

দুই লাখ টাকার কিছু অধিক ব্যয়ে নির্মিত প্রতিটি আশ্রম ছাত্রাবাসে ২০ জন আদিবাসী ছাত্র থাকতে পারবে। এই ছাত্রদের ভরণপোষণের ব্যয় সরকার থেকেই নির্বাহ করা হবে। প্রতিটি ছাত্রাবাসে একজন সুপারিন্টেনডেন্ট থাকবেন যিনি ছাত্রাবাসের আবাসিকদের রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। ছাত্রাবাসটির উদ্বোধন করে মহাী মমোর। বলেন যে, আদিবাসী পরিবারে সন্তানচর পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিমণ্ডল না থাকায় আদিবাসী শিশুদের পড়াশোনা



বারাসাতের ২নং ব্লকের বারপুল এ এফ পি স্কুলে বারাসাত জেলায় ছাত্রাবাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তালম শিহোন মহাী উদ্বোধন করছেন জাকৃত।

বাহ্যত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আশ্রম ছাত্রাবাস প্রকল্প এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে যাতে এই আশ্রমোচিত পরিমণ্ডলে আদিবাসী ছাত্ররা পড়াশোনার যোগ্য আবহাওয়া পায় এবং শঠন-পঠনে আগ্রহী হয়। তিনি আরও বলেন যে এই ছাত্রাবাসগুলিতে হয়েছে একদমর সুনত আদিবাসী ছাত্র থাকতে পারবে না। সেজন্য যারা বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ায় করে পড়াশোনা করছে সেই সব আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকার থেকে মাসিক ৩০ টাকা হিসেবে বাৎসরিক ৩৬০ টাকা ভরণপোষণ ভাতার প্রকল্প বর্তমান আছে। আগামী আর্থিক বছর থেকে এই প্রকল্পের ভাতার পরিমণ বৃদ্ধি করে মাসিক ৪০ টাকা করা হয়েছে। তিনি

স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এইসব কল্যাণকর প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং এর সুষ্ঠু রূপায়ণে সহযোগিতা করেন।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতিশ্রী মহাী শ্রী অমিত্যরী তাঁর বক্তব্যে সরকারের এই প্রকল্পের ভূমী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আদিবাসী জনসাধারণ আমাদের সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের মূল স্রোতে শামিল করার জন্য এই জাতীয় প্রকল্প অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ, উত্তর ২৪-পরগনার প্রকল্পাধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক বিশ্বনাথ বসু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেন যে জেলার প্রভাব এলাকায় এই আশ্রম ছাত্রাবাস প্রকল্পের উদ্বোধন অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষক আরও এক বাণ এগিয়ে নিয়ে গেল। তিনি স্থানীয় আদিবাসী জনসাধারণকে তাঁদের যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য জেলা আফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন।

প্রতিকল্প: দুরভারাক্ষ সন্দাল

হাডোলা ব্লকে অরবিন্দপট্টী ছাত্রাবাস উদ্বোধন করছেন মহাী বিশাল জাকৃত। ছবিতে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী শ্রী অমিত্যরী এবং প্রকল্প অধিকারিক



Publication of
The Cultural Research Institute, Government of West Bengal
Backward Classes Welfare Department
(সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থার প্রকাশন)

A. SPECIAL SERIES (MONOGRAPHS)

- 1980 A look at Institutional Support for Development of Areas and People of West Bengal—U. K. Ray, A. K. Das, M. K. Chowdhury and S. K. Basu (Rs. 6.00)
- 1981 The Profiles of the Marginal and Pre-farming Tribes of Central-Eastern India—Ed. by L. P. Vidyarthi (Rs. 40.00)
- 1981 Planning for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes—A West Bengal Perspective—U. K. Ray, A. K. Das and M. K. Chowdhuri (Rs. 10.00)
- 1981 To be with Santals—U. K. Ray, A. K. Das and S. K. Basu (Rs. 10.00)
- 1987 The Mundas—A Profile—S. K. Basu and R. N. Saha (Rs. 10.00)
- 1987 Craft Practising Scheduled Castes—S. K. Basu and S. N. Bhattacharjee (Rs. 10.00)
- 1987 টোটো—ডি এন ডাসি (৫ টাকা)
- 1989 West Bengal Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Facts and Information—A. K. Das and R. N. Saha (Rs. 45.00)
- 1990 বহুভৌমিক দৃষ্টিগোচ্রে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নারী—আর প্রণব সম্পাদিত (৩৫ টাকা)
- 1990 Profiles of Tribal Women in West Bengal—Ed by R. Gupta (Rs. 50.00)
- 1991 West Bengal Tribes: Socio-economic and Cultural Profile—Ed. by A. K. Das, R. N. Saha, R. Gupta and S. M. Chakraborty (Rs. 24.00)
- 1991 বীরহোড়—এ কে মুখার্জি (২৪ টাকা)

B. QUARTERLY BULLETINS :

VOL XIV	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 8.50)	VOL XVII	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 20.00)
VOL XIV	Nos. 3 & 4 (each copy Rs. 8.50)	VOL XVII	Nos. 3 & 4 (each copy Rs. 20.00)
VOL XV	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 20.00)	VOL XVIII	Nos. 1 & 2 (each copy Rs. 50.00)
VOL XVI	Nos. 1 - 4 (each copy Rs. 20.00)	VOL XV	Nos. 1 - 4 (each copy Rs. 50.00)

Please contact
For Priced Publication
Sales Counter, Publication Branch
Cultural Research Institute
Government of West Bengal
Backward Classes Welfare Department
P-1/4, C.I.T. Scheme VIII, VIP Road
P.O. Kankurgachi, Calcutta 700 054



মন্ত্রী উপেন কিস্ক মহোদয়ের পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন 'উত্তরণ সাময়িকী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা (ডানদিক থেকে) বীরেন্দ্রনাথ বাজ্ঞে এবং মীতীশ বিশ্বাস।

দাশগুপ্ত, অমল চট্টোপাধ্যায় ও অরুণেন্দ্র দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

বি এস-সি পরীক্ষার আগেই উপেন কিস্ক শিক্ষকতার চাকরি পান। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে शामिल থেকেও তিনি ১৯৭৬ সালে ইংরেজি ও বাংলায় বিশেষ পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেন। কিন্তু আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্থলের কাজও ছেড়ে দিয়ে কৃষক আন্দোলনের সারাক্ষণের কর্মী হয়ে যান। তিনি ১৯৭০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৭১-৭২ সালের স্বাধীনতা বিনয়লিতে তিনি কৃষক আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বহরমপুর এবং ১৯৭৪ সালে মালদার কৃষক সম্মেলন দুটিতে প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি কৃষক সমিতির জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি কৃষক সমিতির রাজ্য কমিটির এবং নিখিল ভারত কৃষক সমিতির কমিটি সদস্য।

উপেন কিস্ক বিখ্যাত কেন্দ্রপাতা আন্দোলনের সংগ্রামী নেতৃত্বে নিজেও প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রার্থীরূপে রাইপুর বিধানসভা (তফ: আদিবাসী) কেন্দ্র থেকে ১৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ছিলেন ভবতোষ সরেন (জনতা দল) এবং গঙ্গাধর মূর্মু (কংগ্রেস)। ব্যাডখণ্ডী প্রার্থীও এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরপর তিনি ১৯৮২ সালের নির্বাচনে ২১ হাজার ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করেন। এবারের (২০০১) নির্বাচনে তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ৩৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি কৃষ্টির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী, ১৯৯৬ সালে তফসিলি ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের (পরিবর্তিত নাম—অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ) রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এবার এই বিভাগের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেছেন।

তফসিলি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্ধ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে কলেজ জীবনেই উপেন কিস্ক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসি আমলের আমলাতান্ত্রিক বাধায় সেসব ফলপ্রসূ হতে না পারলেও, ১৯৭৮ সালে রাইপুরে আদিবাসী সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকরূপে তিনি ওই সমবায় সংস্থাটিকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। তিনি রাইপুর মার্কেটহিল সোসাইটিরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। ৮০-র দশকে তিনি অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলিকে কংগ্রেসি কজা থেকে মুক্ত করেন।

পিতার মতো উপেন কিস্কও শিশু বয়স থেকেই শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং পরবর্তী জীবনে শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে তিনি আদিবাসী ও কৃষক সমাজে চেতনা সঞ্চারে সচেষ্ট হয়েছেন। বহু বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি গরিব মানুষদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি রঘুনাথ মূর্মু স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। বর্তমানে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সভাপতির পদে বৃত্ত রয়েছেন। এছাড়া তিনি দুপার আওতাধীন বিদ্যালয়টির পরিচালন সমিতির এবং কৃষ্ণমেহিনী সরোবর জুনিয়র হাই স্কুলের সভাপতি পদ দুটিতেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

কলেজ জীবনে তিনি যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে সে আন্দোলনকে সাফল্যের শীর্ষে তুলে এনেছেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির কর্মধারায় নব নিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন।

রাজনৈতিক জীবনের মতো সাহিত্যের অঙ্গনেও তাঁর বিচরণ অবাধ। তিনি বাংলা ও সাঁওতালি—উভয় ভাষায়ই বহু প্রবন্ধ, ছোট গল্প ও কবিতা রচনা করেছেন। বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় তাঁর অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

বিলাসীবালা সহিস

রাষ্ট্রমন্ত্রী, অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ



সেই সব রাজনৈতিক কর্মী প্রথম জীবনে থেকেই গণ-আন্দোলনে शामिल হয়েছেন, বিলাসীবালা সহিস তাঁদের অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পুরুলিয়া জেলার কড়িপাড়া রাসারি গ্রামে ১৯৬১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনার প্রতি পিতামাতার আগ্রহের ফলে শৈশবে তাঁকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বর্ধমান জেলার খান্দরা জুনিয়র হাই স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়াশুনা শেষ করেন। এর পর তিনি পুরুলিয়ার যোগদা সংসদ কন্যা বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আসনসোল মহিমালা গার্লস কলেজ থেকে বায়োসায়েন্স সহ বি এসসি পাস করেন। সেই বছরই তিনি পুরুলিয়ার বি এড কলেজে ভর্তি হন (১৯৮৬)। বি এড ডিগ্রি লাভ করে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পুটুরা হরিমতী গার্লস স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯১ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষকতা করেন। ওই বছরের বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার পারা (সংরক্ষিত তফসিলি) কেন্দ্র থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রার্থিক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

বিপুল ভোটখিঁকো নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে তিনি অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সংরক্ষিত আসনে বিজয়ী মহিলা বিধায়কদের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ মহিলা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হয়ে তিনি বন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

এ বছরের (২০০১) সালের নির্বাচনেও তিনি একই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটখিঁকো জয়ী হয়ে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

বিলাসীবালা সহিস কলেজ জীবনে যুব আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে বি এড পাস করে তিনি জেলার যুব আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন

সহ-সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। এ বি টি এ'র সদস্যরূপে তিনি শিক্ষক আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর আবাল্য আগ্রহ তাঁকে নাচ-গানের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। বিশ্রেখী কবি নজরুলের গান ও কবিতা তাঁকে উদ্বীপ্ত করে।

তফসিলি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে তাঁদের জীবন-জীবিকার সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণে রাজ্য সরকার যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার রূপায়ণের কাজে মজ্জিত গ্রহণের আগে থেকেই তিনি জড়িত রয়েছেন।



‘উত্তরণ সাময়িকী’র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরূপে (বাঁ দিক থেকে) ধীরেন্দ্রনাথ বাক্ত এবং নীতীশ বিশ্বাস বিলাসীবালা সহিস মহোদয়াকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে।

এবং ছড়া আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতৃত্বে চলে আসেন। এই সময় তিনি জেলার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আন্দোলন পরিচালনার কাজে যুক্ত হন এবং পুরুলিয়া জেলা সমিতির

এইসব কর্মসূচির মধ্যে বিনিয়ুক্তি প্রকল্পে সরকারি সাহায্যের পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করার এবং তাকে প্রসারিত করার ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার কাজকে তাঁর বিভাগ অগ্রাধিকার দান করেছে।